এখন ডুয়ার্স

অক্টোবর ২০১৮। ২০ টাকা

১৫০ বছরের শারদীয়া জলপাইগুড়ি

ফাটাপুকুরের যাযাবর বস্তি

বাংলাদেশের চিঠি

শক্তিরূপেণ সোনম

বড় গল্প। ছায়া জন্ম নেয়

জলপাইগুড়ি পুরবাসীকে শারদীয় শুভেচ্ছা

যে উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি চলছে

জলপাইগুড়ি পৌরসভা শহরের নাগরিকদের প্রত্যয় ও বিশ্বাস নিয়ে ১৩৪ বছর অতিক্রম করেছে। এই প্রাচীন পৌরসভার শিকড়টি শহরের গভীর থেকে গভীরের মাটি ছুঁয়ে এখনও সবুজ, এখনও দৃঢ়। শহরের উন্নয়ন, সংস্কার, সৌন্দর্যকরণ-এর সাথে সাথে সভ্যতা, সংস্কৃতি কৃষ্টি ইত্যাদি ক্রমশই নানাভাবে এই শহরটিকে ধনবান করে তুলেছে এবং বাংলায় খ্যাতির শিয়রে পৌঁছে দিচ্ছে।

জলপাইগুড়ি পৌরসভায় বর্তমানে যে সমস্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি চলছে তার বিবরণ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হল—

১) এন ইউ এল এম— ১) শহরের গরীব মহিলাদের নিয়ে স্বনির্ভরদল গঠন।
২) স্বনির্ভর দলের ১.২৫ লাখ ক্যাশ ক্রেডিট ঋণপরিষেবা প্রদান।
৩) স্বনির্ভর দলের মহিলাদের ব্যক্তিগত ও দলগত ঋণ-এর ব্যবস্থা করা।
৪) শহরের বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানমুখী বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।
৫) শহরের আশ্রয়হীনদের জন্য ১.২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে আশ্রয়স্থল নির্মাণ করা।

২) হাউসিং ফর অল (এইচ এফ এ)— ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরে ১২৯০টি গৃহ ৩ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা (প্রতিটি গৃহের মূল্য) মূল্যের, পাকা ছাদযুক্ত বাড়ি প্রদান করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ আর্থিক বছরে ১৯৪৫টি পাকা ছাদযুক্ত বাড়ি প্রদান করা হবে।

৩) আমরুত— ১৫১ কোটি টাকা ব্যয়ে তিস্তার জলকে পরিশ্রুত পানীয় জলের উপযোগী করে শহরবাসীকে পরিষেবা দেওয়ার কাজ চলছে। কান্তেষরী পার্কের সৌন্দর্যায়ন ও নির্মাণ করা হয়েছে ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে। জে ওয়াই এম এ পার্কের সৌন্দর্যায়ন ও নির্মাণ করার কাজ চলছে।

৪) গ্রীন সিটি— ৭ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শহরের সবুজায়ন ও সৌন্দর্যায়নের কাজ চলছে।

৫) এন ইউ এইচ এম— ইউ পি এইচ সি ১ (লাবন্য মাতৃসদন) এবং ২ (৩নং ঘুমটি) থেকে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা ও ঔষুধ প্রদান করা হয়।

৬) স্বাস্থ্যসাথী— এই প্রকল্পে ৭৫০০ স্বনির্ভর গোষ্ঠির পরিবারকে স্মার্ট কার্ড প্রদান করা হয়েছে। আরও ৩০০০ কার্ড প্রদান করা হবে। প্রতিটি পরিবারকে ১,৫০,০০০ টাকা স্বাস্থ্য বিমা প্রদান করা হবে।

৭) সমব্যাথী— ৫২৯ টি পরিবারকে এককালীন ২০০০ টাকা করে পারলৌকিকক্রিয়ার কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রদান করা হয়েছে।

৮) পথবাতি— শহরের সৌন্দর্যায়ন ও আলোকিত করার জন্য ২৫ টি ওয়ার্ডে এল ই ডি লাইট প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

৯) রাস্তা ও ড্রেন— ২৫ টি ওয়ার্ডের সমস্ত রাস্তা ম্যাস্টিক ও ড্রেনকে কভার ড্রেনে পরিণত করার কাজ চলছে।

১০) এস ডব্লু এম— প্রতিটি ওয়ার্ডের বাড়ি বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহের কাজ চলছে। এর থেকে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজ চলছে।

জলপাইগুড়ি শহর— এই পৌরসভা আরও প্রগতিশীল ও সম্পন্ন হয়ে উঠুক। ধন্যবাদান্তে

জলপাইগুড়ি পৌরসভা

শ্রীমতী পাপিয়া পাল
উপ-পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

শ্রী মোহন বোস
পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

এখন ডুয়ার্স

পঞ্চম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, অক্টোবর ২০১৮

সম্পাদনা ও প্রকাশনা
প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদনা
শ্বেতা সরখেল

অলংকরণ
শান্তনু সরকার

সার্কুলেশন
দেবজ্যোতি কর
দিলীপ বড়ুয়া

মুদ্রণ অ্যালবাট্রস

ইমেল
ekhonduars@yahoo.com

প্রচ্ছদ
সত্যম ভট্টাচার্য

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস। মুক্তা ভবনের দোতলায়।
মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি।
ফোন ০৩৫৬১-২২২১১৭

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে। এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

এই সংখ্যায় যা আছে

সম্পাদকের কলমে ৫

পাঠকের কলমে
জলপাইগুড়ি বন্যার পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে আজও শঙ্কিত মন ৮

বিশেষ শারদীয়া প্রতিবেদন
কাশফুল ফোটে তবু... ১০
দেড়শ বছর পূর্তি কি উদ্‌যাপিত হচ্ছে এবার জলপাইগুড়ির দুর্গা পুজোয়? ১২

বিশেষ রচনা
পাঁচশ বছরের যে যাযাবরেরা স্থায়ী আস্তানা গেড়েছিল জলপাইগুড়ির ফাটাপুকুরে! ১৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ: জলপাইগুড়ি
কী হারাল আর কী পেল দেড়শ বছরের জলপাইগুড়ি? ২২

পুজো স্পেশাল
ওপার বাংলার চিঠি ডুয়ার্সকে ২৬

ডুয়ার্সের হেথা হোথা
দুয়োরানি দোমোহানি ২৮

পর্যটন
ডুয়ার্সের অমূল্য পথে স্বল্প মূল্যে ৩২

শ্রীমতি ডুয়ার্স
ইভটিজিং রুখতে আইন যথেষ্ট নয় ৩৫, শক্তিরূপেণ সোনম ৩৬, প্রশ্নের ছেলে উত্তরের মেয়ে ৪০
আমাকে খুঁজে দে জলফড়িং ৪২

বড় গল্প
ছায়া জন্ম নেয় ৪৪

হাংরি রিপোর্টার
বছর ঘোরার আগেই 'ঘুষ' নেওয়া টাকা ফিরিয়ে দিল দুই টিটিই ৫৬

উত্তরপক্ষ
পুজোয় ওরা সবাই কিন্তু বাড়ি ফিরতে পারে না ৫৮

প্রতিবেশি পিএনপিসি
কুন্তীর কুটির ৫৯

বইপত্র
নীরজ নাটক ৬০

ধারাবাহিক ডুয়ার্স
মহারাণী কথা ৩৮, লক্ষ্যভ্রষ্ট পঞ্চশ্বর ৫২

নিয়মিত বিভাগ
খুচরো ডুয়ার্স ৬, ডুয়ার্সের চা-বাগান চিনুন ৩০, রাসায়নিক রস ৬২

ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতি

ময়নাগুড়ি। জলপাইগুড়ি

সম্পাদকের কলমে

সিকিমকে এক অধরা উচ্চতায় নিয়ে যাবে পাকইয়ং

বছর বারো আগে দক্ষিণ সিকিম নামচিতে এক হোটেল মালিক বলেছিলেন, দার্জিলিং যে ভুল করেছে আমরা তার থেকে শিক্ষা নিয়েছি, এখানে তার পুনরাবৃত্তি চায় না কেউ! যে সত্যিটা সবাই জানে তা সেদিন তিনি অকপটে স্বীকার করেছিলেন, দার্জিলিং পাহাড় যদি টানা ত্রিশ বছর ধরে চলতে থাকা অশান্তি অস্থিরতার আগুনের মধ্য দিয়ে না যেত, তাহলে বাংলার হিমালয় টপকে পর্যটন মানচিত্রে সিকিমের আজকের এই আন্তর্জাতিক পরিচয় নিয়ে উঠে আসা কঠিন হত। ক্রমাগত বন্ধ আর অশান্তিতে সমতলের পর্যটক যখন কার্শিয়াং-দার্জিলিং-কালিম্পংয়ের নাম ভুলতে বসেছিল, তখনই সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ছাড়ে নি পবন চামলিংয়ের সিকিম। বিকল্প হিল স্টেশন হিসেবে দ্রুত উঠে আসে গ্যাংটক। টাইগার হিল নেই তাই সই, মানুষ এখানে খুঁজে পেয়েছে শান্তি, সভ্য পরিবেশ যা দার্জিলিংয়ের ম্যাল থেকে ঘিসিংয়ের বিপ্লবে অন্তর্হিত হয়েছিল। এরপর সিকিমের মুকুটে একে একে পালক জুড়তে থাকে পেলিং, ইয়ুমথাং-গুরুদোংমার, সিল্করুট জেলেপ-লা, রাবাংলা, এমন কী নামচিও। পর্যটনই যে প্রগতির একমাত্র পথ সে সত্য বুঝতে দেরি করে নি সিকিমবাসী। পশ্চিম ও উত্তর সিকিম জুড়ে শুরু হয়ে যায় সাজ সাজ রব। ঘরোয়া পর্যটনের ভাবনা ছড়িয়ে পড়ে প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে, তার সঙ্গে যুক্ত হয় 'কমিউনিটি টুরিজম' ও 'অর্গানিক সিকিম' প্রচার। স্বাভাবিকভাবেই কলকাতার পর্যটকের ছুটির ঠিকানা হয়ে দাঁড়ায় সিকিম।

অন্যদিকে যদি বাংলার কথা ভাবি, নতুন সরকারের নীতিতে পাহাড়ে শান্তি ও পর্যটক দুই-ই ফিরে এসেছে ঠিকই, তবে সিকিমের নিরিখে প্রায় পঁচিশ বছর পিছিয়ে পড়েছে দার্জিলিং পাহাড়। রাজ্য সরকারি তৎপরতায় প্রত্যন্ত দুর্গম পথগুলি আজ গাড়ি চলাচলের উপযোগি হয়ে উঠেছে, মানুষের বহুদিনের ক্ষোভ-অভাব প্রশমিত হচ্ছে ক্রমশ পরিকাঠামো উন্নয়নের দ্রুত গতি লক্ষ্য করে। দার্জিলিং-এ অশান্তির ফায়দা তুলেছিল সিকিমের পর্যটন, একইভাবে অনেকটা উপকৃত হয়েছিল ডুয়ার্সও। স্থানীয় বনকর্তাদের সাধু উদ্যোগে জনপ্রিয় হয়েছিল গরুমারা। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্যি, পরিকাঠামোর অভাবে ডুয়ার্স পর্যটন সিকিমের মত জায়গায় পৌঁছতে পারে নি! পরিবহণ আজও ডুয়ার্সে মহার্ঘ, সাধারণ টুরিস্টের সাধ্যের বাইরে। ডুয়ার্সে চা বাগান নিয়ে পর্যটন আজও পরীক্ষা-নিরীক্ষা স্তরেও পৌঁছায় নি। একসময় বনদপ্তরের তৈরি করা স্বল্প ব্যয়ের লজগুলি একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। গরুমারার খ্যাতি ছড়াবার পর কলকাতার বহু মানুষ এসে তৈরি করেছেন ডজন কয়েক রিসর্ট। তাদের বেশিরভাগেরই বছরের দিন তিরিশ-চল্লিশ বাদ দিলে বাকি খালিই পড়ে থাকে। ডুয়ার্সের অপর নাশনাল পার্ক জলদাপাড়া ঘিরে মরসুমি পর্যটক থাকলেও এলাকার ইকোপর্যটনের প্রসারে সরকারি ভুমিকা আজও চোখে পড়বার মত নয়। আর একেবারে পূর্বের বক্সা টাইগার রিজার্ভ নিয়ে অসহায়তার কথা না বলাই ভাল।

গত বছর দার্জিলিং পাহাড়ে সর্বশেষ অশান্তির পর অভিযোগের আঙুল উঠেছিল সিকিমের দিকে— বিমল গুরুং বাহিনীকে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দুইই নাকি দিচ্ছে তারা। এর আগে তিস্তা নদীর যথেচ্ছ ব্যবহার নিয়ে রাগ তো ছিলই, এবার অভিযোগ তোলা হল পবন চামলিংরা ইন্ধন জোগাচ্ছেন বাংলার পাহাড়ে অশান্তি বজায় রাখতে, কারণ দার্জিলিং নাকি তাদের সব টুরিস্ট টেনে নিতে শুরু করেছে। এর আগেও দেখা গিয়েছে যখন পাহাড়ে লাগাতার বন্ধ চলেছে তখন সিকিমের পর্যটকদের ছাড় দিয়েছে বন্ধ সমর্থকরা। সিকিমকে তার জন্য কি মূল্য ধরে দিতে হয় নি? ব্যবসার খাতিরে আঁতাত করতে হয় নি? এরপর দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে সাক্ষাতে কথাবার্তা হয়েছে, সম্ভবত এসব নিয়েই। সাইডলাইনে বসে বসে উলুখাগড়ার দল যখন ভেবেছে এবার সিকিমকে টাইট দেওয়া হবে, তখন চামলিংরা সবার আগে ত্বরান্বিত করেছেন তাঁদের পাকিয়ং বিমানবন্দর তৈরির কাজ— যে করেই হোক আগামী পুজো মরসুমের আগে চালু করতে হবে উড়ান— এই ভীম প্রতিজ্ঞা নিয়ে। আর গত ২৪ সেপ্টেম্বর তা বাস্তবায়িত করে দেখিয়ে দিয়েছেন বাংলার উপর নির্ভরশীলতা থেকে সরে আসতে কতটা উদ্‌গ্রীব সিকিমের পর্যটন! আন্তর্জাতিক টুরিজম মার্কেটে যে গ্ল্যামার পরিচিতি অর্জন করেছেন তাঁরা এতদিনে, তা পরনির্ভরতায় হারাবার কোনও মানে হয় না।

সাইডলাইনে বসে বসে উলুখাগড়ার দল যখন ভেবেছে এবার সিকিমকে টাইট দেওয়া হবে, তখন চামলিংরা সবার আগে ত্বরান্বিত করেছেন তাঁদের পাকিয়ং বিমানবন্দর তৈরির কাজ— যে করেই হোক আগামী পুজো মরসুমের আগে চালু করতে হবে উড়ান— এই ভীম প্রতিজ্ঞা নিয়ে। আর গত ২৪ সেপ্টেম্বর তা বাস্তবায়িত করে দেখিয়ে দিয়েছেন বাংলার উপর নির্ভরশীলতা থেকে সরে আসতে কতটা উদ্‌গ্রীব সিকিমের পর্যটন!

উড়ান আজ সাধারণ মধ্যবিত্তের নাগালে, কখনও কখনও ট্রেনের উচ্চশ্রেণির চাইতে কম খরচে। ফলত পাকইয়ং-কলকাতা বুকিং শুরু হতেই নিঃশেষিত। বাগডোগরা বিমানবন্দরে অমানুষিক ভিড়, এনজেপি স্টেশনে ট্যাক্সিওয়ালাদের অনিয়ন্ত্রিত দাপট, শিলিগুড়ির শ্বাসরোধকারি ট্রাফিক এড়াতে পাকইয়ংকেই বেছে নেবেন শান্তিকামী ব্যয়-সক্ষম কলকাতার মানুষ, বাইরের রাজ্যের বা দেশের পর্যটক তো বটেই। কেবল পর্যটনই নয়, পাহাড়ে উচ্চ শিক্ষা, উন্নত চিকিৎসা, আধুনিক প্রযুক্তি এ সবই আসবে আকাশপথেই। নিজেদের অভিজ্ঞতাতেই চামলিংরা বুঝতে শিখেছেন— পর্যটনের উন্নতি কেবল উগ্র বিছিন্নতাবাদকেই নির্মুল করে না, পর্যটনের হাত ধরেই দেশে আসেন ভিনদেশি চিকিৎসক বা প্রযুক্তিবিদ বা বণিক, তাঁদের বিনিয়োগের ইচ্ছা জাগে মনোরম প্রকৃতির মাঝে অবকাশে এসেই। আর সরাসরি উড়ানের সুবিধায় তাদের সুপ্ত ইচ্ছা যে পাখির মত ডানা মেলবে তা বলাই বাহুল্য। কোটি কোটি খরচের বণিক সম্মেলন করে তাঁদের আর আলাদা করে ডাকাডাকি করবার প্রয়োজন হয় না!

অথচ এই ক'বছরে সেইখানেই থেকে গেল আমাদের ডুয়ার্স। কোচবিহারের বিমানবন্দর চালু হবে এখবর আজ তামাশার উদ্রেক করে। উত্তরের দু-দু'জন পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রী, তিন তিনজন সাংসদ সদাব্যস্ত থাকেন ফিতে কাটা আর নিজেদের গড়রক্ষার লড়াইতে। শোনা যায় কেউ কেউ গোপনে ডিগবাজিও প্র্যাকটিশ করছেন আসছে নির্বাচনের কথা ভেবে। অতএব বিমানবন্দর চালু হোক বা না হোক তাঁদের কাছে ইতর বিশেষ হয় না। বিমানে চাপবার জন্য তাঁদেরকে যেমন নিজেদের টাকা খরচ করতে হয় না, তেমনি বিমানে চড়া মানুষের ভোট তাদের না পেলেও চলবে। তাঁরা কেবল অপেক্ষায় থাকেন কবে মুখ্যমন্ত্রী সময় বের করে উদ্যোগী হবেন তবে বিমান নামবে, আর সেইদিন ধোপদুরস্ত পাঞ্জাবী-স্নিকার পরে তাঁরা হাজির হবেন উদ্বোধনী মঞ্চে। সবাই জানি, পরের বছর খুলে যাচ্ছে প্রতিবেশি আসামের ধুবড়ি বিমানবন্দরও। আসাম বা সিকিমে নেতা-মন্ত্রীরা কেউ গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে লিপ্ত নন, কারও বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ নেই, সবাই 'ধোয়া তুলসিপাতা' —একথা শুনলে বোধহয় 'ঘোড়াতেও হাসব'। কিন্তু এটা সবাই মানবে তাঁরা কেউ নিজের মাটিকে লাথি মেরে নেতাগিরি করেন না! আর কেবল কটেজ বানানোই যদি ডুয়ার্স পর্যটন উন্নয়নের একমাত্র মাপকাঠি হয় তবে কটেজের সামনে একটা করে চিড়িয়াখানা তৈরি করতে অসুবিধা কোথায়?

কলম সিং-এর মেগা খুচরো ডুয়ার্স

খুচরো লেখক পুজোর ছুটি কাটাইতে ভোলার ডাবরি গিয়াছেন বলিয়া শারদীয় সংখ্যায় আমিই নামিয়া পড়িলাম। তবে উক্ত লেখকের স্টাইলে লিখিব না। মাতা আসিতেছেন। গোমাতাগণ তো নিত্য যাওয়া আসা করিয়া থাকেন। তাহাদের পূতপবিত্র কাউডাং খোকাখুকুদের খেলিবার একমাত্র মাঠের দফারফা করিয়া দিয়াছে দেখিয়া কিঞ্চিৎ মহাতামাক সেবন করিয়া ফেসবুকে লাইক মারিতেছি, হেনকালে আকাশে অপূর্ব স্বর শুনিলাম। কে জানি কহিতেছে 'নোকাকা নোকাকা'! মনে হইল ক্লাবের দুর্গাপূজায় থিম বানাইবার টিম কাজ করিতেছিল— তাঁহাদের হেড শুনিয়াছিলাম জাপানি —স্বর সেথা হইতে ভাসিয়া আসিতেছে। কিন্তু সেখানে তো কেহ নাই! হ্যাল্ খাইলাম নাকি? পুনরায় মহাতামাক সেবন করিয়া কর্ণের সেন্সিটিভিটি বর্দ্ধন করিতেই টের পাইলাম শব্দ আসিতেছে কোচরাজ্য হইতে। হাতে আমার কোনও কালেই কাজ থাকে না। তাই ভাবিলাম, যাই। তদন্ত করিয়া খুচরো লিখি।

নোকাকা

আসিলাম কোচরাজ্যে। কী আশ্চর্য! সর্বত্রই বাতাসে ফিসফিসাচ্ছে সেই রব। 'নোকাকা নোকাকা'! গুগুলে 'নোকাকা' সার্চ মারিলাম। মোবাইল ঝুলিয়া গেল। বিড়ির দোকানে জিগ্যেস করিলাম, 'নোকাকা জান?' জবাবে দোকান বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। বুঝিলাম মিস্টিরিয়াস কিছু না হইয়া যায় না। এমনিতেই কোচরাজ্যে ঘাসপদ্মের দ্বন্দ্ব সমাস মিডিয়ায় খুব ছাপা হইতেছে। একখানা সিবিল ওয়ার না হইলে শান্তি নাই। ভাবিলাম কোচরাজ্যের মহাসেনাপতি রবিঠাকুরকে জিগ্যেস করিয়া নোকাকা রহস্যের মানে জানিয়া লইব। তাই শুনিয়া ঠাকুরের এক শাকরেদ প্রায় মূর্ছা যাইতে যাইতে সামাল দিয়া কহিল, 'ঠাকুর মশাইকে বিজেপি করিতে

বলুন, মাওবাদি হইতে বলুন — এমন কি মহাদিদি বিরোধী কবিতা লিখিতে বলুন ক্ষতি নাই। কিন্তু নোকাকা লইয়া কিচ্ছু বলিতে যাইবেন না কলমবাবু!'

'কেন কেন?' আমি জানিতে চাহিলাম। 'এই জাপানি শব্দের প্রতি উহার এত অভিমান কেন?'

'কে কহিল জাপানি? ইহা জোড়কলম শব্দ। নো প্লাস কাকা।'

বুঝিতে পারিলাম। বুঝামাত্র এক লম্ফে নীলসাদা বাস ধরিয়া কোচরাজ্য ত্যাগ করিয়া ভাগিয়াছি। তাই তো! কোচরাজ্যের মহাসেনাপতি পস্ট বলিয়া দিয়াছেন যে তাঁহাকে মামা-দাদা-জেঠু-পিসি-খুড়ো— যা খুশি বলিয়া ডাকা যাইতে পারে, কিন্তু কাকা ডাকা যাইবে না। 'কাকা' শুনিলেই তাঁহার নাকি প্রতিক্রিয়া হইতেছে। এই কারণে কোচরাজ্যময় কেবল 'নোকাকা নোকাকা' ধ্বনি। বিশ্বাস না হইলে ভোর চারটে থেকে সকাল ন-টা পর্যন্ত কোচরাজ্যে হাঁটিয়া দেখিতে পার।

দারুন

পন্ডিতেরা কী কহিবে জানি না, কিন্তু 'দারুন' শব্দের বুৎপত্তি হইল 'দারু' প্লাস 'উন'। দারু মানে যে সুরা তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে। দারুর আধিক্যে যখন দারু মে বোতল নাকি বোতল মে দারু— এই ধরনের ধন্ধ জাগিয়া উঠে, তখন তাহাকে বলে 'দারুন'। তা শরতের নীলাকাশ আর সাদাকাশ দেখিতে দেখিতে খবর পাইলাম জলপাইগুড়ি নাকি জেলা হিসেবে আবার দারুন হইয়াছে। দেড়শো কোটি টাকার দারু বেচিয়া সে নর্থবাঙলায় ফার্স্ট। সেকেন্ড মালদা। দাদার মধ্যেই মাল, তবুও মোটে ৩৩ কোটি। বাকিদের কথা শুনিলে মাতালগণ লজ্জা পাইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু জলপাইগুড়িতে এত দারু পান করিল কে? কংগ্রেস তো সাইনবোর্ড! বামেরা রক্তহীন! তাহা হইলে কি তৃণপদ্ম ফিফটি-ফিফটি? দু-পক্ষই তাহা হইলে জয় শ্রী হুইস্কি? শুনিয়া রিটায়ার্ড এক মাতাল কহিল, 'ফালতু সাম্প্রোদায়িকতা ছড়াইবেন না তো! এই যে সবে মিলিয়া জেলাকে ফার্স্ট করিলাম, তা কোনও শাসক কি বিরোধি আসিয়া অভিনন্দন জানাইয়া এক গেলাস ফ্রি দিয়া হ্যান্ডশেক করিল? দারু হইল সেকুলার বিজনেস। বিচ্ছিন্নতার অর্থ পতন। যেমন আলিপুর রাজ্য।'

'মানে?' আমি কৌতূহলী হইলাম।

'জলপাইগুড়ি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আলিপুর কত টাকার দারু খাইল?'

আমি কাগজে চোখ বুলাইয়া চুপ মারিয়া গেলাম। মোটে ২৯ কোটি। মাতাল বিড় বিড় কহিয়া উচ্চারণ করিল, 'ইউনাইটেড উই টপ, ডিভাইডেড দে ফ্লপ!'

'দারু'ন ব্যাপার। সন্দেহ নাই। আমি কাটিয়া পড়িলাম। গভ্মেন্ট দুর্গাপূজা করিলে দশ হাজার টাকা চাঁদা দিবে জানিয়া পূজা করিবার প্ল্যান বানাইয়াছিলাম। 'কলিকাগ্রাম কঙ্কে সমিতি বারোয়ারি পূজা' নামে কমিটিও তৈয়ারি হইয়াছে। ঠিক করিয়াছিলাম পূজার থিম হইবে 'ব্রিজ'। সেবক ব্রিজের উপর মা দশভূজা অধিষ্ঠান করিবেন। তিস্তা ব্রিজে অসুর থাকিবে। কিন্তু ডেকোরেটর সাফ জানাইয়া দিয়াছে যে ব্রিজ বানাইলে মন্ডপ ভাঙিয়া পড়িতে পারে। সেতু হইল পতনের হেতু। তা যাহা

হউক। আমাদের বাজেট দশ হাজার। ‘গোমাতা’ থিম করিলে কেমন হইবে? গোশালায় মা দুর্গা! সরস্বতী বীণায় দুগ্ধকেদার বাজাইতেছেন। তাহা শুনিয়া গোমাতা সের সের দুগ্ধ নিঃসরণ করিতেছেন। লক্ষ্মী সেই দুগ্ধ গণেশকে খাওয়াইতেছে। দুগ্ধ পান করিয়া গণেশ টলার, স্ট্রংগার, শার্পার হইয়া মহাভারত লিখিতেছেন। কিন্তু কার্তিক কী করিবে? তবে এইরূপ থিম বানাইলে টাউনের ‘অস্থাবর গোবরলক্ষ্মী সমিতি’ আরও হাজার দশেক দিয়া দিবে বলিয়া বিশ্বাস। কিন্তু মিটিঙে যাইয়া অন্য কথা শুনিলাম। বসুনিয়া দারোগা ঢুলু ঢুলু চক্ষে কহিলেন, ‘দেঁতো সিন্দুক। ব্যাপারখানা শুনিয়াছেন কি?’

দেঁতো সিন্দুক

জানিলাম, ইহা দন্তনির্মিত সিন্দুক বটে। শুনিয়া অবাক হই নাই। হাতির দাঁতের সিন্দুকের কথা কে না জানে? কিন্তু দারোগা বলিল, অত সহজ নয় স্যার! মনুষ্যদন্তনির্মিত সিন্দুক। সংস্কৃতে যাহাকে নরঃ-নরৌ-নরাঃ বলিয়া থাকে, উক্ত নরস্য দন্তম্।’

অবাক কথাই বটে! মানুষের দাঁত দিয়া সিন্দুক বানাইয়া কী রাখিবে? দারোগা ইহার জবাবে হাসিয়া বলিল, টাকা। খরচ করিতে না পারিলে টাকা কোথায় রাখিবে? সিন্দুকে! টাকা কোথায় খরচ করিবে? কেন? দাঁতে। দাঁতের টাকা খরচ করতে না পেরে সিন্দুকে রাখিলে যাহা হয় উহাই দেঁতো সিন্দুক। দন্ত মহাবিদ্যালয়ে দেখেন নাই?’

এইবার বুঝিলাম। নরদন্তের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার নিমিত্তে ডেন্টাল কলেজের রোগি কল্যাণ সমিতির ফান্ডে আটচল্লিশ লক্ষাধিক মুদ্রা পড়িয়া আছে। ছাতা পড়িয়া গিয়াছে। কিছু বোধ করি অচলও হইয়া গিয়াছে। সমাজে তো গণধোলাই, গোষ্ঠী ধোলাই, রামধোলাই, গোধোলাই-এর অভাব নাই। দাঁত নড়িয়া-খুলিয়া-গায়েব হইয়া যাইতেছে হামেশাই। এই দন্ত সংকটের মোকাবিলার জন্য সেই মুদ্রা কিছুতেই ব্যয় করা যাইতেছে না। অথচ দন্তযাতনায় কাতর রোগীকূলকে আরাম করিয়া বসিবার ব্যবস্থা করা যাইত। জেনারেটর কিনিয়া ফেলা যাইত। কিছু একটা কাজ তো হইত!

দারোগা কহিল, ‘দাঁতের ওপাড়ে আইসক্রিম যাইলে আর যেমন ফেরৎ আসে না, সেই রূপ দেঁতো সিন্দুকে মুদ্রা ঢুকিলে আর রিটার্ন করে না। নিশ্চই বুঝিয়াছেন?’

আমি কহিলাম, ‘আমরা তাহা হইলে দন্তপাটি বিষয়টিকে থিম করিতে পারি।’

‘কী রকম?’

‘হাঁ করা দাঁতের পাটি। ভিতরে দুর্গা। অসুরটাকে দাঁতের পোকা বানাইলেই থিম পরিষ্কার। নন্ পলিটিকাল কেস।’

দারোগা অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া অভিভূত কণ্ঠে কহিলেন, ‘কলমবাবু! ইউ আর সিম্পলি গ্রেট! থিম ফাইনাল।’

প্রশংসায় আমি উদাস থাকি। সমিতির মিটিঙের আর দরকার হইল না। হরদ্বার হইতে আমার পরম ফ্যান প্রস্তরাচার্য জগমোহন দশ ভরি মহামাখন পাঠাইয়াছিলেন। তাহা নিঃসৃত ব্রহ্মধূম্র পান করিয়া গণপতিলালের শোনপাপড়ি চিবাইয়া শীতল জল গলায় ঢালিয়া সদস্যদের জিগ্যেস করিলাম, ‘খবর বলো? পূজায় লেটেস্ট কি ঘটিতেছে?’

তখনই জানিলাম, ডুয়ার্সে চিতারা মা হইবার জন্য নার্সিং হোম গমন করিতে চায়। সমিতির ঘরদোর পরিষ্কার রাখিবার নিমিত্তে চাঁদা তুলিয়া এক মাসী রাখা হইয়াছে। মাসীই খুলিয়া বলিলেন সব।

মাসীর কথা

“তোমরা জঙ্গলে ঢুকে ঢুকে এমন সব কাণ্ড বাধিয়েছ যে চারপেয়েগুলোর বারোটা বেজে গিয়েছে। আরে মড়া! জঙ্গলের জানোয়ার জঙ্গলে বাচ্চা বিয়োবি এটাই হলো ভগবানের ইচ্ছে। যা হবে সব নর্মাল ডেলিভারি। কিন্তু অলপ্পেয়ে মড়াখেকো চিতাগুলো সেটা মানছে? জঙ্গলে ঢোকা বাবুদের কীর্তিকাহিনী দেখে নির্ঘাৎ ওদের মাথা বিগড়েছে কলমবাবু! আপনি লিখে নিন, গভভবতী হওয়ার পর হাতিরা, চিতারা লোকাল স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আয়রন ট্যাবলেট নিতে আসল বলে! নইলে হারামজাদা চিতার মা-গুলো বাচ্চা বিয়োতে লোকালয়ে চলে আসছে কেন? জানোয়ারের সন্তান কখনও অবৈধ হয় না—এরপরেও পাব্লিক প্লেসে আসছে কেন? তার মানে গুখেকো মাগী চারপেয়েগুলো নর্মাল ডেলিভারিতে ভরসা রাখতে পারছে না। আমি নিশ্চিন্ত কলমবাবু! সিওর কোনও নার্সিং হোমের লোক জঙ্গলে ক্যাম্প করে লুকিয়ে আছে। তাই জানোয়ারগুলো সব ফরেস্ট ছেড়ে পাড়ায় আসছে সিজার করাবে বলে। সিস্টেম জানে না বলে পারছে না। সেদিন দেখলেন না মন্থনী বাগানে কী হল? তার আগে নাগ্রাকাটার কাছে? এমনটা তো হয়েই থাকছে।”

মাসী মন্দ কিছু বলে নাই। জানোয়ারেরা ইদানীং লোকালয় পছন্দ করিতেছে। জঙ্গল তাহারা টুরিস্টকে দেখিবার জন্য ছাড়িয়া দিবে বোধহয়। গভর্মেন্ট রকমারি ফন্দি আঁটিয়া, অনেক মাথা ঘামাইয়া প্রোজেক্ট ঘোষণা করিতেছে বটে, কিন্তু একখানি করিয়া প্রোজেক্ট আসিতেছে আর পরদিবসেই চতুষ্পদরা লোকালয়ে আসিয়া হুলুস্থুলু বাধাইতেছে। ঠিক করিলাম, কালীপূজার সময় ইহাই থিম হইবে। মা কালী খাঁড়া হস্তে খাড়া থাকিয়া জানোয়ারদের জঙ্গলে ফেরৎ পাঠাইতেছেন। কনজারভেশনের সহিত মা কালী মিশাইয়া দিলে ব্যাপারটা সেকুলার দেখাইবে।

ইহার পর ‘অনন্ত ভাইরাস’ পত্রিকার ছোকরা এডিটর কয়েকখানি ক্ষুদ্র কবিতা শোনাইল। ইহা নতুন রকমের কবিতা। নিউজিকাল পোয়েট্রি। সংবাদগন্ধী কবিতা।

কবিতা পাঠ

১) বালুরঘাটে হাতে নিয়া গেল বালক মন্দিরের দানবাক্সের টাকা।

২) এসেছিল অজগর মুরগি খাইতে হায়, পড়ি গেল ধরা, জালে, ভুল করি হরিচরণভিটায়।

৩) বিরল প্রাণী পাওয়া গেল ওদলাবাড়ির কাছে, জানা গেছে নাম তার নাকি জায়ান্ট ফ্লাইং স্কুইরেল।

৪) ময়নাগুড়ি মাছবাজার যেন ‘হাল তার কবেকার অন্ধকার গন্ধময় নিশা’।

৫) ঢুকু ঢুকু পান করে প্রিন্সিপাল তুফানগঞ্জে কলেজ চেম্বারে বসি দরজা খুলি দিয়া —প্রশ্ন করিলে কয়, ‘ফলস্য রসম্ ইহা।’

৬) আবার আসিছে অজানা জ্বর এক ধূপগুড়ি জুড়ে নাম তার যাইবে না বলা।

বুঝিলাম খুচরো লেখক আগে টুকরাণু লিখিবার অছিলায় কবিতা লিখিতেন। যাহা হউক। পূজা আসিয়া পড়িল। ডুয়ার্সে খুব একটা বৃষ্টি হয় নাই এই মরসুমে। তাই পূজার আগে আকাশ ভাঙিয়া পড়িলে অবাক হইব না। দুই একখান রেলব্রিজও উড়িয়া যাইতে পারে। বিজয়ার আগাম শুভেচ্ছা জানাইয়া ছিলিম প্রস্তুত করিতে বসিলাম।

ইতি— কলম সিং

ছড়রা

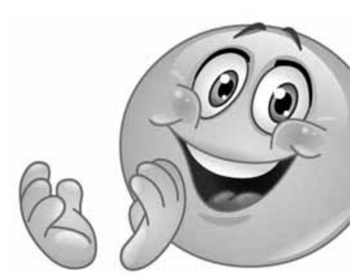

পোতিশ্রুতি

চাইছ যে চাকরিটা
আগে কও কোন্ দল?
কার হয়ে গত ভোটে
করেছিলে কোন্দল?

কার ওতে মাখো তেল
করো কোন্ গোষ্ঠি?
চেটে খাও চুষে খাও
কোন্ মধু যস্টি?

কার ছবি টাঙিয়েছ
ফেস বুক দেয়ালে?
কার পাছে কত লোক
আছে তা কি খেয়ালে?

পারবে কি বদলাতে
ঠিকুজি ও কোষ্ঠি?
টুকটাক পারবে কি
ফস্টি বা নস্টি?

মালকড়ি রেখে যাও
দেখছি কী করা যায়!
চান্স কম, আরে বাবা
চেষ্টা তো করা খায়!

সন্বিত দে

(ব্যঙ্গ ছড়া পাঠান। বিষয় সাম্প্রতিক সময়। ইমেল: editor.ekhonduars@gmail.com)

পাঠকের কলমে

জলপাইগুড়ি বন্যার পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে আজও শঙ্কিত হয় মন

তিস্তার সাথে পরিচয় সেই ১৯৫৮ সন থেকে। সবুজ চা বাগান, অজস্র ছায়া বৃক্ষ, গুটিকয় কোয়ার্টার, রঙিন পাখির ঝাঁক, ছোট ছোট ঝোরা আর চা বাগানের আদিবাসি বন্ধুদের ছেড়ে যেন দেশান্তরিত হয়ে সে বছর এলাম এই শহরে। লেখাপড়া করে বড় হতে হবে যে ! বিষাদ ভরা মন নিয়ে বাসে উঠেছিলাম। বার্নিশ ঘাটে বাস যাত্রা শেষ। মুটেরা মাথায় মাল তুলে হোগলা বন পেরিয়ে নদীর পারে এল। এই সেই তিস্তা নদী। তখন শীতের শেষ তাই শীর্ণকায়া। জোড়া দেওয়া দুটি নৌকোয় চাপলাম দুটো ছোট গাড়ি ও মালপত্রসহ আমরা, তিস্তা পেরিয়ে ভিড়ল ওপারের বালুচরে। এখানেও হোগলা বনের ভেতরে হোগলা বিছিয়ে রাস্তা বানানো। অনেকগুলো বিচিত্র দর্শন চার চাকার মোটরগাড়ি দাঁড়িয়েছিল। ওগুলোই বিখ্যাত ‘চরের ট্যাক্সি’। সেই ট্যাক্সি চেপে পৌঁছলাম শহর সংলগ্ন কোর্টের ঘাটে। তিস্তার সাথে প্রথম পরিচয়ে মনে ধরেছিল চরের ট্যাক্সি ।

বর্ষার উপান্তে মায়ের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে দেখা হয়েছিল কাশবনের পাশ দিয়ে ছুটে চলা বিশাল তিস্তার সাথে। এত জল তাহলে শীতের শেষে কোথায় হারিয়ে যায় ? মা বলেছিল ‘সাগরে’। কিছুদিন পর বাবা বদলি হলেন সাওগা চা বাগানে। কোয়ার্টারের পেছনে টিলার নীচে থেকে যে প্রান্তর দেখা যায় তারপরেই বয়ে যায় রূপোলি রং মেখে তিস্তা। দক্ষিন পূর্ব কোণে ধূসর অস্পষ্ট গজলডোবা, তখন তিস্তা ব্যারেজ ভাবনাতেও নেই। এবার জলপাইগুড়ি থেকে বাগানে যাবার রুট পাল্টে গেল। বাগরাকোটের মোড় থেকে স্টেট বাসে উঠতাম জলপাইগুড়ি যেতে। বন আর পাহাড়ের গায় আলতো পরশে জড়িয়ে থাকে টুকরো টুকরো মেঘ। পাশেই চলে রেল পথ। পাহাড় কেটে কবেই ব্রিটিশরা তৈরি করেছিল এই পথ। চোখে পড়ে নবাগত ফৌজিদের আস্তানা, দু-একটা বন বস্তি। গভীর হয় বন, রাস্তায় ঝাপিয়ে নামে কত যে অনামি ঝর্না। সামনে সেবকের বাঘপুল বা করোনেশন ব্রিজ। বহু নীচে বয়ে যায় সেই তিস্তা।

সেটা ১৯৬৮ সাল। সেবার লক্ষ্মী পূজা ছিল ৪ অক্টোবর। তার একদিন পরেই গৌহাটির পাশেই মালিগাঁও-এ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের সদরে আমার চাকরির ইন্টারভিউ। আলিপুরদুয়ার থেকে লালকাকা ডেকে পাঠালেন। বললেন লক্ষ্মী পূজার দিন বিকালের ট্রেনে গৌহাটি গিয়ে একজনের বাড়িতে কাটিয়ে পরদিন ইন্টারভিউ দিয়ে রাতের ট্রেনেই ফিরে আসা যাবে। অঝোরে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে আগের দিন আলিপুরদুয়ার পৌঁছলাম। ৪ তারিখ সকালেই খবর পেলাম সেদিন ভোররাতে বন্যায় ভেসে গিয়েছে জলপাইগুড়ি শহর ও আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকা। যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। বিকেলে কাকা একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে জানালেন প্রবল বৃষ্টির জন্য রেলপথ ক্ষতিগ্রস্থ তাই আসাম যাবার সব ট্রেন বাতিল। পরদিন ডুয়ার্সের সব যানবাহন বন্ধ, সেদিন বিকেল থেকেই বৃষ্টি কমে এল। তবে ৫ তারিখে বাড়ি থেকে বেরোবার উপায় ছিল না। আকাশবাণীতে ঘনঘন বুলেটিন পাঠ চলছিল জলপাইগুড়ির বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে। ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠেছিল মন। ঠিক করলাম পরদিন বাড়ি যেতেই হবে। বাস স্ট্যান্ডে খোঁজ নিয়ে জানলাম পরদিন অর্থাৎ ৬ তারিখ সকাল সাতটায় একটা বাস ময়নাগুড়ি পর্যন্ত যাবার সম্ভাবনা আছে। রাতেই আমার ছোট্ট ব্যাগে দুটো পাউরুটি ঢোকালাম, সাথে চিনি কিছুটা, দু-তিনটে দেশলাই আর এক প্যাকেট মোমবাতি।

ভেঙ্গেচুরে একাকার পথ। রাস্তা উড়িয়ে দিয়ে ছোট নদীগুলো কি ভাবে গতিপথ পাল্টেছিল, দেখে অবাক হয়েছিলাম। অতবড় তিস্তা ব্রিজের মুখ (অ্যাপ্রোচ)-এর দিকটা কে যেন ম্যাজিকে উড়িয়ে দিয়েছে। তিস্তা কীভাবে পার হব— এই আতঙ্কেই সারাটা পথ এসেছিলাম। শুধু মনে আছে হাসিমুখে ফৌজিরা নদী পারাপারে সাহায্য করছিলেন।

৬ তারিখ সকাল আটটায় জনা কুড়ি যাত্রী নিয়ে বাস যাত্রা করল। কন্ডাক্টার বলেই রেখেছিলেন, ময়নাগুড়ির পথে যতদূর পর্যন্ত রাস্তা ঠিক থাকবে ততদূর গাড়ি যাবে। রাস্তাঘাট ভাঙ্গাচোরা। হাসিমারায় ৮-১০ জন তরুণ বেশ কয়েক বস্তা ত্রাণ সামগ্রি নিয়ে জলপাইগুড়ি যাবে বলে বাসে উঠল। মাদারিহাট থেকে বীরপাড়া পর্যন্ত অনেকটা পথ বিপর্যস্ত। বীরপাড়ায় একটা চায়ের দোকানে হাসিমারার ছেলেদের সঙ্গে রুটি তরকারি খেয়ে আবার চলা।

বেলা সাড়ে তিনটা নাগাদ ময়নাগুড়ি। বাস থামতেই কয়েকজন মানুষ এগিয়ে এসে বললেন ‘এই এলাকা এবং আশপাশের গ্রাম ভীষণ ক্ষতিগ্রস্থ, দোমহনি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। কেউ যদি ত্রাণ হিসেবে কিছু দান করেন তবে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষগুলোর উপকার হয়’। আমার সহযাত্রী ছেলেরা সেই মানুষদের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দিয়েছিল। দোমহনি, বার্নিশ, উল্লারডাবরি যেন মৃত্যু উপত্যকা। আমি সঙ্গে সঙ্গে রওনা দিয়েছিলাম বাড়ির পথে। ভেঙ্গেচুরে একাকার পথ। রাস্তা উড়িয়ে দিয়ে ছোট নদীগুলো কি ভাবে গতিপথ পাল্টেছিল, দেখে অবাক হয়েছিলাম। অতবড় তিস্তা ব্রিজের মুখ (অ্যাপ্রোচ)-এর দিকটা কে যেন ম্যাজিকে উড়িয়ে দিয়েছে। তিস্তা কীভাবে পার হব — এই আতঙ্কেই সারাটা পথ এসেছিলাম। শুধু মনে আছে হাসিমুখে ফৌজিরা নদী পারাপারে সাহায্য করছিলেন। চারিদিকে ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ। মৃত পশুর দেহ পড়েছিল চারদিকে। যদিও কিছু মানুষ অবিশ্রান্ত চেষ্টা করছিল দেহগুলো মাটি চাপা দেওয়ার। অন্যরা কী ভাবে যাতায়াত করছিল মনে নেই তবে আমি একটা পুলিশ ভ্যানে অনেকটা ঘুরে জলপাইগুড়ির বাড়িতে এলাম, প্রায় সন্ধ্যার মুখে। সমস্ত রাস্তাঘাট, বাড়িঘর পুরু পলিমাটিতে ঢাকা। বাড়ির দেয়ালে যতদূর জল উঠে ছিল সেই উচ্চতায় একটা স্থায়ী রেখা বহুদিন ছিল। বন্যার বীভৎসতা বোঝার জন্য ঐ দাগই যথেষ্ট।

সেই রাতেই ভারত সেবাশ্রম সংঘের ক্যাম্প অফিসে হাজির হয়ে আমাদের পাড়ার দুর্দশার কথা জানালাম। ওদের আন্তরিকতায় আমরা ভরসা পেয়েছিলাম। পরদিন আমরা জেলা শাসকের অফিসে হাজির হলাম। সেখানে একজন ম্যাজিস্ট্রেট বন্যাত্রাণের কাজ দেখছিলেন। ভারত সেবা সংঘের এবং সেই ম্যাজিস্ট্রেটের সহযোগিতায় ঐদিন সন্ধ্যায় আমদের পাড়ায় খাদ্যদ্রব্য বিলির কাজ শুরু হয়েছিল। পরে কেরসিন, চিনি, পাউডার দুধ, কম্বল ইত্যাদি নানা রকম জিনিস বিলি করেছিলাম। এই শহরের পুরনো মানুষেরা সবাই ভারত সেবাশ্রম সংঘের সেই ত্রাণকার্য কোনওদিন ভুলতে পারবে না। পাড়ার সব তরুণ একসাথে যে প্রত্যয়ে ত্রাণের কাজ করেছিল তা এখনও স্মৃতিতে উজ্জ্বল। শহরে অবস্থাপন্ন মানুষেরাও দাঁড়িয়েছিলেন রিলিফ সংগ্রহের লাইনে। সেদিন মনে হয়েছিল, বিপর্যয় মানুষকে যেমন সংঘবদ্ধ করে তেমনই বোধহয় আনে প্রকৃত সাম্যবাদ। পুরনো মানুষেরা এখনও ভোলেন নি, বন্যার ঠিক পরেই শিলিগুড়ির মানুষরা দেবদূতের মত সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিল। জল থেকে বিড়ি, জামা কাপড় থেকে ওষুধ, কী পাঠায়নি ! জলপাইগুড়ির আর্ত মানুষ সেই বন্যায় স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেয়েছিল

শিলিগুড়ির অকৃপন সাহায্য ও সহযোগিতায়।

বন্যার পরে পরিস্থিতি আরও কঠিন হল। শহরের রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি তখন পলিতে ঢাকা। ঠিকাদারকুল পলি সরানোর বরাত পেয়ে কাজে লেগে পড়লেন। বাড়িতেও পলি সরানোর কাজ চলছিল। রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ি গেলে চারদিক ধূলোয় অন্ধকার। জেলা শাসকের অফিস এবং বিডিও অফিস ছাড়া সমস্ত সরকারি অফিস বন্ধ। কৃষি ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। বন্যার আগে মাঠে ধানে কেবল ফুল এসেছিল। সব চাপা পড়ে গেল পলির নীচে। খাওয়ার শস্যের অভাব প্রকট হয়ে পড়েছিল কয়েদিনের মধ্যেই। পলির প্রকোপে কয়েক হাজার হেক্টর জমি চাষের অযোগ্য হয়ে পড়েছিল। জলপাইগুড়িতে চা কোম্পানির অফিসগুলো বন্যার অজুহাতে বন্ধ হল বা কলকাতায় সরতে শুরু করল। বহু মানুষ কর্মচ্যুত হল। কিছু বিত্তবান চা শিল্পপতি পরিবার কলকাতায় পাঠালেন।

রাজ্যে তখন রাষ্ট্রপতির শাসন। রাজ্যপাল ডাকসাইটে প্রশাসক ধরমবীর। পরিস্থিতি চাক্ষুস করতে এলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। ধুলোয় ভরা শহরে প্রধানমন্ত্রীর কনভয় এল বিভাগীয় কমিশনারের বাংলোতে, সঙ্গে রাজ্যপাল। বন্যা পীড়িত মানুষ — উৎসাহ নিয়ে অপেক্ষারত। সামান্য ঘটনায় পুলিশ দু-এক জনকে লাঠিপেটা করে। সে সময়ের বাম কর্মী পুষ্পেন ভৌমিক একজন সাধারণ নাগরিককে সঙ্গে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সামনে গিয়ে বলেছিলেন, 'এই মানুষটিকে আপনার পুলিশ সামান্য কারণে লাঠিপেটা করেছে। ঘটনায় নাগরিকরা হতাশ। তারা আপনার কথা শুনতে চায়'। সিকিউরিটির পরোয়া না করে ইন্দিরাজি হনহন করে বেরিয়ে এলেন। পোর্টিকোতে উঠে বিনা মাইক্রোফোনে উপস্থিত মানুষদের শান্ত করে বলেছিলেন, 'আপনাদের এই সঙ্কটের সময়ে সরকার পাশে থাকবে। রিলিফের পূর্ণ ব্যবস্থা করা হয়েছে'। সামান্য ক'টি কথায় মানবিক ছোঁয়া পেয়ে পীড়িত মানুষ উদ্বেল হয়ে উঠল, করতালিতে মুখরিত হল।

বন্যার পরে স্টেশনের পাশেই প্রাত্যহিক বাজার পরিকল্পনাহীন ভাবে চালু হয়েছিল। সেই বাজার এখনও জমজমাট। কিন্তু ভীষণ ভাবে পরিবেশ দূষণ করে চলেছে। মনে আছে রেল আধিকারিকরা পুলিশনিয়ে স্টেশন বাজার উঠিয়ে দিতে এল, আমরা তখন ছাত্র রাজনীতি করি, ঝাঁপিয়ে পড়ে উচ্ছেদে বাধা দিয়েছিলাম। রেল বাধা পেয়ে হাত গুটিয়ে নেয়, এক আধিকারিক বলেছিলেন এই বাজার ভবিষ্যতে মানুষের সমস্যার কারণ হতে পারে।

কিছু বিশেষজ্ঞ মানুষ বলেছিলেন, চওড়া নদীর বুকে রেল ও রাজপথে দুটো ব্রিজ তৈরি করতে যে ভাবে পাথরের বাঁধ দিয়ে নদীপথকে চেপে ধরা হয়েছে তাতে করে হঠাৎ নদীতে বেশি জল এলে সে ভেঙ্গে ফেলবে বাঁধ, স্পার। তৈরি করবেই নিজের যাত্রা পথ। উৎপল ভদ্র, সেচ ও জলপথ দপ্তরের বরিষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার, একান্ত আলাপচারিতায় বলেছিলেন ১৯৬৮ সনের তিস্তা নদীর বন্যার সেটাই সম্ভবত ছিল অন্যতম কারণ। উত্তরবঙ্গের নদীর এটাই চরিত্র। তাকে আটকালে প্রতিশোধ নেবেই।

এই জনপদ সংস্কৃতি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়ে ছিল। বন্যা সে অগ্রগতি ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি। বন্যা পরবর্তী কালে শহর সংলগ্ন অঞ্চলে ইংরাজি মাধ্যমের কয়েকটি বড় বিদ্যালয়, আইন কলেজ, বি.ফার্ম. কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের জলপাইগুড়ি ক্যাম্পাস স্থাপিত হয়েছে। তবে মেডিক্যাল কলেজ, এলএলএম ডিগ্রি কলেজ, বিএসসি (নার্সিং) কলেজ স্থাপন করার আন্তরিক উদ্যোগ নেওয়া হয় নি। নতুন বিষয় সংযোজিত হয় নি ইঞ্জিনিয়ারং কলেজে। চালু করা যায় নি হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ, রোড স্টেশনে কিছু ট্রেনের স্টপেজ, চা নিলাম কেন্দ্র, লোকসংগীত শিক্ষা কেন্দ্র। তৈরি হয়েছে বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গন, সাই এর প্রশিক্ষণ। বন্যার পর নির্মাণ হয়েছিল তিস্তা উদ্যান ও জুবিলি পার্ক। তিস্তা উদ্যানে ভিড় উপচে পড়ে, জুবিলি পার্ক এখন মহামান্য বিচারপতিদের আবাস, সুরক্ষার মোড়কে।

কালের অমোঘ নিয়মে কিছু উন্নয়ন অবশ্যম্ভাবি। করলা নদীর উপর কয়েকটা সেতু হয়েছে, গোশালা থেকে রংধামালি হয়ে শিলিগুড়ি যাবার নতুন রাস্তা হয়েছে। কিন্তু শোনা যাচ্ছে গোশালার মোড়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ আন্ডার পাস তৈরি করবেন, ফ্লাই ওভার নয়, আর সেটা হলে আবারও হবে একটি চরম ভুল। হাল আমলে রাজবাড়ির দিঘির সৌন্দর্য্যায়ন ও সমাগম প্রমাণ করে নতুন প্রজন্মের জলপাইগুড়ি চায় এ শহর আরও সুন্দর হয়ে উঠুক।

উন্নয়নের জন্য নাকি সারা বিশ্বে বৃক্ষ ধ্বংস হয়েই থাকে। কিন্তু উন্নত দেশগুলোতে সর্বত্র নতুন করে গাছ লাগানো একটা সামাজিক আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। গাছ প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করার সহায়ক। আমরা পারছি না কেন? এর সাথে ভূমিক্ষয় প্রতিরোধেরও প্রত্যক্ষ যোগ আছে এবং ভূমিক্ষয় বন্যার ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। আজ পঞ্চাশ বছর পেরিয়েও আকাশ কালো করে যখন বৃষ্টি আসে এই শহরের বরিষ্ঠ বাসিন্দারা তখন বর্ষা প্রীতি ভুলে সেই বর্ষণ মুখর রাতের বন্যার কথা স্মরণ করে কেঁপে ওঠেন। তাঁদের অনেকের আশঙ্কা তিস্তার পেট (বেড) এখন শহরের থেকে বেশ উঁচু। বন্যা প্রতিহত করে বাঁধগুলো, কিন্তু সেগুলোর সংরক্ষণের সঠিক উদ্যোগ তো চোখে পড়ে না। সেতু কাণ্ডের মতই সরকারি চেতনা পরে জাগবে না তো? আজ যখন তিস্তার পারে যাই, সেই শঙ্কিত মন বার বার বলে ওঠে — 'তিস্তা এ তোমার আসল রূপ নয়, আমি জানি কাশফুলের ঘোমটার আড়ালে লুকনো আছে তোমার ভাঙ্গনের রূপ'।

প্রশান্ত চৌধুরী

বিশেষ শারদীয়া প্রতিবেদন

কাশফুল ফোটে তবু...

বিপণনের সমুদ্রে হারিয়ে গিয়েছে সর্বজনীন মন

হ্যাঁ, কাশ ফুটেছে। তিস্তার পাড় জুড়ে কেমন ঢেউ তোলা অন্য এক সাদাফুলের নদী যেন! ভরা ভাদরের দিন পেরিয়ে গুচ্ছ কাশ আর মায়া রোদ্দুরের আলো নিয়ে আশ্বিনের দুয়ারে আমরা। তবু সকালে বা ভোরে, সন্ধ্যেয় বা দুপুরে গুরু গুরু ঘনদেয়ার গর্জন আর বৃষ্টির দস্যিপানা খানিক থমকেও দিচ্ছে, কাজেকম্মে খানিক বাধা পড়ে যাচ্ছে আচমকা! কিন্তু কাগজের পাতায় পাতায় এতো যে আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ তার কী হবে বলুন দেখি? সব্বাই যে ডাকাডাকি করছে — জামা জুতো গয়না মোবাইল টিভি মিক্সি ওয়াশিংমেশিন ফ্রিজ এসি ফার্নিচার বাইক গাড়ি কী নয়? সব্বাই নেমন্তন্ন করেই যাচ্ছে লাগাতার! সেসব চকচকে দোকানে দোকানে, মলে-টলে যেতেও তো হবে, দেখেশুনে বেছেবুছে নিতেও তো হবে কতকিছু!

আর আমন্ত্রণ শুধু কি কাগজে কাগজে? হাতের মুঠোফোন বেয়েও কি নেমন্তন্ন আসছে না? টিভির পর্দায় কি ভাসছে না কত শত রঙিন স্বপ্ন দেখানো সুখছবি? আরও সুন্দর দেখানোর টিপস দিচ্ছেন না রূপ বিশেষজ্ঞরা? দিনের সংখ্যা গুণে কি বলে দিচ্ছে না কেউ যে আগমনীর আগমনের ঠিক ক'টা দিন আর বাকি। শত কাজে ব্যস্ত শতধা বিভক্ত মনটিকে এক বাজারমুখী করে দিচ্ছেন যেন কারা! সময় অল্প, এর মধ্যেই প্রস্তুতি নিতে হবে কিন্তু, কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলছে কে যেন? ওই চারটিদিন নিজেকে অপরূপা হিসেবে দেখতে চাইলে এই সময়টুকুর মধ্যে ঠিক ক'বার সিটিং দিতে হবে আপনাকে পার্লারে গিয়ে গিয়ে? কী কী মাখতে হবে আপাদমস্তক আর আপনার ডায়েট চার্টও তো ঠিক করে দিচ্ছেন পাশ করে আসা ডায়েটিশিয়ানরা! এই মফস্বলী শহরও এখন জিম সচেতন, সেখানেও ইনস্ট্রাকটর পরামর্শ দেবেন আপনার হাত-পায়ের পেশির মাপ ঠিক কত ইঞ্চি হওয়া উচিৎ!

এসময় এই আমার আমিত্ব ঘিরে যে ঘোর ব্যস্ততা! আম জনতার সময় কোথায়, মনই বা কোথায় সার্বজনীন হয়ে উঠবার? মহা ব্যস্ততায় রেডিও সারাইয়ের কথা আর মনে থাকছে না; তায় ভোরে ওঠাও তেমন হচ্ছে না; মহালয়ার সারারাত বাজি পটকার আওয়াজে দুচোখের পাতা এক হয় নি। ভোররাতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণর চণ্ডীপাঠের মন্দ্রিত মন্ত্রোচ্চারণ আর আলোর বেণু বাজানো সুর ভোরের আকাশ থেকে নেমে কবে কোন সুদূরে বিলীন হল তা ঠিক ঠাহর করা গেল না যেন! সকালের ওই রাঙা রোদ্দুর গায়ে মেখে, ঘাসের ওপর থেকে শিউলি কুড়িয়ে, দুর্বা তুলে, গোলাপি স্থলপদ্ম ফুলের ডালায় ভরে কী এক ভালোবাসার টানে, অপূর্ব আবেগে ভেসে সে কি ছুটবে পুজো মন্ডপে? নাগরু ঋষির ঢাকের বোল ছড়িয়ে যাবে মেঠো পথে,বাঁশের ঝাড়ে, সবুজে সবুজ ধানমাঠের ওপর দিয়ে সে ধ্বনি ভেসে যাবে উত্তরে ওই পাহাড় সারির দিকে? যেখান থেকে মা এসেছেন চারটি দিনের জন্যে ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাপের বাড়ি! এই সরল বিশ্বাস, মাটিলগ্ন জীবনের খেত থেকে কুড়িয়ে পাওয়া মহার্ঘ অনুভব, প্রাণ উপচানো আনন্দ লাভের পরিসরই যার জীবনে নেই সে বুঝবে কী করে কেমনতর খুশির জোয়ারে ভাসাতে পারে প্রকৃতির এইসব অনুচ্চারিত দান?

তবে আপনার-আমার আর তেমন চিন্তা নেইকো মোটে; সব দায়িত্বই নিয়ে নিয়েছেন তারাই, মানে আমাদেরই ভাই-বেরাদার ব্যবসায়ীকুল। আপনার ঘর-দোর ও আপনাকে সাজিয়েগুছিয়ে দেওয়া, মায় উৎসবের ক'দিন বাড়িতে রান্নার পাট বন্ধ রেখে বাইরেই খাওয়াদাওয়ার অতি উত্তম ব্যবস্থা — সে মোচার ঘন্ট থেকে চিতলের মুইঠ্যা, ভাপা ইলিশ থেকে এঁচোড়-চিংড়ির স্বাদিষ্ট রেসিপি, চিকেনের হরেক রকম,পাঁঠার কষা থেকে রুইমাছের ঝোল মুড়িঘন্ট কী নয়! বেড়িয়ে বেড়ানোর স্থান নির্বাচন,উপহার দেওয়া-থোওয়ার বিষয় নির্বাচন, ইত্যাদি সর্বপ্রকার সামাজিক পারিবারিক কর্ম-কর্তব্যের দায় তারা নিজস্কন্ধে স্বেচ্ছায় বহন করছেন। আপনার ঘুমিয়ে থাকা ইচ্ছে বা পুজো নিয়ে মৃদু নস্টালজিয়াকে একপাশে আস্তে করে সরিয়ে দিয়ে আজকের অতি আধুনিক নতুন এক আপনাকে সৃষ্টি করছেন সযত্নে তাঁরাই।

সবই কি আর হারিয়েছে নাকি? আছে তো! ফুটফুটে শিউলির মৃদু বাস, হঠাৎ পালটে যাওয়া রোদ্দুরের রঙ কেমন আনন্দের বিভা ছড়িয়ে দিচ্ছে দিগদিগন্তে, বাংলার মানুষের মনেমনে! প্রকৃতি নিজেই সুগন্ধি মেখে সেজে উঠছে। অকারণ আনন্দে 'মাতছে ভুবন' ঝকঝকে নীল আকাশে পালতোলা সাদা মেঘের সাম্পান, কাশের বন! শুধু মনই যেন কেমন খানিক অন্যরকম বেখেয়াল অস্থির! ডেবিট কার্ডে স্মার্ট ক্রয়ে ক্লান্ত হয়ে, প্রাণভরে সেজেগুজে, ব্র্যান্ডেড মালপত্রে ঘর ভরেও বুকের গভীরে কোথায় কীসের জন্যে যেন খচখচ! কী যেন হারিয়ে ফেলার আবছা বেদনা! সে কি ওই ক্যাপ-বন্দুক

তারাবাতি কাচের চুড়ি জিলিপি কচুরি খিচুড়ি-লাবড়া ভোগের প্রসাদ? মাইকে বাজতে থাকা পুজোর গান "ওই গাছের পাতায়/রোদের ঝিকিমিকি/আমায় চমকে দাও/চমকে দাও/ দাও দাও"? নাকি প্রবাসী স্বজনের আগমনে গমগমে উঠোন-বাড়ি, খৈ-মুড়কি-নাড়ুর জন্যে মাটির উনুনে কাঁসার বগিতে জ্বাল দেওয়া গুড়ের গন্ধ, আলতা পরা পা, ব্যস্ত অনেক হাতের চুড়ির সমবেত রিনরিন? কীসের জন্যে পুজো এলেই উদাস হয় মন? পুজো মন্ডপের ধুপ-ধুনোর গন্ধ? নতুন কাপড়ে গ্রামসুদ্ধ পাড়াসুদ্ধ বাড়িসুদ্ধ সর্বজনের মন্ডপে গিয়ে অষ্টমীর অঞ্জলি দেওয়া? আনন্দরসে প্রাণ টইটম্বুর প্রাণে ওই চারটি দিন সেজেগুজে ওই সাধারণ মন্ডপেই বারংবার ঘুরে ফিরে বেড়ানো? আর আজ সারা রাত হেঁটে হেঁটে থিম পুজার মন্ডপে মণ্ডপে ঘুরে, বাংলার অসাধারণ শিল্পীদের অপূর্ব উদ্ভাবনে মুগ্ধ হয়েও নিজেকে কেমন শুধুই বহিরাগত দর্শক মনে হয়, কেন?

সন্ধিপুজোর ঢাক বেজে উঠলে করজোড়ে সর্ব মঙ্গলদায়িনী সর্ব সুফলদায়িনী দশপ্রহরণধারিনী শক্তিময়ী জগজ্জননীর কাছে আকুল প্রার্থনা—দেহি দেহি দেহি—ইহ জগতের সকল কাঙ্ক্ষিত বস্তু আমায় দাও মা! রূপ যশ অর্থ ধন-সম্পদ সুখ-সাফল্য সবই আমায় দিও মা। রোগ শোক জরা যেন আমায় স্পর্শ না করে। অতি সাধারণ গৃহস্থের এমন গভীর বিশ্বাসে একান্ত চাওয়া যে মায়ের কাছেই যুগযুগান্ত ধরে! পূজামন্ডপে ঢাকের তালে ধুনুচি নিয়ে আরতি, দশমীর বিসর্জনে বিষণ্ণ মনে ঘটের জলে মায়ের রক্তিম পা দুটি দেখে নেওয়া, বিসর্জনে যাওয়ার আগে দুর্গা মা আর তাঁর সন্তানদের পান-মিষ্টি খাইয়ে আগামীবার আসবার জন্য নিমন্ত্রণ জানিয়ে রাখা; মনের যা কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা মায়ের কাছে প্রার্থনা করা। এ সবই তো বিশ্বাস থেকে। ওই একশো আট পদ্মর পবিত্রতা, একশো আট প্রদীপের আলোয় মায়ের লাবণ্যময়ী মুখ, দশ প্রহরণে সজ্জিত গরিমাময় মহাশক্তির প্রতিভূ মৃন্ময়ী দেবীপ্রতিমার ত্রিনয়নের অলৌকিক উজ্জ্বলতায় ভালোবাসা আর ভরসা খুঁজে পাওয়া যা ছিল আবাল্য লালিত বোধ, বিশ্বাস তা কি খানিক টাল খেয়েছে?

নইলে পুজো ছেড়ে নিজের ভিটেমাটি স্বজন পরিজন ছেড়ে সারা বিশ্বের খ্যাত-অখ্যাত ট্যুরিস্ট স্পটে এত বাঙালির ভিড় কেন? বিশ্বনাগরিক বাঙালি আর 'ম্যাডিং ক্রাউড' তেমন ভালবাসে না বলে? ভোররাতে উঠে মহালয়ার চন্ডী পাঠ শোনার জন্যে কোনও অবকাশই আর নেই! মোবাইলেই আছে তার বন্ধুর পাঠানো অডিও ক্লিপ, সময় বের করে যে কোনওসময় বাসে ট্রেনে যেতে যেতেও কানে হেডফোন গুঁজেও শুনে নেওয়া যেতে পারে। অষ্টমীর অঞ্জলি, সন্ধিপুজোর ঢাকের আওয়াজ, বিসর্জনের পর ঘরে ফিরে নবযাত্রার সূচনায় দরজায় শোলার ফুল, বড়দের প্রণাম কোলাকুলি, নারকেল নাড়ু আর মুচমুচে নিমকির আপ্যায়ণ সেসব তেমন করে আর টানে কি? নাকি সময়ের সঙ্গে নিঃশব্দে পাল্টে গেল সামাজিক নানা রীতি আচার, নিষ্ঠা, বিশ্বাস, আর সে প্রাণের টান?

দশপ্রহরণধারিণীর আরাধনায় আজও নারী লাঞ্ছনার উপশম হয় কই?

যে মা দুর্গার সঙ্গে আবাল্য পরিচয়, ভয় আর ভক্তির মিশ্র অনুভব তাঁর মূর্তি ঘিরে। তিনি শুধু গয়নাগাটি মুকুটে সুসজ্জিত নন; আত্মরক্ষার জন্য দুষ্টের দমনের জন্যে ভয়ংকর সব অস্ত্র নিয়ে সদা প্রস্তুত— ত্রিশূল,খড়্গ, চক্র,তরবারি, কুঠার, বজ্র, শঙ্খ, তীরধনুক, ঢাল, নাগপাশ ইত্যাদি। মায়ের দৈবীশক্তি, দশ প্রহরণ হাতে দৃপ্তভঙ্গিতে পশুরাজ সিংহের পিঠে দাঁড়িয়ে থাকা, সামনে মৃত রক্তাক্ত মহিষ, ভয়ংকর অসুরকেও ত্রিশূলাঘাতে নিহত করেছেন তিনি। পূজা মন্ডপে মায়ের এই রাজরাজেশ্বরী মূর্তি মনে যুগপৎ ভয় ও ভক্তি দুই ভাবেরই সৃষ্টি করে। তবু দেবীর চোখে করুণা, হাতে বরাভয় মুদ্রা, মুখে মৃদু হাসি ভরসা আর ভালোবাসার বোধও জাগায় প্রাণে।

মায়ের পুজো উপলক্ষে যে আনন্দ উল্লাস, বাণিজ্যের যে সুবিশাল আয়োজন বঙ্গদেশ জুড়ে সেখানে ক্রেতা বা গ্রাহক হিসেবে মূল লক্ষ্য তো নারীই, সাধারণ নারী। নারীকে শক্তি ও সৌন্দর্যের আধার রূপে কল্পনা করে, মন্ত্রপাঠ,যাগযজ্ঞের পবিত্র মন্ত্রে মহিমান্বিত করে, উচ্চাসনে বসিয়ে বিনম্র চিত্তে পুজো করছে, তাঁর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছে, নত হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করছে এই সমাজ। কিন্তু বাস্তবে পার্শ্ববর্তিনী সেই নারীকেই এমন হেনস্থা করে কেন? নারীর দৈবী শক্তি নেই বলে? দৈহিক বলে সে বলীয়ান নয় বলে? এ জগত সংসারে নারী-পুরুষ পরস্পর পরিপূরক,অভিন্ন দুই সত্ত্বা — প্রচলিত এই

সমাজ বা বিদ্যালয় মেয়েদের শান্ত-শিষ্ট হয়ে থাকবার ব্যাপারে যত পরামর্শ রীতিনীতি বিষয়ক পাঠ পড়ায় হঠাৎ আক্রান্ত হলে কন্যাটির করণীয় কী সে বিষয়ে নিশ্চুপ থাকে! ফি-বছর রণসাজে সুসজ্জিত মা দুর্গার পুজো করেও ঘরের দুর্গাটির আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠা বা আত্মশক্তিতে জাগ্রত থাকার সচেতনতা নারী পুরুষ কারও মধ্যেই নেই! সুশীলা নারীর তকমা গায়ে সেঁটে কোনওকালে তেমন কাজের কাজ কিছুই হয়েছে কি?

মূল্যবান বাক্যটিতে প্রাণের থেকে বিশ্বাস করে মনের গভীরে লালন করে মান্যতা দেয় কে বা ক'জন?

পৌরাণিক যুগ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কালেও নারীর প্রতি ঘটতে থাকা বিবিধ ন্যক্কারজনক ঘটনাবলী আমাদের স্তম্ভিত করে, বেদনাবিদ্ধ করে। সাহিত্যে কাব্যে পুজোয় পার্বণে যে নারীর এত স্তুতি, বাস্তবে তার হেনস্থার শেষ নেই। এমনিতে নারী তার সর্বশক্তি ব্যয় করে সংসারে, সন্তানে আর আজকের দিনে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রেও, আত্মরক্ষা বা দুষ্টের দমনের জন্য তার শক্তি বা ক্ষমতার বিন্দুমাত্র সংরক্ষিত থাকে না। একে মানবীর দৈবী মহিমা নেই তায় 'আপনা মাংসে হরিণা বৈরী'। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের চোখ হরিণটিকে খাদ্য ভ্রমে লক্ষ্য রাখে নিজেকে ব্যাঘ্র ভ্রমে লম্ফপ্রদান করে হরিণের মাংস ভক্ষণ করতে চায়। অপ্রস্তুত হরিণ বিবাহপূর্বকালে পড়া, চাকরি, ইন্টারভিউ ,ত্বক কেশ চোখ নখ, সিরিয়াল, অংকন, নৃত্য-গীত, আড্ডা-ফুচকা-রোল-চাউমিন শিখলেও প্রতিকূল পরিবেশে আত্মরক্ষার কৌশল শেখে না। সমাজ বা বিদ্যালয় মেয়েদের শান্ত-শিষ্ট হয়ে থাকবার ব্যাপারে যত পরামর্শ রীতিনীতি বিষয়ক পাঠ পড়ায় হঠাৎ আক্রান্ত হলে কন্যাটির করণীয় কী সে বিষয়ে নিশ্চুপ থাকে! ফি-বছর রণসাজে সুসজ্জিত মা দুর্গার পুজো করেও ঘরের দুর্গাটির আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠা বা আত্মশক্তিতে জাগ্রত থাকার সচেতনতা নারী পুরুষ কারও মধ্যেই নেই!

সুশীলা নারীর তকমা গায়ে সেঁটে কোনওকালে তেমন কাজের কাজ কিছুই হয়েছে কি? সেই পুরাতনকালের উদাহরণ দিয়ে আরও স্পষ্ট করে বলি। যেমন মহাবীর রামচন্দ্রের পত্নী দেবী সীতা, সুন্দরী সুশীলা, বিবাহের পরেই রওনা দিলেন বনে,স্বামী ও দেবরের বাহুবলের ওপর ভরসা করে,আত্মবলে বলীয়ান হয়ে নয় আদৌ। সে বন গমনের ফল কী হয়েছিল তা আমরা জানি। অথবা আশ্রমবাসিনী সরলমতী শকুন্তলা, অকস্মাৎ বনমধ্যে রাজা দুষ্মন্তের সঙ্গে দেখা-মোহমুগ্ধতা, প্রেম, গন্ধর্ব বিবাহ, অন্তঃসত্ত্বা হওয়া। ফল পরবর্তীতে অযুত লাঞ্ছনা অপমান ও দুঃখভোগ! পাঞ্চাল রাজদুহিতা যাজ্ঞসেনী-শ্যামবর্ণা রূপসী,পদ্মপলাশ লোচনা, বুদ্ধিমতী। মহাবীর পঞ্চস্বামীর উপস্থিতিতেই বারংবার লাঞ্ছিত অপমানিত! সতীনারীর তকমা পেলেও সত্যি কি সম্মানের জীবন পেয়েছিলেন তাঁরা? যদি আত্মশক্তিতে বলীয়ান ও শস্ত্রধারিনী হতেন তারা, কী হ'ত? মেনে নিতেন তাঁদের ওপর ঘটে যাওয়া সব অত্যাচার? রমণীয় শতেক গুণের অধিকারী হয়েও স্বজনের দ্বারা, নিকট আত্মীয়ের দ্বারা চূড়ান্ত অপমানিত লাঞ্ছিত হয়েছেন মহাকাব্যের নায়িকারা। 'শুধু রূপে-গুণে ভবি ভোলেনা'— সে কালের মতো একালেও শত বীভৎস অত্যাচার নারীর ওপর! এসিড ছোঁড়ে, নগ্ন করে, ধর্ষণ করে, হত্যা করে, নানাভাবে নারীর অধিকার হরণ করে। নারীর মেধা বা মননকে অশ্রদ্ধা করে ব্যঙ্গ করে অস্বীকার করে। এই বিপুল অকারণ বিরাগটি চিহ্নিত করতে হবে নারীকেই। প্রেমময় স্বামী, স্নেহময় বাবা ভাই শুভানুধ্যায়ীবন্ধু কি আর এ জগতে নেই? আছেন তো। কিন্তু নিজেদের সব কাজকর্ম শিকেয় তুলে তারা সারাক্ষণ কি পাহারাদারি করবেন?

সংসারে নারীর নানাগুণ,রূপ লাবণ্য ধৈর্য মাধুর্য সেবাধর্ম, সংসার মগ্নতা, প্রশ্নহীনতা,অপরকে সুখী,আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত রাখে। কিন্তু সংসার নারীকে সুখ স্বস্তি আনন্দ সম্মান নিরাপত্তা দিতে পারছে কোথায়? সুতরাং আজকের নারীকে নানাবিধ কলা সমূহের চর্চার সঙ্গে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে অনুশীলন করতে হবে বল বা শক্তি বৃদ্ধির। আত্মবল, মনোবল, দেহবল,অর্থবলের সঙ্গে পেশি শক্তি বা দৈহিক বল বৃদ্ধির সাধনা করে যেতে হবে আত্মরক্ষার জন্যেই। ক্যারাটে কুংফু ছাড়াও নানান অস্ত্র চালনাতেও দক্ষ হয়ে ওঠা, আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে, আত্মরক্ষার তাগিদে তাকে ভয়ংকরী হয়ে ওঠা ছাড়া গতি নেই। ঢাকাই শাড়ি আর সিঁদুরের টিপে সুসজ্জিত হয়ে অন্দরের বাগানে পুষ্প চয়নে দোষ নেই, জ্যোৎস্না রাতে ব্যালকনি বা ছাদে টাঙানো দোলনায় দুলতেও দোষ নেই, কিন্তু পশুসদৃশ মানুষ বা আগাছা জঞ্জালে ভরা হাট-বাজার,পথ-ঘাট, বাস-ট্রেন, বিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সুস্থ শরীরে ও মনে চলাফেরা করে টিকে থাকতে হলে হে শুচিস্মিতা অন্য আর কোনও উপায় নেই। রুটি রুজির টানে, কাজে-অকাজে বাইরের জগতে অহরহ বিচরণ করতে হলে মা দুর্গাই হয়ে উঠতে হবে। প্রহরণ ধারণ করতেই হবে! তাই কেবল বণিকের সফ্ট টারগেট হয়ে দুর্গোৎসবের ধনাগম বা সাফল্য বাড়িয়ে আখেরে কোনও লাভ হবে না, নারীকে বলবান হতে হবে খুব শীঘ্রই। মা দুর্গার আরাধনা হোক সেই শক্তিরই আরাধনা।

তনুশ্রী পাল

দেড়শ বছর পূর্তি কি উদ্‌যাপিত হচ্ছে এবার জলপাইগুড়ির দুর্গা পুজোয় ?

ডিজে-তে বাজছে নব্বই'এর দশকের বিখ্যাত সিনেমা 'আশিকি'র গান 'ধীরে ধীরে সে মেরি জিন্দেগিমে আনা, ধীরে ধীরে সে দিলকো চুরানা'রআধুনিক রিমিক্স। পাড়ার মন্ডপে মেয়ে বউদের ভিড় চোখে পড়ার মত নয়, তবু যে কয়েকজন আছে তারাই দুহাতে সামলাচ্ছে পুজোর কাজকর্ম। নানা জায়গায় ঠেক করে আড্ডা মারছে ছেলেছোকরা, মেয়েরাও রয়েছে সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে। দূর থেকে না ভেসে আসছে ঢাকের আওয়াজ, না স্তোত্রপাঠের আওয়াজ। তবু পুজো এসেছে, অন্যান্যবারের মতই সব উৎসবকে ছাপিয়ে দুর্গা পুজো এসেছে, নৌকায় বা ঘোড়ায় চড়ে এসেছে মা দুর্গা, সঙ্গে ছেলেমেয়ে, কলাবউ।

জলপাইগুড়ি শহরটাও অন্যান্য শহরের মতো অনেকটা পালটে গেছে। বয়স্ক যারা এখনও জল শহরের এই আকাশ বাতাসের স্বাদ নিচ্ছেন তাদের চোখেই একমাত্র লেগে আছে সেই সব পুরনো দিনের, পুরনো ঐতিহ্যের গালগল্প।

এখনকার মতো শপিং মল ও ফ্ল্যাটবাড়ির রমরমা হয়নি তখনও, অনেক জায়গাই ছিল ফাঁকা। মাঠ ভর্তি কাশফুল দেখতে শহরতলির তিস্তা চরে যেতে হত না। অট্টালিকার আড়ালে ঢাকা পড়ে নি নীল আকাশ। জলপাইগুড়ি শহর জুড়ে সেই সময় এত বাইরের মানুষের আনাগোনাও ছিল না। এখনকার পুরনো বাসিন্দারাই শক্ত হাতে ধরে রেখেছিল এই শহরের ঐতিহ্য, সে পুজোই হোক বা অন্য কিছু।

রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রম, রাজবাড়ির ঐতিহ্যমন্ডিত বারোয়ারিপুজো ছাড়াও বেশ কিছু বনেদি বাড়ি যেমন নিয়োগীবাড়ি , বাগচিবাড়ি, ভুঁইয়াবাড়ির দুর্গাপুজোর জাঁকজমক ও নিষ্ঠাপূর্ণ আজও।

দূর দূর থেকে আত্মীয়স্বজনেরা এসে ভিড় করত এইসব বনেদি বাড়িগুলিতে। উৎসবের মেজাজটাই হয়ে উঠত অন্যরকম। কোনও কোনও বাড়িতেই প্রতিমা গড়ার কাজ চলত। মহালয়ার দিন থেকেই হয়ে যেত পুজোর শুরু।

সেই বহুকাল আগে থেকেই জলপাইগুড়ির পুজোর ঐতিহ্য বহন করে আসছে রাজবাড়ির পুজো। রাজবাড়ির পুজো মানেই ভেতরের মন্দিরে একচালা প্রতিমা, নিষ্ঠা সহকারে পুজো, ঢাকের আওয়াজ, অষ্টমীর অঞ্জলি। অন্যান্য সব কিছু বদলে গেলেও এখানে এলে আজও পুরোনো জলপাইগুড়ির ছোঁওয়া পাওয়া যায়। আজও এখানে সকাল থেকে শুরু হয়ে যায় ছেলেমেয়েদের ভিড়। ঢোকার মুখে সারি সারি বাইক, সাইকেলের বদলে, কেউ কেউ চার চাকাতেও।

রাজবাড়ি ঢোকার মুখে যে জায়গায় দাঁড়িয়ে ছেলেটি দুরুদুরু বুকে গাছের আড়াল থেকে মেয়েটাকে দেখত লুকিয়ে লুকিয়ে, অপেক্ষা করত মা ঠাকুমার চোখ এড়িয়ে কখন মেয়েটা একবার চোখ দিয়ে ছুঁয়ে যাবে ছেলেটিকে, সেখানে এখন হাজার বাইক দাঁড়িয়ে। তারই ওপরে বসে আড্ডা মারছে জিন্স -পাঞ্জাবি পড়া ছেলেটা আর হাল ফ্যাশনের অফ-শোলডার ড্রেসের মেয়েটা। বাড়ির লোক দেখে ফেলার ভয় নেই। সবটাই 'ওপেন', গোপন বলে কিছু নেই। যুগ বদলের সঙ্গে সঙ্গে এতটুকু বদল তো কমই বলতে হয়, তাই না ?

শহরের একেবারে শেষপ্রান্তে রামকৃষ্ণ আশ্রম। ষষ্ঠী থেকেই জমজমাট। বিখ্যাত অষ্টমীর দিন সকালের কুমারী পুজো। বিভিন্ন পাড়ার মেয়ে বউদের ভিড় এখানে দেখবার মতই। আশ্রমিক ও দীক্ষিত মানুষের

বাইরেও এত লোকের ভিড় আর কোথাও চোখে পড়ে না। প্রতিবছর কোনও কুমারী মেয়েকে দুর্গা মা সাজিয়ে পুজো করা হয়। জলপাইগুড়িবাসীর কাছে এ এক অহংকারের জায়গা। লাইনে দাঁড়িয়ে ভোগ নেওয়া, সবুজ গালিচা বিছানো মাঠে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গল্প, বহু পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হওয়া—আক্ষরিক অর্থেই মিলন মেলার প্রাঙ্গণে পরিণত হয়। মেয়েরা আনকোরা শাড়িতে এবং ছেলেরা পাঞ্জাবি পায়জামা! এখানে এলেই একমাত্র বোধ হয় জলপাইগুড়ি এখনও আছে জলপাইগুড়িতেই।

শহরের একেবারে মধ্যিখানে যোগমায়া কালিবাড়ি। সেখানেও কত বছর ধরে হয়ে আসছে বাৎসরিক দুর্গা পূজা। মন্দিরের গা লাগোয়া বিরাট চাতাল, সেখানেই সাজানো হয় একচালার প্রতিমা। এখনও একই।

তখনকার জলপাইগুড়িতে মাত্র কয়েকটি পাড়াতেই আয়োজন করা হত বারোয়ারি পুজোর। বাবুপাড়া, রায়কত পাড়া, তরুণ দলের মত আরও কিছু পাড়া মূলত পুজো করত। ফলে উন্মাদনাটাই অন্যরকম ছিল। প্যান্ডেলগুলো তেমন বৈভবে ভরপুর না হলেও যেটুকু হত তাই এখানকার এবং আশপাশের কয়েকটি অঞ্চলের মানুষ মুগ্ধ হয়ে দেখত। বেলাকোবা, ময়নাগুড়ি, হলদিবাড়ি থেকে মানুষ 'টাউন'এ আসত পুজো দেখতে। ট্রেনে চেপে হইহই করে সেজেগুজে ঠাকুর দেখতে আসার মজাই ছিল আলাদা। ফেরার পথে 'রুবি বোর্ডিং'এ মোগলাই পরোটা -মাংস। পুজো দেখার পাশাপাশি ছোটদের বেলুন বা প্লাস্টিকের বন্দুক কিনে রাতের ট্রেন ধরে বাড়ি ফেরা। নতুন প্রজন্ম এই অনাবিল আনন্দের স্বাদ কি পাবে কোনওদিন?

তখনকার পুজো মন্ডপগুলো তেমন বিশেষ কারুকাজ করে তৈরি করা হত না। আন্তরিকতা যত বেশি ছিল জাঁকজমক তত ছিল না। প্যান্ডেলের রঙিন কাপড় বলতে ছিল লাল, হলুদ কিম্বা সবুজ। বেশিরভাগ ঠাকুরই ছিল একচালার। প্যান্ডেলের সামনে দু-তিন থাক সিঁড়ি। সামনে আলপনা আঁকা। পাড়ার মেয়ে বউদের অদক্ষ হাতের কাজ, ছেলেরাও পিছিয়ে থাকত না। আবীর, ভূষি নিয়ে তারাও মেতে উঠত। দু'হাত ভর্তি সবুজ রঙ , অথচ ওতেও কত আনন্দ! পুরো চত্ত্বর জুড়ে নানা বাড়ি থেকে আনা টব, তাতে ক্যাকটাস ডালিয়া বা অন্য কোনও পাতা বাহার। বেতের বেড়া, তাতে চকমকে 'রিবন' বাঁধা।

সন্ধে হতে না হতেই জ্বলে উঠল আলো। রাস্তার দু'ধার দিয়ে বাঁশের খুঁটি তাতে একটা করে টিউব লাইট। কেউ কেউ আবার সেগুলোকে লাল সবুজ লাইটিং পেপারে মুড়ে দিয়েছে। ওইটুকুই ব্যস! চন্দন নগরের টুনিবাল্ব এসেছে আরও একটু পরে। জোনাকির মতো মাথার ওপর ঝিকমিক করত, পরবর্তীতে পরিবর্তন এসেছে অনেক।

লাইটের মতো প্যান্ডেলেও কত পরিবর্তন। বাড়ল পুজোর সংখ্যাও। প্রায় সব পাড়ার ক্লাবগুলোই উদ্যোগী হল পুজো করতে। কোনও কোনও কালিমন্দিরেও দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হল। পাড়ায় পাড়ায় মাইকের আওয়াজ। নানা রকমের গান ভেসে আসত হাওয়ায় হাওয়ায়, ঢাকের আওয়াজও। কিশোর কুমার থেকে কুমার শানু, পুরনো দিনের লতা মঙ্গেশকর। গুটিকয়েক স্টুডিওতে চলত সেজেগুজে ছবি তোলার হিড়িক।

কদমতলা ছাড়িয়ে তিন নম্বর ঘুমটির দিকে যেতে দুর্গা বাড়ি। প্রতিবারই ডাকের সাজের প্রতিমা। ইদানিং ওটাই মিলন ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। যারা বাইরে থাকে পড়াশোনা কিম্বা চাকরির খাতিরে, পুজোর ছুটিতে বাড়ি এলেই ওই দুর্গাবাড়ির সামনেই আড্ডা বসায়, ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে। কত চেনা মুখের সারি, বহুদিন পর প্রিয়জনকে দেখার আনন্দ সবার চোখমুখ জুড়ে। শেষের দিনগুলোতে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, গান বাজনায় মেতে ওঠে স্থানীয় শিল্পীরা। একেকবার একেকরকম প্যান্ডেল, বাহারি আলোর রোশনাই, পুরো জলপাইগুড়িই যেন এখানে এসে মেলে ধরে নিজেকে এই চারটে দিনে।

বিশ্বকর্মা পুজোর অনেক আগে থেকেই মার্চেন্ট রোড সহ আরও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কাপড়ের দোকানে উপচে পড়ে ভিড়। জলপাইগুড়িতে এখন শপিংমলের ছড়াছড়ি। সব জায়গাতেই কম বেশি ক্রেতা, ফাঁকা নেই কোনওটাই প্রায়। পুরনো জলপাইগুড়িতে এই কেনাকাটা আরও একটু পরে হত। বিশ্বকর্মা পুজোর পর, আবার কারও মহালয়াও গড়িয়ে যেত। নয়ের দশক থেকে বিখ্যাত কাটাকাপড়ের দোকান 'আধুনিকা', তার সামনের ভিড় সত্যিই ঈর্ষনীয় ছিল। আরও গুটিকয়েক দোকান টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা করত ঠিকই, তবে পাল্লাটা আধুনিকার

এখন কলকাতার সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে জলশহরেও শুরু হয়েছেথিম পুজো। দেশ বিদেশের নানা বিখ্যাত মনুমেন্ট,প্যালেস এমনকি বাদ যায় না সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া কোনো ট্র্যাজেডিও। বড় বড় পত্রিকা, মিডিয়া হাউসগুলো আয়োজন করে প্রতিযোগিতার। চোখের নিমেষে আগেকার ম্যাড়মেড়ে ব্যাপারটা উধাও হয়ে সব কিছু এখন ঝাঁ-চকচকে।

দিকেই ভারি থাকত। জলপাইগুড়িতে যা যা এখনও বদলায়নি তার মধ্যে এই আধুনিকাও আছে, কারণ এখনও এত দোকান, শপিংমল হওয়া স্বত্বেও আধুনিকার সামনের ভিড় কমেছে নামমাত্র। জলপাইগুড়ির বাজার আর আধুনিকা কোথায় যেন একে অন্যের পরিপূরক হয়ে উঠেছে।

এখন কলকাতার সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে জলশহরেও শুরু হয়েছে থিম পুজো। দেশ বিদেশের নানা বিখ্যাত মনুমেন্ট,প্যালেস এমনকি বাদ যায় না সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া কোনো ট্র্যাজেডিও। বড় বড় পত্রিকা, মিডিয়া হাউসগুলো আয়োজন করে প্রতিযোগিতার। চোখের নিমেষে আগেকার ম্যাড়মেড়ে ব্যাপারটা উধাও হয়ে সব কিছু এখন ঝাঁ-চকচকে। রাতে বসে ডিজে-র আসর। পুরনো গানগুলোকে নতুনের মোড়কে মুড়ে সে এক ঝিনচ্যাক ব্যাপারই বটে। নবমীর রাতের উলু বা শঙ্খধ্বনি প্রতিযোগিতা, ধুনুচি নাচও এখন দেখাই যায় না। কারা করবে এসব এখন ?

সারা জলপাইগুড়ি শহর জুড়ে ছোট বড় মিলিয়ে এখন পুজো অসংখ্য। বড় বড় অ্যাপার্টমেন্টগুলোও নিজেরা নিজেরা আয়োজন করে পুজোর। কোনও প্যান্ডেলেই আজ আর অঞ্জলি দেওয়ার জন্য তেমন ভিড় উপচে পড়ে না, সিঁদুর ছোঁয়ানোর দিনও না। কারণ মানুষের হাতে যে এখন 'অনেক'অপশন'।

২০১৮তেও এই যুগের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে জলপাইগুড়িবাসি মেতে উঠেছে দুর্গা মায়ের আরাধনায়। আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসেও দূর দূর থেকে কর্মীরা এসে জুটেছে পাড়ায় পাড়ায়। থিম বা সাজগোজে যতটা সম্ভব গোপনীয়তা বজায় রেখে নিজের নিজের পাড়ার ,ক্লাবের ঐতিহ্য রক্ষার্থে নেমে পড়েছে সবাই।

শান্তিপাড়া যেতে মিলন সংঘ মাঠে হয় দিশারী ক্লাবের পুজো। এবার পঞ্চান্নতম। মহেঞ্জোদরো সভ্যতার নানা দিক তুলে ধরাই এবার ওদের লক্ষ্য। কুমারটুলি থেকে আসবে প্রতিমা।

তরুণদল এবার ঊনষাটতম, করছে বুদ্ধিষ্ট মনাস্ট্রী। প্রতিমা বানাচ্ছেন স্থানীয় শিল্পী জীবন পাল।

জাগ্রত সংঘের আটষট্টিতম পুজোর এবারের থিম 'সবুজের শান্তি।' নানারকম ভেষজ উপাদান দিয়ে গড়ে উঠছে প্রতিমা, করছেন স্থানীয় শিল্পীরাই।

মহুরীপাড়ার ৬৭তম পুজোর বিষয়বস্তু উত্তরবঙ্গের লোকাচার ও নীল বা চড়ক পুজো, প্রতিমাও গড়ে উঠছে চড়ক পুজোর আদলে।

নতুন পাড়ায় আর জি পার্টি শুধুমাত্র দুধারের রাস্তার ওপর নির্ভর করে প্রতিবারই কিছু না কিছু অভিনবত্ব আনে। এবারের কী আকর্ষণ তা জানার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরও কিছুটা সময়।

গত কয়েক বছর ধরে জলপাইগুড়ির শহরতলি পাতকাটায় বিরাট আকারের পুজোর আয়োজন করে স্থানীয়রা। বেশ কিছুবার জনপ্রিয়তার নিরিখে সবাইকে ছাপিয়েও গিয়েছে এরা। দুটো পুজোপ্যান্ডেলেব মধ্যেকার দূরত্ব একশো মিটার মতো। একটা দক্ষিণ পাড়ার পুজো পাতকাটা কলোনি অগ্রণী সংঘ ও পাঠাগার, অন্যটা ওই পাড়ারই পাতকাটা কলোনি কালচারাল ক্লাব ও পাঠাগার।

জলপাইগুড়িতে যতগুলি 'বিগবাজেটের পুজো' হয় এই দুটি তাদের মধ্যে অন্যতম। পাতকাটা কলোনি অগ্রণী সংঘ ও পাঠাগার এবার প্যান্ডেল করছে বাদাম ও বাদামের খোসা দিয়ে। বাইরে মন্ডপের গায়ে থাকবে জোড়া ময়ূর, কৃষ্ণের বিভিন্ন রূপ।

অন্যদিকে পাতকাটা কলোনি কালচারাল ক্লাব ও পাঠাগারের এবারের থিম,'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'। ধান ও পাট দিয়ে তৈরি হবে পুরনো জমিদারের বাড়ি, পালকি। চারপাশে থাকবে সৈন্যের দল, গ্রাম্য বধূ, তৈরি করা হবে বিরাট ঝাড়বাতিও।

পাশাপাশি গড়ে ওঠা দুই মন্ডপে ভিড় কোথায় বেশি হবে এখন সেটা দেখারই অপেক্ষা। কে কাকে টেক্কা দেবে আগের থেকে অনুমান করা কঠিন।

পুজোর জাঁকজমক ও মন্ডপসজ্জার পাশাপাশি প্রতিমা আনা ও বির্সর্জনেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। লাল পেড়ে শাড়ি পড়ে, কুড়ি পঁচিশটি ঢাকের তালে প্রতিমা আনতে যাওয়া বা বিসর্জন দিতে যাওয়া এখন দেখাই যায় না। তবু বির্সজনের দিন পুলিশ প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে এবং পাড়ার বড়দের নির্দেশে বাবু ঘাট, কিং সাহেবের ঘাটে তেমন অঘটন কিছু ঘটে না। করলার দুধারে সুন্দর করে বাঁধাই করে দেওয়া জায়গায় দাঁড়িয়ে মাকে ভাসিয়ে দেওয়ার সময় এখনও সকলে বলে ওঠে ,আবার কবে, বছর পরে। তখন মনে হয় কই কিছু তো বদলায় নি, সব একই তো আছে!

মণ্ডপের থিম নিয়ে এখনই কিছু বলতে নারাজ অনেকেই। তবে মিশন নির্মল বাংলাকে কেন্দ্র করে পুজোমন্ডপ এবার সেজে উঠবে রকমারি সাজে। ঘরের মেয়ে সোনা জয়ী জ্যোৎস্না বর্মণও নির্ঘাৎ হাজির থাকবেন অনেক মণ্ডপে। কিন্তু জেলার দেড়শ বছর পূর্তি কি উদ্‌যাপিত হবে এ শহরের কোনও প্যান্ডেলে? সঠিক জানা গেল না!

শাঁওলি দে

বিশেষ রচনা

পাঁচশ বছরের যে যাযাবরেরা স্থায়ী আস্তানা গেড়েছিল জলপাইগুড়ির ফাটাপুকুরে !

উমেশ শর্মা

উত্তরবঙ্গের ঢাড্ডিগর, সাপুড়ে, আগুনে পুড়িয়ে মাটির পাত্র বা মূর্তি তৈরি করা রাজপথের ধারের যাযাবরদের আমরা চোখের সামনে দেখলেও, তাদের অন্দরমহলের খোঁজখবর নেবার তাগিদ অনুভব করি কম। উত্তরবঙ্গের কিরাত জনগোষ্ঠী নিয়ে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'কিরাতজন-কৃতী' পড়েছেন অনেকেই। ভ্রমণ সাহিত্যে তেমনই একটি উল্লেখযোগ্য বই শ্রী পান্থের 'জিপসিদের পায়ে পায়ে'। ড. জ্যোৎস্নেন্দু চক্রবর্তীর বহু গল্প ও উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে বেদে-বেদেনীদের কথা। জলপাইগুড়ি জেলার ফাটাপুকুরে ১৯৬৯ সাল থেকে ডেরা বাঁধা এক যাযাবর বস্তিতে ২০০১ সালে প্রথম হাজির হয়েছিলাম।

জলপাইগুড়ি— শিলিগুড়ি জাতীয় সড়কের ফুলবাড়িতে, করতোয়া পারের মাঝাবাড়িতে, ফালাকাটার কাছে শিলবাড়িতে হাটে পথের ধারে এমন অনেক অস্থায়ী ডেরা দেখে ভেতরে ঢোকার সাহস হয়নি। কিন্তু ফাটাপুকুরের 'ইরানি বস্তি' নামটার আকর্ষণ উপেক্ষা করা যায়নি।

রাজপথের বাসস্টপ ফাটাপুকুর। পথের উত্তর পাশে ওই জিপসি বস্তি এবং পথের দক্ষিণে ইতিহাস বিখ্যাত ফাটাপুকুরের বিশাল দিঘি। বস্তির উত্তর দিকে ঝানুজ পাড়া, পশ্চিমে গাঠিয়াগছ, রাজগঞ্জ। অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থানটুকু বেছে নিয়েছিল জিপসিরা।

আমরা ইতিমধ্যে এদের সম্পর্কে যাযাবর, জিপসি, ইরানি শব্দগুলো প্রয়োগ করেছি। ইরানি বস্তি নাম হলেও ইরানি, তুরানি, পার্শিদের সঙ্গে বস্তিবাসীদের তিলমাত্র সম্পর্ক নেই। ২০০১ সালে বস্তিতে ছিলেন ১৬৪টি পরিবারের ৭৯৩ জন নরনারী। এঁদের সঙ্গে আলাপচারিতায় জানা যায় যে, এই ভ্রাম্যমান ছোট্ট জনগোষ্ঠী পাঁচশ বছর ধরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যাযাবর, শেষমেশ ডেরা বাঁধে ফাটাপুকুরে।

অবশ্য নর্ডিক, দ্রাবিড়, অস্ট্রিক— সব নৃগোষ্ঠীই তো এক অর্থে যাযাবর। কিন্তু এ বস্তিবাসীরা যাযাবর মাত্র পাঁচশ বছর ধরে। এ স্থায়ী বসতিতে ৩৭৯ জন পুরুষ এবং নারী ৪১৪ জন। পুরুষদের তুলনায় ৩৫ জন বেশি। নারী-পুরুষের সংখ্যার এ তারতম্য প্রজনন সংক্রান্ত কোনও সমস্যার কারণে অবশ্যই নয়, এ তারতম্য তাদের পেশাগত কারণে। অপরাধ জগতের সঙ্গে যুক্ত এ জনজাতি যাকে ইংরিজিতে বলা হয় ক্রিমিনাল ট্রাইব। অপরাধী ধরা পড়লে গণপ্রহারে, পালাতে গেলে পুলিশের গুলিতে, জেলখানাতে অত্যাচারে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। জেলখানাতেও অনেককে অতিবাহিত করতে হয় দীর্ঘ সময়।

অপরাধ জগতের সঙ্গে এদের সংযোগের কথা ওরা নিজেরাই অকপটে স্বীকার করে নেন। তাদের এরূপ স্বীকৃতিকে অস্বীকার করে না সন্নিকটস্থ থানার দায়িত্ববান পুলিশ অফিসারেরাও। রাজগঞ্জ থানার এক অফিসার এক জানান যে, এরা চুরি পেশার সঙ্গে যুক্ত। তবে এরা ছিঁচকে চুরি করে না। এরা রাজপথে নানা দুষ্কর্ম করে থাকে, করে রাহাজানি। হাজার হাজার টাকা এরা চোখের পলকে ছিনতাই করে পালিয়ে যায়। চেইন সিস্টেম, র‍্যালি রেসের মত একজন ব্যাটন অন্যজনের হাতে তুলে দেন। চোরাই মাল পৌঁছে যায় হোটেলের কোনও দামি স্যুটে।

তবে, গত তিরিশ বছর ধরে ওরা এখানে বসবাস করলেও জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি লাগোয়া অঞ্চলে এরা এসব কাজ করে না। ধূপগুড়ি, শিলিগুড়িতে দু' একটি ঘটনা যে ঘটেনি, তা নয়। হয় সেগুলি থানায় জানানো হয়নি, নতুবা নিজেরাই মিটিয়ে নিয়েছিল। বস্তি গড়ে ওঠার তিরিশ বছর পরেও দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মুম্বাই থেকে মাঝে মাঝে এদের সন্ধানে পুলিশ আসে কিংবা রাজগঞ্জ থানাকে জানায়— সে অনুযায়ী তদন্ত হয়। নামধামের গরমিল হওয়ায় এ পর্যন্ত কাউকে অ্যারেস্ট করা সম্ভব হয়নি। ইতিমধ্যে মূল অপরাধী জামিনও পেয়ে যায়।

যেমন স্থানীয় একটি দৈনিকে গত ২৬ জুন, ২০১৮ তারিখে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। তার প্রাসঙ্গিক অংশটুকু এরকম—

ঝাড়খন্ডে ছিনতাই টাকা উদ্ধার রাজগঞ্জে

রাজগঞ্জ, ২৫ জুন ঃ ঝাড়খন্ডের এটিএমে টাকা ভরার বরাত পাওয়া একটি সংস্থা থেকে ছিনতাই হওয়া ৫৪ লক্ষ টাকার মধ্যে ৩৫ লক্ষ টাকা উদ্ধার হল রাজগঞ্জ থেকে। সোমবার ঝাড়খন্ড ও রাজগঞ্জ থানার পুলিশের যৌথ অভিযানে ওই টাকা উদ্ধার হয় ফাটাপুকুরের ইরানি বস্তির বীরেন গোয়ালা ও বিজেন্দ্র গোয়ালার বাড়ি থেকে। ওই দুই পরিবারের সদস্যরা আগেই পালিয়ে যাওয়ায় কেউ গ্রেফতার হয়নি। আটজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেয় পুলিশ। ঝাড়খন্ডের পালামৌ জেলার ডিএসপি প্রেমনাথ বলেন, 'গত ১৫ জুন পালামোয়ের মেদিনীনগর টাউনে এটিএমে টাকা ভরার বরাত পাওয়া একটি সংস্থা একটি বেসরকারি ব্যাংক থেকে ৫৪ লক্ষ টাকা তুলেছিল। ব্যাংক থেকে বেরিয়ে ওই সংস্থার কর্মীরা গাড়িতে ওঠার আগেই মোটরবাইকে চেপে দুই দুষ্কৃতী তাঁদের কাছ থেকে ওই টাকা ছিনতাই করে পালিয়ে যায়। এজেন্সির পক্ষ থেকে মেদিনীনগর থানায় অভিযোগ জানানো হয়। ব্যাংকের সিসিটিভি ফুটেজ দেখে দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করা হয়। তাদের ছবি পাঠানো হয় বিভিন্ন থানায়। সোর্স মারফত খবর জোগাড় করে দুষ্কৃতীদলের কয়েকজনের মোবাইল ফোন ট্র্যাক করে পুলিশ। জানা যায়, দুষ্কৃতীরা গরবা এলাকায় একটি বাড়িতে ভাড়া ছিল। সেখানে হানা দিয়ে বাইকটি উদ্ধার হলেও দুষ্কৃতীরা ট্রেনে চেপে ঝাড়খন্ড থেকে পালিয়ে যায়।' ডিএসপি বলেন, এরপর শুরু হয় মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করা। জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জের ফাটাপুকুরে টাওয়ার লোকেশন পেয়ে এখানকার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তিনদিন আগে রাজগঞ্জে আসে ঝাড়খন্ড পুলিশের দলটি। সোমবার পুলিশের সঙ্গে যৌথ দল ইরানি বস্তিতে হানা দিয়ে বীরেন ও বিজেন্দ্র বাড়ি থেকে ৩৫ লক্ষ টাকা উদ্ধার করে। ডিএসপি বলেন, 'গ্রামগঞ্জে জামাকাপড় বিক্রির ছুতোয় এরা উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় ছিনতাই করত। কিছুদিন আগে মোরাদাবাদে একই কায়দায় এরা ব্যাংকের টাকা ছিনতাই করেছিল। মেদিনীনগর থেকে ছিনতাই হওয়া টাকার মধ্যে ১৯

লক্ষ টাকা এখনও উদ্ধার হয়নি। অভিযান চলবে।'

রাজগঞ্জ থানার ওসি তমাল দাস বলেন, আটজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও প্রমাণের অভাবে কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি। তবে ৩৫ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে। রাজগঞ্জ থানার পুলিশের পক্ষ থেকেও দুষ্কৃতীদের ধরতে অভিযান চালানো হবে।

এরূপ অপরাধের কথা কবুল করেন এ যাযাবর বস্তির নারীপুরুষদের অনেকেই। তবে, ওই বস্তির সরপঞ্চ বা মুখিয়া বর্ণি সিং এবং শিউকুমার সিং এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, একদা অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত এ জাতিকে যখন যে থানার অধীনে অস্থায়ীভাবে বসবাস করবার সুযোগ দেওয়া হয়, তখন তাদের সমস্ত বিবরণই সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তরিত করা হয়। আজ তাঁরা ফাটাপুকুরের স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। কিন্তু তাঁদের সমুদয় বিবরণ থানায় অবশ্যই লিপিবদ্ধ করা আছে। অবশ্য থানায় গত তিরিশ বছর ধরে ধুলোয় চাপা সে সব ফাইলকে চিনতে পারছেন না আজকের থানাদারেরা। বস্তিবাসীরাও অনেকে পুরনো ধান্দা ছেড়ে দিয়েছে। দু' একজন এখনও বাইরে ওই সব কাজ করতে পারে বলে সরপঞ্চের ধারণা।

এরূপ ধারণার কারণ হল আজ সবাই আর দশজনের মত চাকুরি-ব্যবসা-চাষবাস নিয়ে বাঁচতে চায়। সরকার সকলের পুর্নবাসনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করলে অপরাধ জগৎ থেকে এরা সকলের সঙ্গে আলোর জগতে আসবে। এখন প্রয়োজন এদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা, শিল্প, কলকারখানা স্থাপন করে কর্মে নিযুক্ত করা, তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া। তারা প্রতিবার ভোট দেয়, সরকার কিংবা পঞ্চায়েত গঠনে সাহায্য করে কিন্তু কোনও সরকারি সুযোগ এদের ভাগ্যে জোটে না। এরা সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসতে চায়, মিশে যেতে চায় বৃহত্তর জন সমাজে।

আগমন ও বসতি স্থাপন

এই যাযাবর শ্রেণির মানুষেরা দাবি করেন যে, তাদের আদি নিবাস ছিল রাজস্থানে। এঁরা মূলত রাজস্থানী উপজাতি। চিতোরগড় অঞ্চলে এঁরা বসবাস করতেন। রাণা প্রতাপের বীরত্বের কাহিনি এঁদের জীবনের গতিধারার সঙ্গে যুক্ত। এঁরা বিভিন্ন সময়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রাণা প্রতাপকে সাহায্য করতেন। কিন্তু মুঘলদের বারবার আক্রমণে পরাজিত রাণা প্রতাপের সঙ্গে স্থানীয় উপজাতীয় দলপতিরা ক্রমশ হতাশ হতে থাকেন। তাদের উপর চাপ সৃষ্টি হতে থাকে। ফলে, উপজাতীয় দলপতিরা পরাজয়ের লজ্জায় রাজস্থান থেকে পালাতে থাকেন। রাজস্থান থেকে অনেকে পালিয়ে আসেন উত্তরপ্রদেশে। উত্তরপ্রদেশে এখনও তাদের বহু স্বজাতীয় লোক বসবাস করছেন। বিধায়ক মাধো সিং, মোতিলাল নাগর (কানপুর), দীবান নাথ (ফতেহাবাদ), মঙ্গল সিং ভাঁতু (মুরাদাবাদ), সুন্দরলাল নগর (আলীগড়), নথু সিং ভাঁতু (খীরী লখিমপুর), সৈবান নাথ (মথুরা), বন্ধন নট (লক্ষ্ণৌ) প্রভৃতি বহু বিখ্যাত ব্যক্তি এ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত।

উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ 'খানা ওদোশ সমাজ পার্টি' নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছেন। অনসূচিত জাতির কল্যাণের জন্য গঠিত এ সংগঠনের প্রধান কার্যালয় আম্বেদকর কলোনী, মাল এ্যাভিনিউ, লক্ষ্ণৌ। তাদের একটি ইস্তাহারে প্রকাশ— 'হমারা সমাজ দুসরে কী জমিন পর পয়দা হুয়া হ্যাঁয়। আউর দুসরে কী অস্তিত্ব নহী মানতা। জবকি ভারতবর্ষকে হম্ মূল নিবাসী হ্যাঁয়, হমারী পরম্পরা মেঁ ইস বাত কী সাক্ষ্য হ্যাঁয়। হমারে খানা ওদোশ সমাজ কী ইন জাতিয়োঁ মে হিন্দু নট, কলাবাজ, ভাঁতু, বেড়িয়া, বঁদিয়া, চমর, মংগতা, মহাবত, সিংগীবাল, বজানিয়া, কনমৈলিয়া, কপারিয়া, ভার, কিংগিরীয়া, হওড়া, কংজড় (গিহারা), সপেরা, বংগালী, যোগী, কনফাটা, কুঁচ বংধিয়া মুখ্যত হ্যাঁয়'।

একদা ফরাজী আন্দোলনের নেতা মহম্মদ মুহসিন (১৮১৯-৬০) যিনি দুদু মিঞা নামে পূর্ববাংলায় অধিক পরিচিত, বলেছিলেন, জমির মালিক হলেন ঈশ্বর। সুতরাং জমিদারগণ খাজনা আদায় করার অধিকারি নন। ওই কথাই যেন ভিন্নভাবে বলেছেন সমাজবাদী পার্টির লোকজনেরাও। ওদের বক্তব্য— "আমরা অন্যের জমিতে জন্মাই, অন্যের জমিতে মরি। আমাদের অস্তিত্ব কোনও দেশ মানে না অর্থাৎ আমাদের কোনও নির্দিষ্ট ভূখণ্ড নেই। আমরাই ভারতের মূল অধিবাসী। আমাদের বংশ পরম্পরা ওই কথার সাক্ষ্য বহন করে। আমাদের খানা ওদোশ সমাজে আছে— হিন্দু, নট, কলাকার, ভাঁতু, বেড়িয়া, বেদে, চামার, পরান্নজীবী, মহাবত,

এই যাযাবর শ্রেণির মানুষেরা দাবি করেন যে, তাদের আদি নিবাস ছিল রাজস্থানে। এঁরা মূলত রাজস্থানী উপজাতি। চিতোরগড় অঞ্চলে এঁরা বসবাস করতেন। রাণা প্রতাপের বীরত্বের কাহিনি এঁদের জীবনের গতিধারার সঙ্গে যুক্ত। এঁরা বিভিন্ন সময়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রাণা প্রতাপকে সাহায্য করতেন। কিন্তু মুঘলদের বারবার আক্রমণে পরাজিত রাণা প্রতাপের সঙ্গে স্থানীয় উপজাতীয় দলপতিরা ক্রমশ হতাশ হতে থাকেন। তাদের উপর চাপ সৃষ্টি হতে থাকে। ফলে, উপজাতীয় দলপতিরা পরাজয়ের লজ্জায় রাজস্থান থেকে পালাতে থাকেন।

সিংগীবাল, বাদ্যকর, কানের ময়লা পরিষ্কারক, দর্জি, ভার, কিংগিরিয়া, হওড়া, কংজড়, সাপুরে, বংগালী, যোগী, কর্ণভেদকরী, কেশ প্রসাধনকারী ইত্যাদি।"

সমাজের এরূপ পেশাধারী লোকেরা কানপুর, পূর্ণিমা, কাটিহার, ডালখোলা প্রভৃতি স্থানে এক এক সময়ে বাসা বেঁধেছিল, আস্তানা গেড়েছিল। এদেরই একটি শাখা ঘুরতে ঘুরতে হাজির হয়েছিল কোচবিহার জেলার পুন্ডিবাড়িতে। সেখানে থেকে এরা চলে আসে জলপাইগুড়ি জেলার (অধুনা আলিপুরদুয়ার জেলা) শিলবাড়ি হাটে। ১৯৬৮ সালের প্রলয়ংকরী বন্যায় তাদের প্রচণ্ড ক্ষতি হয়। বহু লোকজন মারা যায়। গরু, ঘোড়া ভেসে যায়, মরেও যায় অনেক গৃহপালিত প্রাণী। তাই তারা বন্যার পরে সেখানকার বাস উঠিয়ে চলে আসে রাজগঞ্জ থানায়। একটি থানা অপর একটি থানার কাছে এদের হস্তান্তর করে। রাজগঞ্জে তারা প্রথম ডেরা করে করতোয়া নদীর পারে মাঝিয়ালির ডাঙায়। উঁচু জায়গা। বন্যার সম্ভাবনা খুব কম।

সেখানে থাকতে থাকতেই পরিচয় হয় ফাটাপুকুরের চিত্ত ধাড়া নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে। ফাটাপুকুরে ওই বাঙালি ভদ্রমহোদয়ের বাসস্থান। তিনি ১৯৭০ সালের

চন্দ্র গোয়ালা

১০ মার্চ কিছু জমি বিক্রি করেন যাযাবরদের কাছে। গড়ে ওঠে যাযাবর বস্তি। প্রায় পাঁচশ বছর ধরে ভ্রাম্যমান একটি যাযাবর জাতি এতদিনে পেল একটি স্থায়ী ঠিকানা।

স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করতে গিয়ে এই যাযাবর গোষ্ঠী আর একটি অপরাধ নিজের অজান্তে করে ফেলে। একটি অপরাধপ্রবণ জাতি নানা ভয়ে সর্বদাই সন্ত্রস্ত থাকে। সেরূপ কোনও অমূলক আশংকা থেকেই তারা অপরাধটি করে ফেলেছিল। বিষয়টি খোলসা করে বলা ভাল। জমি রেজিস্ট্রি করবার সময় তারা নিজেদের সঠিক পরিচয় প্রদান করেননি। এঁদের কৌলিক পদবি ছিল করোয়াল, ভাঁতু, সিং, নাথ, নাগর, নট প্রভৃতি। কিন্তু দলিলে ওই অপরাধপ্রবণ গোষ্ঠী নিজেদের সঙ্গোপনে রাখবার জন্যই একটা কাল্পনিক পদবি 'গোয়ালা' ব্যবহার করে। জমির দলিলের অনুসারে পরবর্তী অন্যান্য কাগজপত্রে, পরিচয়ে, নথিভুক্ত 'গোয়ালা'ই তাদের পদবি রূপে পরিগণিত হয়। আজ অবশ্য তারা জোর গলায় দাবি করে যে, 'গোয়ালা' পদবি তাদের কোনও কালেই ছিল না এবং ওই পদবি তাদের নিজস্ব নয়।

পদবি অনুসারে জাতি, বর্ণ, গোষ্ঠীর পরিচয় ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় এক কালে মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হত। দেশভাগের পর অবশ্য অনেকের পদবি উদ্বাস্তু কলোনীতে বা সীমান্তে কর্তৃপক্ষের নথিতে পরিবর্তিত হয়েছে। আদালতে হলফনামা দাখিল করেও পূর্ণবয়স্ক নাগরিক পদবি পরিবর্তন করতে পারেন। বর্তমানে পদবি বর্জন করাও প্রগতিশীল মানসিকতার পরিচয় বহন করে থাকে। বর্তমানে পদবি অনেকাংশে আর জাতি, বর্ণ, ধর্মের পরিচয় বহন করেও না। এই যাযাবর গোষ্ঠীর লোকেরাও আজ সিং, ভাঁতু, নাথ, নট, নাগর প্রভৃতি প্রাচীন কৌলিক পদবিগুলি গ্রহণ ও ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। আবার স্থানীয় রাজবংশী সমাজের সঙ্গে মেলামেশা করে তারা অনেকেই নতুন পদবি 'রায়' ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। সমাজ বিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হচ্ছেন যাযাবরেরাও। পদবি পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সমস্যা বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব।

আজ তাঁদের বংশ পরিচয় নিয়ে বিশেষ কেউ মাথা ঘামাচ্ছেন না। তাঁরা আজ জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ থানার পানিকৌরী অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা। তিরিশ বছরেরও বেশি সময়কাল ধরে এখানে বসবাস করছেন।

পোশাক-পরিচ্ছদ

পোশাক পরিচ্ছদের ব্যবহার দেখে এটা উপলব্ধি করতে কষ্ট হয় না যে এই যাযাবর সম্প্রদায় কোনও এক সময়ে রাজস্থানের অধিবাসী ছিলেন। রাজস্থানী ঘরানায় এদের পোশাক-পরিচ্ছদ ওই গতিধারাকে কিছু টিকিয়ে রেখেছে। তবে, দ্রুত ওই পোশাকেরও পরিবর্তন ঘটছে। ফাটাপুকুরের স্থানীয় বাসিন্দাগণ ওদের ওই পোশাক দেখেই তিরিশ বছর আগে এই যাযাবর শ্রেণিকে ইরানি নামে চিহ্নিত করেছেন। অবশ্য তাই বলে ইরানের লোকেদের সঙ্গে তাদের পূর্ব পরিচয় ছিল, তা নয়। কেন যে, ইরানি নামটাই তাদের পরিচিতির জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল, তা বলা যায় না।

পুরুষের ছিল রাজস্থানী পাগড়ি। এদের খাটো শার্ট ও খাটো ধুতি ছিল সাধারণ পোশাক। হাতে থাকত একটা লাঠি। পায়ের জুতো নাগরাই। মহিলারা পরতেন রং-বেরঙের ঘাগড়া। ঊর্ধবাস ছিল পুরো হাতাওয়ালা কলার দেওয়া ব্লাউজ। সেটিকে ব্লাউজ না বলে ছোট জামা বলাই ভাল। ওই জামায় থাকত বুক পকেট এবং হাত পকেটও। ঘাগড়ার উপর এক দু' ইঞ্চি ঢেকে থাকত জামার ঝুল।

মেয়েরা অলংকার পরতেন খুব জমকালোভাবে। তাদের হাতে থাকত রুপোর মোটা বালা। সেটিকে বলা হত 'পংচি'। গলায় যে রুপোর মোটা হার তারা পরতেন, তাকে বলা হত 'চামেল'। নাকের নাকচাবিকে বলা হত 'গুলাক'। নাকের দুই ফুটোর মাঝখানে 'নোলক'। নাকচাবি পরতেন চার আনা, আট আনা ওজনের সোনার। নাকচাবিতে থাকত পাঁচটি প্যাঁচ। কানে থাকত পাঁচটি ফুটো, উপর থেকে লতি পর্যন্ত। উপর কানে সবচেয়ে যে রিং-টি থাকত তার নাম ছিল বালি। উপর থেকে একই বালি অর্থাৎ রিং ছোট হতে থাকে ক্রমশ। মহিলাদের পায়ে থাকত রুপোর মল।

বর্তমানে অলংকারের মাত্রা ক্রমেই কমে আসছে। হাতে এখন কাচের চুড়িই বেশি। অবশ্য চুড়ি পরতে তারা বরাবরই ভালোবাসতেন। হাত ভরতি থাকত কাচের চুড়িতে। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে পরিমাণটা কমে এসেছে মাত্র। গলার মালাও হয়েছে সাধারণ। মেয়েরা এখন কানে পাঁচটা ফুটো করতে চায় না। লতির ফুটোয় এখন ঝুমকো দুলের প্রচলন বেশি। রুপোর মলের পরিবর্তে এখানকার মেয়েরা রুপোর তোড়া, আঙুলে রুপোর চুটকি পরতে ভালোবাসে।

পোশাকের ক্ষেত্রেও মহিলাদের মধ্যে এসেছে বিরাট পরিবর্তন। বাঙালি মহিলাদের মত এঁরাও এখন শাড়ি-ব্লাউজ পরিধান করেন। স্থানীয় রাজবংশী মহিলাদের অনুকরণ না করে সাজপোশাকের ক্ষেত্রে এঁরা অনুকরণ করছেন শহরবাসিনী শিক্ষিতা বাঙালি মহিলাদের। অন্তর্বাসের ক্ষেত্রে, জুতোর ক্ষেত্রে, ভ্যানিটি ব্যাগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে এবং সর্বোপরি প্রসাধন সামগ্রীর ব্যবহারের ক্ষেত্রে এঁরা সম্পূর্ণরূপে শহরমুখী। অবিবাহিত মেয়েরা ফ্রক, সালোয়ার কামিজ, মিডি, ম্যাক্সি পরিধান করে আর দশজন মেয়ের মতই।

পুরুষরা বর্তমানে শহুরে বাঙালিদের মতই শার্ট-প্যান্ট, শার্ট-ধুতি পরিধান করেন। তাঁদের শার্টের ডাবল বোতাম ঘরে সোনা বা রুপোর বোতাম থাকে। ওই পোশাকে ওরা বাইরে বের হয়। চলাফেরায় সাধারণ শার্ট-প্যান্টই পরে থাকেন যুবকেরা। এঁদের মধ্যে যারা অত্যন্ত গরিব, একমাত্র তাদের পোশাক আশাকে এখনও পুরনো আমল কিছুটা টিকে আছে। এছাড়া গেঞ্জি, লুঙ্গি, টাওয়াল, গামছা ইত্যাদির ক্ষেত্রে যেমন কোনও বৈষম্য নেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে, তেমনই বৈষম্য নেই শীতবস্ত্রেও। সোয়েটার, চাদর, লেপ, তোষক, বিছানা, বালিশ ইত্যাদিতে সর্বত্রই আধুনিকতার ছোঁয়া। চাকুরিজীবী অনেক বাঙালি পরিবার বিলাস-ব্যসনে, সাজে পোশাকে এঁদের সঙ্গে পাল্লা দিতে অক্ষম।

খাদ্যাভাস

একমাত্র সুনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রার সঙ্গেই বুঝি পরিমিত ও সুনির্দিষ্ট খাদ্য গ্রহণের একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। স্থানীয় উৎপাদিত শস্য খাদ্যাভ্যাসকে গড়ে তোলে। এঁদের জীবনযাত্রা কোনও কালেই সুনিয়ন্ত্রিত ছিল না। যখন বনে জঙ্গলে বাস করতেন কিংবা রাস্তার ধারে ছেঁড়া-ফাটা তাবুর নিচে রাত কাটাতেন, তখনও তাঁদের নির্দিষ্ট কোনও খাদ্যভ্যাস গড়ে ওঠেনি। এঁদের জীবনের প্রতিটি দিনই নানা কারণে মৃত্যুর আশঙ্কায় সংকটজনক। পূর্বে বনে জঙ্গলে বন্য প্রাণীদের এরা ছিলেন সহজ শিকার, বর্তমানে গণপ্রহারের সহজ বলি। তাই এই অনিশ্চিত জীবনে তাঁদের নির্দিষ্ট কোনও খাদ্যাভ্যাস গড়ে ওঠেনি। সাজপোশাকে পরিবর্তন এলেও, রান্নাঘরে এখনও সাবেকি প্রথাই চালু।

ফাটাপুকুরে এসে প্রথম পর্যায়ে এঁরা খাদ্যান্বেষণে গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরতেন। ঝানজু পাড়ার বাসিন্দা প্রসন্ন কুমার রায় এক সাক্ষাৎকারে জানান যে, যে সময়ে ওই বিচিত্র পোশাক পরা মানুষরা অশ্রাব্য অশ্রুত বচনে দলবেঁধে গ্রামে ঢুকত, তাদেরকে লুঠেরা রাক্ষস ভেবে ভয়ে গ্রামবাসীরা ঘর ছেড়ে চলে যেত। ওই লুঠেরা পছন্দসই খাসি, পাঁঠা, মুরগি সংগ্রহ করে ফিরে যেত নিজেদের ডেরায়। ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে ভয় পেত নিরীহ গ্রামবাসীরা।

মানুষ সমাজ নির্ভর। তাই স্থান ও কালভেদে দেশজ উৎপাদিত ফসল অনুসারে এঁদের গোষ্ঠীগত খাদ্যাভ্যাস গড়ে উঠেছে। বনচর যাযাবর হিসেবে এদের এককালে প্রধান খাদ্য ছিল পশু-পাখির মাংস, ফলমূল ও মদ্য। দিনের শেষে মদ ও মাংসে জমে উঠত সান্ধ্যকালীন পুনর্মিলন উৎসব। কাজের ধান্দায় গিয়ে নির্বিঘ্নে ফিরে এলে এদের পরিবার খুশি হয় ও পুনর্মিলনের আনন্দে গা ভাসায়। 'গঙ্গা থেকে ভল্গা' উপন্যাসে এরূপ আরণ্যক গোষ্ঠীর সান্ধ্যমিলনের দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে। হৈ-হুল্লোড় করে, আগুনে ঝলসানো মাংস ও মদের সঙ্গে মিশে জারিত হয় এদের জঠরানল। এ উন্মত্ততা শুধু খাদ্যগ্রহণেই নয়, নারী-পুরুষের সম্ভোগ, তাৎক্ষণিক আনন্দেতে এঁরা সান্ধ্য আসরেই মশগুল হয়ে ওঠে। বর্তমানটাই তাদের কাছে একমাত্র সত্য। ভবিষ্যৎ তো সর্বদাই নানা আশংকায় ভরা।

খাদ্যাভ্যাসের অন্যতম অঙ্গ হল খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী। এক্ষেত্রেও প্রাচীন ধারা বহমান। একদা হাতের তালুতে পিটিয়ে পিটিয়ে জোয়ার-বাজরার রুটি অস্থায়ী আগুনে সেঁকে তাঁরা যেমন খেয়েছেন, রুটি প্রস্তুত প্রণালীর ওই ধারা আজও বহু পরিবারে মুছে যায়নি। আজ বেলনায় বেলে রুটি তৈরি করলেও, সেটা মোটা রুটিই হয় এবং তাওয়ায় সেঁকেও তা সাধারণ রুটির মত হয় না। ওই মোটা রুটির সঙ্গে সবজি থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে। এঁরা আজও প্রচুর পরিমাণে মাংস খেয়ে থাকেন। এমন লোকের অভাব নেই, যিনি দু' কেজি মাংস একবারে সাবাড় করতে পারেন।

গোষ্ঠী নির্ভর এরূপ সমাজে খাদ্যগ্রহণ অর্থাৎ ভোজনের রীতি ব্যাপারেও একটা উল্লেখ করা প্রয়োজন। পরিবারের সব সদস্য পাত্র বা থালা থেকে একত্রে খাদ্য গ্রহণ করে থাকেন। এই কৌম রীতি উৎসব অনুষ্ঠানেও মানা হয়ে থাকে। এটি একটি সুপ্রাচীন ধারা। গোষ্ঠীর সংগৃহীত খাদ্যে সকলের সমান অধিকার।

ফাটাপুকুরে এসে প্রথম পর্যায়ে এঁরা খাদ্যান্বেষণে গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরতেন। ঝানজু পাড়ার বাসিন্দা প্রসন্ন কুমার রায় এক সাক্ষাৎকারে জানান যে, যে সময়ে ওই বিচিত্র পোশাক পরা মানুষরা অশ্রাব্য অশ্রুত বচনে দলবেঁধে গ্রামে ঢুকত, তাদেরকে লুঠেরা রাক্ষস ভেবে ভয়ে গ্রামবাসীরা ঘর ছেড়ে চলে যেত। ওই লুঠেরা পছন্দসই খাসি, পাঁঠা, মুরগি সংগ্রহ করে ফিরে যেত নিজেদের ডেরায়। ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে ভয় পেত নিরীহ গ্রামবাসীরা। তবুও কিছু কিছু অভিযোগ থানায় জমা পরেছিল। শেষে থানা থেকে ওদের সঙ্গে চৌকিদার পাঠান হত। গাঁয়ের লোকেরা চৌকিদারের উপস্থিতিতে সাধ্য মত ধান, পাট, চাল, মুরগি দিয়ে অব্যাহতি পেতে চাইতেন। এভাবে ওই যাযাবর গোষ্ঠী ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে এক একদিন ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় অভিযান চালাত। তবে, এ নিয়ে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। আসলে, ওই ক্রিমিনাল ট্রাইবের বিরুদ্ধে কোনও সংঘর্ষে যাওয়ার সাহস ছিল না রাজবংশী মুসলমান অধ্যুষিত পাড়াগুলিতে। গাঠিয়াগছ, বলদিয়া পুকুরি, বৈরাগীপাড়া, ঝানুজ পাড়ায় ঘুরে ঘুরে প্রসন্নবাবুর বক্তব্যই সত্য বলে মনে হয়েছিল সেদিন।

আদায়ীকৃত চাল, ধান, পাট, মুরগি নিয়ে ডেরায় ফিরে এসে হত রান্নার জোগাড়। অতিরিক্ত ধান ও পাট বিক্রি করে কেনা হত টুকিটাকি জিনিসপত্র। মাটির উনুনে বড় কড়াইতে চাপান হত রান্না। মাংস রান্নায় মশলাপাতির কোনও বালাই ছিল না। লবণ, হলুদ অবশ্যই থাকত। পরবর্তীকালে পোড়া পেঁয়াজ, লঙ্কা, ধনে ইত্যাদি মশলা কুন্ডিতে থেতো করে জলে সিদ্ধ করা মাংস দিয়ে দিত। কুন্ডি হল তামার হামান দিস্তা। পানীয় জলের একমাত্র উৎস ফাটাপুকুর। স্নান কাপড়কাচাও চলত সেখানে।

প্রথম দিকে এরা কলাপাতা, পদ্মপাতার থালায় খাবার খেতেন নিশ্চয়ই। কিন্তু, কালক্রমে পেতলের ডেকচি, বাটালি, থারি (থাল), কটোরি (বাঁটি) ইত্যাদি বাসনপত্রের ব্যবহার শিখেছেন। রান্নায় তেল ও মশলার ব্যবহার ছিলই না। মাংসের মধ্যে শুয়োরের মাংস ছিল তাদের সকলেরই খুব প্রিয়।

বর্তমানে এসব কথা শুধুই ইতিহাস এবং কিছুটা স্মৃতিনির্ভর জাবরকাটা মাত্র। রান্নাও যথেষ্ট আধুনিক। ভাত ও রুটি খাদ্যতালিকায় প্রধান সারিতে এসেছে। সকালে চা-নাস্তা, দুপুরে ভাত বা রুটি। রাতেও তাই। এখন একপাত্রে ভোজন বিরল। তবে মদ ও মাংসের প্রচলন এখনও কম নয়। রবিবার, বৃহস্পতিবারে রাজগঞ্জের হাটের প্রথম পর্যায়ের হাটুরে এঁরা। রিকশায় যায় এবং খাদ্যদ্রব্য কিনে রিকশায় মুরগি ঝুলিয়ে

বিকেলেই ফিরে আসে। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে শাক, সবজি এবং প্রচুর পরিমাণে দেশি মুরগি কেনে এঁরা। ২০০১ সালে ব্রয়লার মুরগির প্রচলন এ জনপদে ছিল না।

সারাদিন কাজের ধান্দায় থাকার সময়ে পুরুষদের সঙ্গে থাকে কিছু নাবালক, কিশোর। এরাও কাজের সহায়ক। এরা সহজে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, পেটের খিদে চেপে রাখতে পারে না। ওদের হাতে পয়সা দিলে, ওরা এটা সেটা কিনে খায়। কিন্তু সন্ধেবেলা ডেরায় ফিরলে ওরাও গোগ্রাসে গিলতে থাকে মদ ও মাংস।

পেশা

আমরা এদের পেশা সম্পর্কে একটা কিছু ধারণা করতে পেরেছি। ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি করার সময়ে, পারিবারিক রেশনকার্ডে কিংবা প্রয়োজনীয় সরকারি নথিতে এদের পেশা হিসাবে যা উল্লেখ থাকে, তা হল 'ব্যবসা'। কিন্তু, এঁদের ব্যবসা কী? সে প্রশ্নের গভীরে যেতে হলে এঁদের সঙ্গে গভীরভাবে মিশতে হবে, ওদের আস্থাভাজন হতে হবে। তবে, এঁরা প্রকাশ্যভাবেই স্বীকার করে যে, তাদের একমাত্র পেশা ছিনতাই, রাহাজানি, চুরি। লোকের অসতর্কতার সুযোগ গ্রহণ করে এরা। স্থানীয় দোকানদার পুলক সরকার জানালেন তার উপলব্ধির কথা। শহরে জনবহুল এলাকায় এঁরা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে বুঝতে পারে যে, কোন লোকের ব্যাগে টাকা আছে। কোনও ছোট ছেলে ওই টাকাওয়ালা ভদ্রলোকের জামাকাপড়ে কোনও নোংরা লাগিয়ে দিয়ে সরে পড়ে। দ্বিতীয় কোনও কিশোর কর্মী তাঁকে অনুসরণ করতে থাকে। কোনও না কোনও লোক বা অপরাধ প্রবণ দলেরই কেউ ওই ভদ্রলোকের কাপড়ে নোংরা লাগার কথা উল্লেখ করেন। টার্গেট করা ভদ্রলোকটি যখন কোনও টিউবকলে বা দোকানে জল নিয়ে নোংরা পরিষ্কারে অন্যমনস্ক থাকবেন, ওই সুযোগ গ্রহণ করে দলের কোনও কিশোর বা শিশু। ব্যাগ ক্রমাগত হাত বদল হতে থাকে রিলে রেসের কায়দায়। মুহূর্তে ব্যাগ পৌঁছে যায় হোটেলে থাকা মুখ্য ব্যক্তির কাছে। সাইকেল বা রিক্সা আরোহী কিংবা পথচারীর নিকট থেকে এরা সহজে লুফে নিতে পারে টাকার থলে।

এ পেশার টার্গেট যেমন অসতর্ক পয়সাওয়ালা, তেমনই শিকারের ক্ষেত্র জনবহুল কোনও শহর। জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি থেকে বহু দূরে, ভিন্ন প্রদেশে, ভিন্ন পরিবেশে এরা শিকারের সন্ধান করে। দূরপাল্লার ট্রেন বা বাসযাত্রীরাও এদের সহজ শিকার। পথেঘাটে যে মহিলারা সাজগোজ দেখনদারি হবার চেষ্টা করেন, তাঁরাও শিকার হয়ে ওঠেন সহজে। ওঁরা স্পষ্টভাবে শিকারের পদ্ধতি বা ট্রেড সিক্রেট ফাঁস না করলেও তাদের দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করলেন ওই দোকানদার। স্থানীয় প্রশাসনের কাছেও এঁদের অপরাধ করার ধরণ সম্পর্কে স্পষ্ট কোনও নমুনা নেই।

তবে, ওরা যে নিজেদের ব্যবসায়ী বলে দাবি করেন, তা কিন্তু একেবারে মিথ্যে নয়। পূর্বে উল্লেখিত ইস্তেহারটি এক্ষেত্রে আমাদের সহায়ক। ওদোশ সমাজ পার্টির ইস্তেহারে দেখা যায় যে, এঁরা লোকজনের মনোরঞ্জন করে থাকেন। এঁরা নট অর্থাৎ কলাকার। এদের মধ্যে আছে যারা পাঁঠাকে খাসি বা ষাঁড়কে বলদ করে দেন অর্থাৎ বাদিয়া। বজানিয়া হল বাদ্যকর বৃত্তিকারী। কনমেলিয়া হলেন কান পরিষ্কারকারী বা কর্ণচিকিৎসক। কপারিয়া হল তন্তুবায়। তন্ত্রমন্ত্র, তাবিজ-কবজ নিয়ে ব্যবসা করেন যোগী। কুঁচবধিয়া হল বড় ঘরের মেয়েদের কেশ প্রসাধনকারিনী। কনফটা বাচ্চাদের কানে ফুটো করে দেন। সপেরা সাপ খেলা দেখিয়ে উপার্জন করেন। দর্জির কাজ, চর্মকারের কাজ ইত্যাদি নানা পেশায় চলে এঁদের ব্যবসা।

আসলে যে বৃত্তি নিয়ে তাদের সমাজ গড়ে উঠেছিল, দেশ-কাল-স্থান ভেদে বহু পেশাই আজ লুপ্ত বা নামমাত্র। মানুষ বৃত্তিহারা হলে হয়ে ওঠে অনন্যোপায়। ৪৭-এর দেশভাগ, অসম থেকে বাঙালি খেদাও, একাত্তরের যুদ্ধের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ উত্তরবঙ্গেও আশ্রয়হারা। তাদের বৃহদংশের কোপে জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি জাতীয় সড়কের উত্তরাংশের বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল রাতারাতি উধাও হয়ে যেতে থাকে। আজ ওই সড়কের বিশ কিমি উত্তরেও ফরেস্ট পাওয়া যাবে না। এই যাযাবর গোষ্ঠী যখন ফাটাপুকুরে বসতি স্থাপন করে, তখন তারাও অনন্যোপায় হয়ে গ্রহণ করে লুঠেরার বৃত্তি। পাঁচশ বছর ধরে পেশাহারা হলে ওই গোষ্ঠী যে অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠবেনই, সমাজবিজ্ঞানীরা তা অবশ্যই মানবেন।

বর্তমানে (২০০১) ফাটাপুকুরে স্থায়ীভাবে

এঁরা জন সমাজে ও প্রশাসনের নথিপত্রে অপরাধপ্রবণ জনজাতি বলে চিহ্নিত ও নিন্দিত। কিন্তু, আশ্চর্য যে প্রায় ৮০০ লোকের মধ্যে একজনের বিরুদ্ধেও কোনও সামাজিক কুকর্মের (পরস্ত্রী নির্যাতন, নারী ইলোপ, নারী নির্যাতন, বধূনির্যাতন) কোনও অভিযোগ নেই। মাতলামি করা, বৌ পেটানোর মত সামান্য অপরাধে যুক্ত হলেও, এযাবৎ কেউই অভিযুক্ত হননি— শাস্তি পাওয়া তো দূরের কথা। অশিক্ষা আর সুশিক্ষার পার্থক্য করা কঠিন।

বসবাসকারী এ গোষ্ঠীর কোনও লোক প্রকাশ্যে ওই পেশার সঙ্গে জড়িত নন বলে দাবি করা হয়। যুক্তি হিসাবে সরপঞ্চ বলেন যে, এখানকার কিছু লোক স্থানীয় লোকজনদের নিকট থেকে আবাদি জমি বন্ধক রেখে বা কিনে কৃষিনির্ভর সমাজে পরিণত হওয়ার চেষ্টা করছেন। এরা এখনও পর্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে চাষাবাদের জন্য লাঙল ধরেননি সত্য, তবে অদূর ভবিষ্যতে আলু, টম্যাটো প্রভৃতি চাষে এগিয়ে আসবেন। একাংশ হয়ে উঠবেন সরাসরি কৃষক।

আজ পর্যন্ত অর্থাৎ বিগত তিরিশ বছরে এই তথাকথিত 'ইরানি বস্তি'র কোনও লোকজন সরকারি কিংবা বেসরকারি কোনও চাকুরির সুযোগ পাননি। সরকার এদের প্রতি কীরূপ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছেন, তা অনেকটাই অস্পষ্ট। তবে, এঁরা চাকুরি বা অন্য পেশায় নিযুক্ত হতে আগ্রহী। কিছু কিছু যুবক বস্তির মধ্যেই ইতিমধ্যে গালামাল, পান-বিড়ি প্রভৃতির দোকান দিয়ে রোজগারের চেষ্টাও করছেন।

শিক্ষা

এ নৃগোষ্ঠী শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠী। পুঁথিগত শিক্ষায় দক্ষ না হলেও পেশাগত দক্ষতার

বর্ণি (সরোজিনী) সিং

পরিমাপে এঁরা যথেষ্ট শিক্ষিত। বুদ্ধির অংক পরিমাপ করলে উঁচুতেই থাকবে স্কেল। শিক্ষা মানুষকে বিচার বিশ্লেষণ করতে শেখায়, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে করে দক্ষ। সে সব বিচার করলে পেশার ক্ষেত্রে এঁরা দক্ষ কারিগর। শিল্পী বললেও অত্যুক্তি হয় না। চোর যদি 'নিশিকুটুম্ব' আখ্যা পায়, তবে এঁরা শিল্পীই।

এঁরা জন সমাজে ও প্রশাসনের নথিপত্রে অপরাধপ্রবণ জনজাতি বলে চিহ্নিত ও নিন্দিত। কিন্তু, আশ্চর্য যে প্রায় ৮০০ লোকের মধ্যে একজনের বিরুদ্ধেও কোনও সামাজিক কুকর্মের (পরস্ত্রী নির্যাতন, নারী ইলোপ, নারী নির্যাতন, বধূনির্যাতন) কোনও অভিযোগ নেই। মাতলামি করা, বৌ পেটানোর মত সামান্য অপরাধে যুক্ত হলেও, এযাবৎ কেউই অভিযুক্ত হননি— শাস্তি পাওয়া তো দূরের কথা। অশিক্ষা আর সুশিক্ষার পার্থক্য করা কঠিন।

পুঁথিগত শিক্ষার ক্ষেত্রটি কিন্তু সত্যিই নৈরাশ্যজনক। এঁদের সমাজে উত্তরপ্রদেশে, বিহারে উকিল, ডাক্তার, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী থাকলেও, ফাটাপুকুরে ওই সবের নামগন্ধও নেই। ফাটাপুকুরের যাযাবর বস্তি থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা সর্বসাকুল্যে সাতজন। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন তিনজন— রবি সিং (পিতা শিউকুমার), সরিতা ভাঁতু (পিতা ছবিলাল) ও দীপক সিং (পিতা দীপচাঁদ)। একমাত্র সরিতা ভাঁতু সে বছরই উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে জলপাইগুড়ি প্রসন্নদেব মহিলা মহাবিদ্যালয়ে বিএ ক্লাসে ভর্তি হতে পেরেছিলেন বলে জানা যায়। আবার এ কথাও জানা যায় যে, ফার্স্ট ইয়ারে পড়তে পড়তেই তার বিয়ে হয়ে যায়।

শিক্ষাক্ষেত্রে এরূপ অনগ্রসরতার মুখ্য কারণ হল ওদের দীর্ঘদিনের যাযাবর বৃত্তি। পড়াশোনা অপেক্ষা হাতের কাজ শেখা ও শেখানোতে সবার আগ্রহ বেশি। কিন্তু দিন বদলাচ্ছে। এঁরা থিতু হয়েছেন। তাই পড়াশোনা এগিয়ে চলতে শুরু করছে ধীরগতিতে।

ভাষা সমস্যা এক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা। এঁদের মৌখিক ভাষার ভাঁতু। ওই নামে গোষ্ঠীও আছে। ওই ভাষা চর্চার তিলমাত্র সুযোগ নেই। শিশুকাল থেকে বাঙালি সমাজের

ফাটাপুকুরে কামাক্ষা ও শিবমন্দির

সঙ্গে মিশে বাংলাভাষা শিক্ষারও সুযোগ নেই। 'ভাঁতু' ভাষা হিন্দি ভাষার সঙ্গেও মিল অপেক্ষা গরমিল বেশি। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের সঙ্গে কৌমগোষ্ঠীর শিকড়ের একটা সংযোগ থাকায়, ওরা হিন্দি শিখতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। ওই ব্যবস্থাও এখানে নেই। নেই হিন্দি স্কুল। অতি সম্প্রতি 'দ্য স্যালভেশন আর্মি স্কুল' নামে হিন্দি স্কুল গড়ে উঠেছে মাত্র। একটা হিন্দি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হলেও সেটির ঘরবাড়ি নেই। একজন মাত্র শিক্ষক। ঘর না থাকায় তিনি আসেনও না। 'নিবেদিতা শিশুতীর্থ' নামে একটা বাংলা নার্সারি স্কুল গড়ে উঠলেও, সেখানে বেতন দিয়ে পড়াতে হয়। শিক্ষক বিজয় শর্মা জানালেন যে, ফাটাপুকুরে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষাদানের প্রতিবন্ধকতা অনেক।

এত প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও এখানকার ২০-২৫ জন ছাত্রছাত্রী রাজগঞ্জের মহেন্দ্রনাথ হাইস্কুলে পড়াশোনা করে। কেউ কেউ সুদূরবর্তী শিলিগুড়ির আশ্রমপাড়াতে অ্যাঞ্জেলা হাই স্কুলে, জলপাইগুড়িতে মারোয়াড়ি গার্লস স্কুলে পড়াশোনা করতে ছুটে যায়।

এঁরা প্রায় ভুলেই গেছেন ওঁদের মাতৃভাষা ভাঁতুর কথা। হিন্দি এসে দখল করে নিয়েছে মাতৃভাষার স্থান। তবুও বয়স্কদের কাছে ভাঁতু ভাষার কিছু নমুনা শোনা গেল।

'হাম তিস বরোসে সে এঠে হ্যায়েঙ্গে'— আমরা তিরিশ বছর এখানে আছি। 'হাম এইঠে বাঙালী আদিবাসী হয়ে গেয়ী'— আমরা এখানে বাংলার অধিবাসী হয়ে গেছি। 'হামারে বারে মে যো সোঁচা হ্যাঁয়, হাম ঠিকে আদমি এই গেয়ে'— আমাদের সম্পর্কে যা ভাবছেন, তা ঠিক নয়। আমরাও মানুষ। 'হামনে সরকারোসে কোই সুখ-সুবিস্তী নাহি মিলা, সরকারনে নাহি দিয়া'— সরকারের কাছে থেকে আমরা তেমন সুখ-সুবিধা কিছু পাই না, সরকারও দেয় না। 'হামনে আপনে তে লড়াই নেহি হুয়ে'— আমাদের সঙ্গে আপনাদের কোনও ঝগড়া

ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি করার সময়ে, পারিবারিক রেশনকার্ডে কিংবা প্রয়োজনীয় সরকারি নথিতে এদের পেশা হিসাবে যা উল্লেখ থাকে, তা হল 'ব্যবসা'। কিন্তু, এঁদের ব্যবসা কী ? সে প্রশ্নের গভীরে যেতে হলে এঁদের সঙ্গে গভীরভাবে মিশতে হবে, ওদের আস্থাভাজন হতে হবে। তবে, এঁরা প্রকাশ্যভাবেই স্বীকার করে যে, তাদের একমাত্র পেশা ছিনতাই, রাহাজানি, চুরি। তবে, ওরা যে নিজেদের ব্যবসায়ী বলে দাবি করেন, তা কিন্তু একেবারে মিথ্যে নয়।

বিবাদ হয় না। 'আপ হামকো দুসরি জাগাকে ভাঁতু না বলে'— আমাদেরকে আপনারা অন্য জায়গার ভাঁতু বলে মনে করবেন না।

এই ভাষা সত্যিকারের 'ভাঁতু' ভাষা কি না, তা পরীক্ষা করবার যোগ্যতা প্রতিবেদকের নেই। কিন্তু একথা সত্য যে হিন্দি, বাংলা, ইংরাজি ভাষা দ্রুত সম্প্রসারণ না করলে এ নৃগোষ্ঠী শিক্ষার আলো সম্পূর্ণভাবে পাবেন না। সরকারি বদান্যতারও প্রয়োজন।

আনন্দ উৎসব

এই গোষ্ঠীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আনন্দোৎসব হল সাঙ্ নাচ। সাঙ্ নাচ হল লাঠি দিয়ে নাচ। এঁদের লাঠিখেলায় আছে নানা রূপ ও ভঙ্গী। তবে, সাঙ্ নাচ হল কৃত্রিম যুদ্ধের মহড়া। লাঠালাঠির ভঙ্গী পাল্টে যায় প্রতি মুহূর্তেই। আত্মরক্ষা ও আক্রমণ এবং একই সঙ্গে বাহাদুরি দেখিয়ে আনন্দপ্রকাশ এ নাচের বিশেষ অঙ্গ। হয়ত পুরনো দিনের কোনও যুদ্ধের (রাণা প্রতাপ ও আকবর) ধূসর স্মৃতির ধারক ও বাহক এই যুদ্ধ নাচ।

যুগের পরিবর্তন, ধর্মমতের পরিবর্তন তাদের আনন্দ উৎসবেরও পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বর্তমানে আবির নিয়ে হোলি খেলায় মেতে ওঠে সবাই। দোল উৎসব, জন্মাষ্টমী, রাস উৎসব এই বস্তিকে বেশ মাতিয়ে রাখে। দুর্গাপুজোর সময়ে এঁদের নাচ দেখবার মতন।

দেবদেবী ও পূজাপার্বণ

এই গোষ্ঠীর জাগ্রত দেবতা হলেন 'গুলখি'। সাধারণত ফাল্গুন মাসে দোল উৎসবের সময় এ দেবতার পুজো করা হয়ে থাকে। এই দেবতা মাঝে মাঝে সরপঞ্চ বা মুখিয়াকে স্বপ্ন দেখান। গোষ্ঠীতে কে, কী অপরাধ করছে, কে, কত ধন চুপিসারে আত্মসাৎ করেছে, কীসে সমাজের মঙ্গল হবে— ইত্যাদি স্বপ্ন দর্শনে জানতে পারেন মুখিয়া। মুখিয়া স্বপ্নের কথা প্রকাশ করে অর্থ আদায় করেন। বিচার করেন। বিধান দেন। তবে, গুলখি দেবতা মুখিয়াকে কল্পতরুর মত ধন দানও করেন।

'মেহেরানি' বা 'পুরখা' হলেন জীবন দেবতা। নবজাতকের অশৌচাদি প্রসঙ্গে আমরা এ দেবতার মহিমার কথা আলোচনা করব। 'লহরেদেও' হলেন এ সমাজে অপদেবতা। জঙ্গলে বাস। এ দেবতাকে সন্তুষ্ট রাখতে দুটি বাচ্চা শুয়োরকে ফুটন্ত জলে সেদ্ধ করে নৈবেদ্য প্রদান করা হয়ে থাকে। বাড়ির বাইরে এই পুজো করে সাতজন কিশোরকে নৈবেদ্য খেতে দেওয়া হয়। নৃতাত্ত্বিক বিচারে এই অন-আর্য নৃগোষ্ঠী সম্ভবত অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর মানুষ। তাদের লোকাচার ও দেশাচার, শারীরিক গঠনে এ ধারণাই দৃঢ় হয়। কিন্তু, এঁরা কখন ও কেন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম গ্রহণ করেছেন, তা গবেষণা সাপেক্ষ বিষয়। তবে, ফাটাপুকুরে স্থায়ী বসতি গড়ে তোলার পর তাঁরা যে বৈষ্ণব ধর্মমতে আস্থাশীল হয়ে উঠেছিলেন এবং লাটাগুড়ি হাই স্কুলের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক নদীয়েন্দু গোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য হয়েছিলেন, তা খুব প্রাচীন ঘটনা নয়। ১৯৭৬ সালে তাঁরা বৈষ্ণবমতে হয়েছিলেন দীক্ষিত।

এই দীক্ষা গ্রহণের পরও কিন্তু এই যাযাবর গোষ্ঠী শিব ও শক্তির আরাধনা ত্যাগ করেননি। এ বস্তিতে তিনটি বড় মন্দির স্থাপিত হয়েছিল। মন্দির প্রাঙ্গণের উত্তর প্রান্তে স্থাপিত হয় শ্রী শ্রী কামাখ্যা মায়ের মন্দির। কামাখ্যাধাম থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল মাতৃমূর্তি। ওই মন্দিরের সামান্য দক্ষিণে অর্থাৎ মাঝখানে স্থাপন করা হয়েছিল রাধাকৃষ্ণের মন্দির। মাঝখানে কথাটি বলার তাৎপর্য হল ওই মন্দিরের দক্ষিণে স্থাপিত হয়েছে শিব মন্দির। মন্দির স্থাপনা কাজে এঁদেরকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছিলেন স্থানীয় অধিবাসী অনুপ দত্ত রায়। ১৯৮০ সালে নদীয়েন্দু গোস্বামী মন্দিরগুলি উদ্বোধন করেছিলেন।

আর, এর ফলে অম্বুবাচি, জন্মাষ্টমী, দোল, শিবরাত্রি, রাস উৎসবে গোটা এলাকার ভক্তবৃন্দের মহাসমারোহে পূণ্যস্থানে পরিণত হয়ে ওঠে ফাটাপুকুরের ইরানি বস্তি।

কঠোর অনুশাসন

ধর্মীয় অনুশাসন অপেক্ষা অলিখিত 'পিনাল কোড' এ সমাজকে কঠোর শৃঙ্খলায় আবদ্ধ করে রেখেছে। সমাজের সকলেই ওই শ্রুতিনির্ভর, সরপঞ্চের অভিজ্ঞতা

সঞ্জাত আইনকানুনগুলি কমবেশি জানেন ও মেনে চলেন। সামাজিক অলিখিত আইনগুলির বিচারকর্তা ও ব্যাখ্যাকর্তা হলেন সরপঞ্চ। সরপঞ্চ হলেন ওই সমাজের পঞ্চায়েত। তবে সরপঞ্চের বিধানকে অনেক সময় প্রয়োগিক করতে পারেন যিনি, তিনি হলেন মুখিয়া। সরপঞ্চ হাইকোর্ট হলে তিনি সুপ্রিম কোর্ট।

ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় এ বস্তির সদস্য সদস্যাগণ শুধুমাত্র ভোটার। এঁরা পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় ভোট প্রার্থী হতে পারেন না। তবে, গোষ্ঠীতে সরপঞ্চের মর্যাদা পান সকলের মনোনয়নে। তাই সরকারি পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় কারো বিরুদ্ধে পুলিশ কেস হলে (সাধারণত এমন অভিযোগ হয় না), কেউ অভিযুক্ত হলে ওই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজস্ব সরপঞ্চ বা মুখিয়ার মুখোমুখি হতে হবেই।

এই যাযাবর বস্তির তিনজন প্রধান ব্যক্তির সঙ্গে আলাপচারিতায় (টেপ রেকর্ডারে রেকর্ডেড) অপরাধীর বিচার সংক্রান্ত কিছু তথ্য জানা গিয়েছিল। ওই তিন ব্যক্তি হলেন— শিউকুমার সিং, বর্ণি (সরোজিনী) সিং এবং বিষাণ রায়। উল্লিখিত সিং দম্পতির ৬ কন্যা ও ১ পুত্র। তাঁদের এক কন্যার বিয়ে হয়েছে কাঠমান্ডুতে এবং আর এক কন্যার বিয়ে হয়েছে স্থানীয় সম্ভ্রান্ত এক বাঙালির ঘরে। ওই দম্পতি জানালেন, কীভাবে তাঁরা দোষী বা নির্দোষ ব্যক্তিকে বিচার করে থাকেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি নিজেকে নির্দোষ বলে প্রমাণ করতে চান, তবে তার হাতে পাঁচ কেজি ওজনের একটা উত্তপ্ত লৌহ গোলক প্রদান করা হবে। অভিযুক্ত ব্যক্তি দুই হাতের চেটোয় আকন্দ পাতা বিছিয়ে নিতে পারবে। শুধু হাতের চেটো ঢাকতে দু' তিনটি আকন্দ পাতাই সে নিতে পারবে। অপরাধী হলে তার হাত অবশ্যই পুড়বে এবং নির্দোষ হলে সে ওই গোলকটি নিয়ে সাতফুট দূরত্ব অতিক্রম করতে পারবে। এরূপ পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছে, এমন কোনও অভিযুক্তের কোনও সন্ধান অবশ্য সেদিন পাওয়া যায়নি।

কোনও অবিবাহিতা কন্যা সন্তানসম্ভবা হলে কিংবা তেমন কোনও কলঙ্ক তার চরিত্রে দেখা দিলে, তাকেও নির্দোষ প্রমাণ করতে হয় এরূপ পরীক্ষাটিও আগের পরীক্ষার মতই চমকপ্রদ। এক্ষেত্রে পাঁচ কেজি পরিমিত গরম তেলের কড়াইয়ের মধ্যে একটি কাঁচা টাকা (রৌপ্য মুদ্রা) ফেলে দেওয়া হয়। অভিযুক্ত বা অভিযুক্তা যে নির্দোষ তা প্রমাণ করার জন্য ওই গরম তেলের কড়াই থেকে কাঁচা টাকাটি তুলতে হবে।

ভাগ্যদেবতা ও প্রেমের দেবতা 'গুলখি'-র নাম নিয়ে ওই অমানবিক পরীক্ষা দিয়ে সফল হয়েছিলেন এমন একজন পুরুষ ও একজন মহিলাকে সেদিন প্রমাণ হিসেবে হাজির করা হয়েছিল। সমাজপতিরা তাদের পরীক্ষায় হয়েছিলেন সন্তুষ্ট। একজন পুরুষ অপরাধীকে সরপঞ্চ এমন কঠিন সাজা দিয়েছিলেন যে, ওই ব্যক্তি সারা জীবন পঙ্গু হয়ে এবং অন্যের অনুগৃহীত হয়ে বহু কষ্ট ভোগের পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।

আসলে, যারা সরপঞ্চ হিসাবে সর্বসম্মতিক্রমে মনোনীত হন, তাঁরা দেশ ভ্রমণের ও জীবনচর্চার অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ মানুষ। পুঁথিগত শিক্ষা কম হলেও তাঁদের বুদ্ধ্যঙ্ক অনেক বেশি। মনস্তত্ত্ব বিচারের যোগ্যতা তাঁদের অর্জিত ক্ষমতা। তাই, এঁদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে সমাজে টেঁকা যায় না। সমাজের বাইরে চলে গেলে নিশ্চিত মৃত্যু। অপরপক্ষে সরপঞ্চরাও ওই মর্যাদার আসনকে মান্যতা দিয়ে থাকেন। চটজলদি কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না। স্বৈরাচারী বা পক্ষপাতদুষ্ট হন না। তাঁদের বিচার অধিকাংশক সময়েই সঠিক হয়ে ওঠে। এভাবে কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তিপ্রদানের ভীতি ছড়িয়ে তাঁরা সমাজকে দীর্ঘদিন ধরে একতাবদ্ধ করে রেখেছেন।

এঁরা সহানুভূতিশীল ও নিত্য সাহায্যকারী সহায়ক ব্যক্তিও। দূরে অন্য কোনও স্থানে কেউ ধরা পড়লে, এঁরা অকুস্থলে দ্রুত ছুটে যান। প্রভাব প্রতিপত্তি দেখিয়ে, টাকা-পয়সা খরচ করে বিপদগ্রস্তের পাশে দাঁড়ান। দূরভাষণে বা কোনওভাবে একটা খবর পেলেই মুখিয়া কাজ শুরু করে দেন। সরপঞ্চের মত মিষ্টভাষী, সদালাপি, মিশুকে মানুষ নিজেদের যোগ্যতায় ওই পদে মনোনীত হন, বংশানুক্রমে নন।

সমাজে শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মুখিয়ারা সব সিদ্ধান্তই আর সমালোচনার ঊর্ধে নয়। তবে, বিবেচক মুখিয়াও পরিবেশ পরিস্থিতির চাপে আর আগের মত কঠোর হতেও পারছেন না। ভাঙনের রেখা দেখা না গেলে সমাজের সুকঠোর পার্বত্যভূমিতে ধ্বস নামছে কোনও কোনও ক্ষেত্রে।

সংস্কৃতি, বিবাহরীতি

সমাজ ও সংস্কৃতি অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। অনার্য শব্দটি বহু প্রয়োগে ক্লিশে। যে আর্য, কে অনার্য বর্তমানে মিশ্রিত সমাজে তা নির্ণয় করা কঠিন। বিশেষত যারা বানজারা বা যাযাবার, তাদের সমাজে সংস্কৃতি নিয়ে চর্চাও তুলনায় কম। পাঁচশ বছরের ভ্রামণিক জীবনযাত্রার উপান্তে এসে সঠিক তথ্য সংগ্রহও কঠিন।

এ সমাজের দশটি গোত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। ওই গোত্রগুলি হল— মাহেশ, ধা-পান, কর্ডিয়া, গাহেল্লা, সাহেড্রি, জি-সান, পো-পাচ, চ্যারেইলা, কেইল্লা এবং মন্না। বিবাহাদির ক্ষেত্রে গোত্রের কাঠোরতা মানা হয় তীব্রভাবে। সমগোত্রে বিয়ে নিষিদ্ধ। তবে, গোত্র নিয়ে প্রতিবেদকের সংশয় কাটেনি। অন্য এক যাযাবর রমণীর কাছে কিছু নতুন তথ্য পাওয়া গিয়েছিল। তিনি ভাইস, মাইস, কিসান, ঝাঁপান, কার্ডিয়ে— এরকম কয়েকটি গোত্রের কথা বলেন। মনে হয়, আরও গোত্র থাকতে পারে। তবে তিনিও দাবি করেন যে, মাইসের সঙ্গে মাইসের কিংবা কিসানের সঙ্গে কিসানের বিয়ে হয় না সমগোত্রে।

বিয়েতে শাস্ত্রীয় কোনও পুরোহিত থাকেন না। পৌরহিত্য করেন মুখিয়া বা সরপঞ্চের কোনও একজন। অসুর জনজাতির মধ্যেও প্রতিবেদক এ ধারাটি লক্ষ্য করেছিলেন। বিবাহ প্রক্রিয়ায় কোনও জটিলতা, আড়ম্বর থাকে না। উচ্চারিত হয় না কোনও মন্ত্র, তন্ত্র। শপথ পাঠ, আস্থাজ্ঞাপন, অনুমোদন— এই তিনটি পর্বে সম্পন্ন হয় বিয়ে। চিরবন্ধনের সম্পর্কের নিগড়ে বাঁধা পড়ে দুটি মন।

বিয়ের আড়ম্বরতা থাকে জলুষে— পাত্রপক্ষ ও কন্যাপক্ষের মধ্যে গানের মাধ্যমে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে, আতিথেয়তার আড়ম্বরতায়। এখন ডেকরেটরদের দৌলতে বিশাল সামিয়ানা, তোড়ন। মন্ডপসজ্জা, চেয়ার টেবিল, এলাহি কান্ডকারবার। ভোজের ব্যাপারটিতে সাবেকিয়ানারই প্রাধান্য এখনও। অন্যান্য ক্ষেত্রে আর দশটা বিয়ে বাড়ির হৈ চৈ-য়ের সঙ্গে পার্থক্য খুব একটা বেশি নেই। বিয়েতে বর ও কনে অবশ্যই নতুন কাপড় পরবে। যারা গরিব তাদের ক্ষেত্রেও কমপক্ষে দুটি বস্ত্রের প্রয়োজন। বাঙা অর্থাৎ কার্পাস থেকে হাতে তৈরি সুতে দিয়ে বর-কনের হাতের মধ্যে সূত্রবন্ধন করা হয়। বরের হাতে থাকবে ওই কাঁচা সুতোর তাগা। পিঁড়িতে বসা বর-কনের হাতের সূত্রবন্ধন করা হয়। পিঁড়িতে বসা বর-কনের সামনে ছোট্ট একটা পুকুর কাটা হয়। তবে, পুকুরটিতে অবশ্যই জল থাকবে। ওই জল হল গঙ্গা। গঙ্গাকে সাক্ষী রেখে বর-কনে পুকুরের চারপাশে সাতপাক ঘুরবে। তবে, এই সাত পাকে ঘোরার বিষয়টি স্থানীয় সমাজের প্রভাব কি না, বলা কঠিন।

বর ও কনের হাত থাকবে আটা দিয়ে তৈরি সুস্বাদু ও মুখরোচক এক প্রকার (ঠেকুয়ার মত) পিঠে। ওরা প্রত্যেকবার ঘুরবার সময় প্রেমের ও ভাগ্যের দেবতা গুলখিকে ডাকবে এবং তাঁরই উদ্দেশে ওই গঙ্গাজলে নিবেদন করবে একটি করে পিঠে। পুকুরে জলও ঢালবে। দায়িত্ব, আনুগত্য, সর্বজনের স্বীকৃতি— বিয়ে সম্পন্ন হল। এবার ওই রাতেই ফুলশয্যার পালাপর্ব।

একই বস্তিতে অধিকাংশ বিয়ে হওয়ার ফলে বরযাত্রী ও কন্যাপক্ষের সকলে সকলের পরিচিত। কিন্তু দুটি ভিন্নগোত্রের হওয়ার জন্যই সেদিন যেন সকলেই সকলের অপরিচিত। কিন্তু, অপরিচয়ের সেটাই মুখ্য কারণ নয়। অপরিচয়ের কারণ কথা ও সুর দিয়ে একপক্ষ অন্যপক্ষকে আক্রমণের সুযোগ সৃষ্টি। বিয়ের গীত দিয়ে আপ্যায়ন শুরু হয়। প্রথমে মিষ্টতা ও ক্রমে আক্রমণে ও প্রতি আক্রমণে তিক্ততা।

বিয়ের গীতের প্রচলন বৈদিক যুগ থেকেই। বেদ বিরোধী গোষ্ঠীরাও বিয়েতে গান করেন। সারা ভারতেই আর্য ও অনার্য কৃষ্টিতে বিয়ে উপলক্ষে গীত থাকেই। এঁদেরও আছে। কনেকে চুড়ি পরানোর সময়ে কনে বাড়িতে গেয়েছিল—

'এক মেরি নহি যোয়ানি
পুরানি চুড়িয়া
চুড়িওয়ালে লা দে
আসোয়ানি চুড়িয়া'।

দুঃখ করে কনেবাড়ির এয়োরা গেয়েছেন দুঃখের বারো মাস্যা—

গরমকাল— 'পিয়ারি হইঙ্গি দেখিয়া
রাজা বিনা চারে মাহিনা
গরম কি আয়ে
পাঙ্খা কি ঝুলাইয়ে
রাজা বিনা চারে মাহিনা'।
বর্ষাকাল— 'বর্ষাকি আয়ে
বাংলাকে ছাওইয়োনা
রাজা বিনা চারে মহিনা'।
শীতকাল— সর্দিকে আয়ে
রসুইয়া ওরাইয়োনা
রাজা বিনা চারে মাহিনা'। ইত্যাদি

বরযাত্রী দলের মহিলারা কনের বাড়ি ঢোকার আগে গাইতে থাকে ভাবী নববধূর কল্পিত কলঙ্কের কথা। এরূপ অভিযোগ কানে যেতেই রেগে ফুঁসে ওঠেন কনের বাড়ির মহিলারা। তারাও বরপক্ষের চোদ্দগুষ্ঠি তুষ্টি করতে থাকেন কল্পিত অভিযোগে। এরূপ গালিগালাজের মধ্যে জড়িয়ে পড়েন বরপক্ষের নিকট জন ও কন্যাপক্ষের নিকটজন। শুরু হয় অশ্লীল শব্দবাণের প্রতিযোগিতা। বয়স্করা হাসেন, মজা উপভোগ করেন। উভয় পক্ষের মহিলাদের চরিত্র হনন তো মজাদার শ্রবণ বৈকি।

বরযাত্রী বরণকালে একটি সুমধুর গান—

'বম্বাইয়া কা উঁচা পাহাড়
বরনা মেরা মোটর সে আয়া
মেরে বরনে টিপো সে হ্যাঁয়
টিপো মে জেরে হীরেলাল।
জলদি পে জেরে হীরেলাল।'

আবার কখনও গেয়ে ওঠেন—

'মোটর তেরি রং-বেরং
পাহিয়া চাক্না চুর
থাকানেওয়ালা ছেল্ ছাবিলা
বৈঠে নেওয়ালী ক্যারে লিয়া।'

তর্ক বিতর্কে উস্কানিমূলক গীত

'কুত্তা পালুঙ্গি জরুর / চাহে জান চলি যায়
কুত্তে কি কুচ / দুল্‌হে বাপকি মুচ
কুত্তা পালুঙ্গি জরুর।'

উত্তর— 'কুত্তে কী পীঠি / সে হি দুলহানি কি মাকি সীটি
কুত্তা পালুঙ্গি জরুর।'

গানের সঙ্গে নাচ আছে, আছে অঙ্গভঙ্গী বা তাল এবং একই সাথে চলে বাজনা। আনন্দমুখর রাত্রি হৈ চৈ-এ মেতে ওঠে। বাজি ফোটে, ফুলঝুরি ছোটে— আলোয় ঝলমল করে উঠে রাত। কত শুয়োরের প্রাণ যায়, কত গ্যালন মদ নিঃশেষ হয়— তার হিসেব কেউ রাখে কি না সন্দেহ। খানা-পিনা-নাচনা-গানা-বাজানায় এক সময়ে রাত কাবার হয়ে যায়। উঠোনে, বারান্দায়, ঘরে, বিয়ের মন্ডপে যেখানে সেখানে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে প্রমত্ত নরনারী।

ওদিকে ফুলশয্যার রাতে মধুযামিনী কাটায় নবদম্পতি। বিয়ের ব্যাপারে বাল্যবিবাহকেই বেশি গুরুত্ব দিতেন এককালে। বিধবা বিবাহও ছিল সচল। বর্তমানে লেখাপড়ার সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং সামাজিক সচেতনতাও বেড়ে যাওয়ায় পরিবর্তন ঘটেছে সমাজে। পনের বছরের নিচে বিবাহিত কন্যাকে সেদিন ক্ষেত্রসমীক্ষায় কাছে পাওয়া যায়নি।

অসবর্ণ বিয়ে বা ভালোবাসার বিয়ে কিন্তু কালের নিয়মে ঘটেই চলেছে। এ সমাজ থেকে তিন তিনটে মেয়ে বাঙালি যুবককে বিয়ে করেছে। এক মান্য বাঙালিবাবুর পুত্রবধূ রূপে তাদেরই একজনের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়াও রেলের চাকুরে অন্য এক বাঙালি যুবক এখানকার জামাই। এরূপ অসম বিয়ে কিন্তু উভয় পক্ষই মেনে নিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা মনে হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ইরানি বস্তিতে কিন্তু স্থানীয় কোনও ভিন্ন সম্প্রদায়ের বাঙালি কন্যা বধূ হয়ে আসেনি। কোনও যাযাবর যুবককে বর বর বলে মনে ধরলেও হয়ত লোকনিন্দার ভয়ে বলতে বাধ্য হয়েছিল যা যা বর। হয়ত কোনও বাঙালি মেয়ে বানজারার জীবন গ্রহণ করতে চায়নি।

জাতকাশৌচ

নবজাতকের জন্ম হয় ঘরেই। এ যাবৎ (২০০১) সরকারি কোনও হাসপাতালে আসন্ন প্রসবাকে পাঠানো হয়নি। শিশুর জন্ম মুহূর্তে প্রসূতিকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন দাদিমা (দিদিমা)। তবে, নবজাতকের নাড়ী ছেদন করেন দাইমা। তিনি ওই গোষ্ঠীভুক্ত নারী। দাদিমা জাতীয় বয়স্ক মহিলারাই নবজাতকের স্নান করান, দারু মেশানো ঈষদুষ্ণ গরম জলে। মদ নিশ্চয়ই জীবাণু নাশকের কাজ করে বলে ওই প্রথাটি বহমান।

জাতকের জন্য অশৌচ পালন করা হয় ছয় দিন। ওই প্রথা ছয় ষষ্ঠীরই অনুকরণে কিংবা হিন্দুধর্মের প্রভাবে কি না বলা কঠিন। তবে ষষ্ঠীর দিন শিশুর কেশ ছেদন করা হয় এবং ওই কাজ করেন শিশুর পিতা। সেদিনও শিশুকে দারু মেশানো জলে স্নান করানো হয়। স্নানের পর ওই জল ছিটিয়ে দেওয়া হয় বাড়ির সর্বত্র। নাপিত ও পুরোহিত ছাড়াই ঘটে অশৌচান্ত।

শিশুর অন্নপ্রাশন জাতীয় কোনও অনুষ্ঠান এ সমাজে পালিত হয় না। তবে, যুগের চাহিদা অনুসারে কোনও কোনও পরিবারে জন্মদিন পালন চালু হয়েছে। মৃতবৎসা কোনও নারীর সন্তান প্রসবের ছয় দিনের দিন শিশুর কান ফুটো করে দেওয়া হয়। প্রচলিত বিশ্বাস হল, শিশুটির শরীরে কোনও খুঁত থাকলে অশুভ আত্মা কিংবা 'লহরদেও' শিশুটির কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। 'মেহেরানি বা পুরখা' দেবতা তাকে রক্ষা করবে। এই কর্ণভেদ প্রথা কোনও শাস্ত্রীয় আচার মেনে হয় না।

নবজাতককে ঘিরে ক'দিন ধরে স্বাগত জানিয়ে মঙ্গলগীত গেয়ে থাকেন মহিলারা। একটি গান উল্লেখ করা হল—

'হরিলাল ভুঁইয়া গেরে
বেটা জনম হুয়া, ধরতি পর গিরা
দাঈ মাঙ্গে পাঁচ রুপাইয়া
ফুফিনে দে দো রুপাইয়া
দাদিনে দে দশ রুপাইয়া
হরিলাল ভুঁইয়া গেরে।'

হরিলাল সিংয়ের শিশু ভূমিষ্ঠ হল। বেটার জন্ম হল তো মাটিতে স্থান হল। দাঈ খুশি হয়ে চাইল পাঁচ টাকা। মাসি দিল দু'টাকা। দিদিমা দিল দশ টাকা। আহা! হরিলালের ছেলে জন্ম হল।

মৃতাশৌচ ও সমাজ

ফাটাপুকুরের ভাঁতু সম্প্রদায় হিন্দু। কিন্তু স্থানীয় হিন্দুদের কিংবা হিন্দু শাস্ত্র বিধির সঙ্গে এদের জীবনচর্চা মেলে না। তবে, ক্রমশ আচার আচরণের সংমিশ্রণ ঘটে চলেছে। চিরাচরিত ঐতিহ্য এঁরা ভুলে যেতে পারেননি, নতুনকেও পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। মৃতের পারলৌকিক ক্রিয়া কর্মাদিতে বিষয়টি স্পষ্ট হতে পারে।

কোনও ব্যক্তির মৃত্যু হলে, তাকে নতুন বস্ত্রে সাজান হয়। বাঁশ বা কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয় শেষ শয্যা। শবকে সাজান হয় ফুল দিয়ে। একমাত্র বিধবা মহিলারাই সদ্য বিধবার হাতে তুলে দেন দুঃখের হাঁড়ি— একটি মাটির পাতিল। মৃত স্বামীর মাথায় আঘাত করে দুঃখের হাড়ি ভাঙেন সদ্য বিধবাটি। এরপর নিকট আত্মীয় বিধবাগণ সদ্য বিধবার হাতের চুড়ি, শাঁখা ভেঙে দেন। মুছে দেন কপালের সিঁদুর।

এরূপ আচার শেষ হলে নিকট আত্মীয়গণ কাঁধে তুলে নেন শবাধার। নিকটবর্তী কোনও নদীকে গঙ্গা মনে করে তার উদ্দেশে যাত্রা করেন। এঁরা সাধারণত নদী তীরেই বসবাস করেন। কিন্তু ফাটাপুকুরে কোনও নদী না থাকায় তাঁরা কিলোমিটার দেড়েক দূরবর্তী চাওয়াই নদীতীরেই সৎকার করে থাকেন। মৃতের শেষযাত্রায় সামিল হন আবালবৃদ্ধবণিতা। একমাত্র শিশু ও অশক্ত ব্যক্তিরাই থাকেন ডেরায়। শবযাত্রায় থাকে আধুনিক ব্যান্ডপার্টি। পথে সরষে, যব, তিল ও পয়সা ছিটোতে থাকে সকলে।

স্থানীয় লোকেদের বাঁশ, বেওয়ারিশ গাছ, কেনা কাঠ দিয়ে সাজান হয় চিতা। মুখাগ্নির কোনও বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। বছর দশেক ধরে সন্তানই মুখাগ্নি করে। চিতা জ্বলতে থাকে। নাচে, হাসিতে ও মদ্যপানে মেতে ওঠেই সবাই। চিতা অর্ধেক জ্বলে গেলে বা শেষ পর্যায়ে এলে ওঁরা চিতাকে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নেন। বাড়িতে এসে যথানিয়মে জীবনযাত্রা চলতে থাকে।

হিন্দু সমাজে চিতার শবারোহণের সময় একটা নিয়ম মানা হয়। মৃত ব্যক্তি পুরুষ হলে তাঁকে উবু করে শোয়ানো হয় এবং তিনি মহিলা হলে তাঁকে শোয়ানো হয় চিৎ করে। শবাচ্ছাদনের কাপড় তুলে নিয়ে মৃতার লজ্জা স্থান দ্রুত খড়ি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। তারপর খড়ি দিয়ে চিতা সাজান সম্পূর্ণ করা হয়। হিন্দুধর্মের বিশ্বাস, এ সংসারে আগমনের সময়ে যেমন কোনও বস্ত্র থাকে না, শেষ যাত্রাতেও থাকবে না কোনও বস্ত্র। যাযাবর সমাজে ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। এঁদের মধ্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকেই চিতায় চিৎ করে শোয়ান হয়। মৃতের শরীর থেকে কোনও বস্ত্রই তুলে নেওয়া হয় না। মৃতের পুত্র-কন্যা-পরিজনের সামনে শবের কাপড় তুলে তাঁকে নতুন করে লজ্জা দেওয়া যায় না। মৃতকে শ্রদ্ধা জানানোই ভদ্রতা।

আর একটি বিষয়ে এঁরা ব্যতিক্রমী। সধবা নারীকে এঁরা বধূবেশেই চিতায় তুলে দেন। তাঁর গায়ে অলংকারাদি থাকলেও, তা খুলে নেওয়া হয় না। ওই অলংকারের সোনা বা রূপা এঁরা পরদিন চিতার ছাই থেকে খুঁজে সংগ্রহ করেন। সাধারণত ওই অলংকার চুরিও যায় না। বিধবা নারীকে সাদা কাপড়ে চিতায় তুলে দেওয়া হয়। নারী বা পুরুষ সবাইকে উত্তর দিকে মাথা রেখে চিতায় তুলে দেওয়াই নিয়ম।

মৃতকে স্নান করান বা তাঁর উদ্দেশে পিণ্ডদান— এ সমাজে দেখা যায় না, এ সম্প্রদায় পরলোকে বিশ্বাস করেন এবং বিশ্বাস করেন পুনর্জন্মেরও। সাধারণভাবে তিনদিন পরে মৃতের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া পালন করা হয়। তবে এ বিষয়ে নিয়মের কড়াকড়ি নেই। যে পরিবারে কেউ মারা যান, ওই পরিবারের আর্থিক সঙ্গতির উপর নির্ভর করে দিন ধার্য করা হয়। প্রয়োজন হলে এক, দেড় মাস পরেও শ্রাদ্ধ হতে পারে। যতদিন শ্রাদ্ধ না হয়, ততদিন ওই পরিবারটি সামাজিক কোনও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। নিজের বাড়িতেও কোনও মঙ্গল বা শুভ কাজ করতে পারবে না।

শ্রাদ্ধে প্রধান অনুষ্ঠান হল ভোজ। ওই ভোজের প্রধান ভোজ্য সামগ্রী হল দারু ও শুয়োর। এটা সংগ্রহ করার সঙ্গতি সবার থাকে না বলেই শ্রাদ্ধের দেরি হতে পারে। শ্রাদ্ধের দিন বা তার পূর্বেই চিতা ভস্ম থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে আসা হবে অস্থি। নতুন পাতিলে রাখা হবে ওই অস্থি। শ্রাদ্ধের পর নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হবে। অনেকে গঙ্গাতেও বিসর্জন দিয়ে আসেন অস্থি। চিতাভস্ম বা অস্থি নদীর পারে মাটিতে পুঁতে দিয়ে সেখানে নির্মাণ করা হয় কাঁচা বা পাকা স্তূপ। চাওয়াই নদীর তীরে এমন অনেক সমাধি রাজপথ থেকেই দেখা যায়। ক্ষুদ্রাকার চতুষ্কোণ ওই স্তূপ এক একটি শবের স্মৃতি স্মারক। শ্রাদ্ধের পর অশৌচ কেটে যায়। আবার যথারীতি রোজগারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন পরিবারের লোকজন।

প্রশাসনিক সমস্যা

এই আদিম জনগোষ্ঠী পশ্চিমবঙ্গে কী নামে চিহ্নিত হবে, জেলা প্রশাসনের কাছে এটি একটি বিরাট প্রশ্ন। তপশিলিভুক্ত জাতি বা উপজাতি তালিকায় যে সব জনজাতির কথা উল্লেখ করা আছে, ওই তালিকায় 'ভাঁতু' সম্প্রদায়ের নাম নেই। এঁরা তপশিলভুক্ত উপজাতি— তা মানছেন সকলে। কিন্তু, ওই কাজে প্রধান বাধা হল লালফিতার বাঁধন! অবজাতি (সাব কাস্ট) নিয়েই সমস্যা। রাজ্যের অনসূচিত জাতি বা উপজাতির তালিকায় 'কারোয়াল' বা 'ভাঁতু' কোনওটাই

নেই যে।

আলোচনার প্রথমাংশে বৃত্তি পরিচায়ক যে জাতি বা উপজাতির কথা উল্লেখ করা হয়েছিল, ওই ভাঁতু, কারোয়াল, কানমৈলিয়া, কুঁচ বধিয়া, কপাইরয়া প্রভৃতি পেশাকে মান্যতা দিয়ে তাদেরকে তপশিলিভুক্ত গোষ্ঠীর শংসাপত্র দিতে দ্বিধাগ্রস্থ সমাজ উন্নয়ন দপ্তর, সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তর। ফলে ফাটাপুকুরের বস্তিবাসীদের ছুটতে হচ্ছে বিহারে, উত্তরপ্রদেশে। সম পদবিধারী ব্যক্তির সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক দেখিয়ে, তাঁর সংগৃহীত শংসাপত্রের প্রত্যায়িত অবিকল নকল এনে জমা দিতে হচ্ছে রাজগঞ্জ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তরে। ওই দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ওই সব প্রমাণ পত্রের বৈধতা নিয়ে নিঃসংশয় হতে চান না। কারণ, এঁরা মূলত অপরাধপ্রবণ জাতি। জাতির কলঙ্কেই এঁরা কলঙ্কিত ও ব্রাত্য। তাই হাজার সততরা পরীক্ষা দিয়েও উপজাতি শংসাপত্র সংগ্রহে অপরাগ এঁরা। এটাই ওঁদের নিয়তি। একটার পর একটা চাহিদা মেটাতে বছরের পর বছর গড়িয়ে যাচ্ছে। নেতা-নেত্রীদের আশ্বাসবাণী ও নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে। তারপর যথাপূর্বং তথা পরম্। এঁদের অর্ধেক মানুষেরই রেশন কার্ড নেই। এঁরা সমাজের মূল স্রোতে মিশে যেতে যতটা তৎপর, আপাতদৃষ্টিতে এবং এঁদের জবানিতে ততটাই নির্বিকার প্রশাসন। ফলে, সরকারি সহায়তা এঁদের কাছে এযাবৎ (২০০১) অধরাই। প্রত্যাশা, এ সংকট থেকে এঁরা অচিরেই মুক্ত হতে পারবেন।

হালহকিকৎ

২০১৮ সালের ৩ জুন রবিবার দুপুরে আবার একদিন যাযাবরদের ইরানি বস্তিতে ওদের বিগত ১৮ বছরের অগ্রগতির একটা হালকিকৎ জানতে হাজির হয়েছিলাম। সেদিন হঠাৎ আসরে মধ্যমণি আবার বর্ণি (সরোজিনী) সিং এবং তাঁর স্বামী শিউমঙ্গল সিং। ওই দুই মুখিয়ার সঙ্গে আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন রবি, একতা, নম্রতা, সারিকা, সিমরণ, চন্দন, মেঘা, গিরীজা সহ অনেকেই।

বিগত আঠার বছরের উন্নয়ন দাঁড়িয়ে আছে স্বোপার্জিত অর্থে সৃষ্ট ঘরবাড়িতে, মন্দিরে এবং পোশাকে আধুনিকতার বাহারে। এ সব চোখে পড়ে। জল নিকাশি নালা করে দিয়েছে পঞ্চায়েত।

শিক্ষার অগ্রগমন কিন্তু এখনও ঘোলাজলের আবর্তে। অমৃত সিং-এর কন্যা একতা শিলিগুড়ির সূর্য সেন কলেজে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। স্নাতক স্তরে তৃতীয় বর্ষে পড়ছে তারই দিদি নম্রতা। সেবক সিং-এর পুত্র মণীষ সিং দ্বিতীয় বর্ষেরই ছাত্র। এমবিএ করেছেন দু'জন, কিন্তু তারা বাইরে থেকেই ওই পড়াশোনা চালিয়ে বাইরেই সেটেলড। এ সমাজে মাস্টার ডিগ্রি এখনও কারোরই কপালে জোটেনি।

তবে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঘটেছে আকাশ ছোঁয়া পরিবর্তন। সমাজে এখন আর তাঁরা প্রকাশ্যে বানজারা বা যাযাবর নামে কেউ উপহাসের পাত্রপাত্রী নন। পুরনো আমলের সাজপোশাক অবলুপ্ত, ট্রাঙ্ক-সুটকেসের তলাতেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। পুরনো সাজপোশাকের স্মৃতি ধরা আছে শুধু বয়স্কদের মননে। পুজো-আর্চায় ঘটেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। লহরদেও এখন ওদের চোখে ডাকিনী, যোগিনীর মত অপদেবতা। এককালে জঙ্গলে ছিল তাঁর অবস্থান। এখন জঙ্গল কোথায়! মেহেরাণী হয়েছেন। হিন্দুদেবী কালী এবং কামাখ্যা। পুরখা হয়েছেন ইষ্টদেব বা দেবী।

এ সমাজ থেকে বহু পেশা যেমন বিলীন হয়েছে, তেমনই বিলুপ্ত হয়েছে বহু গোত্র। জিসান, ঝাপান, মন্না, পো-পট প্রভৃতি গোত্রের মানুষের অস্বিস্তত্ব এখন এ সমাজে নেই। পেশাজীবী মানুষের যে তালিকা আমরা এ নিবন্ধের প্রথমাংশে উল্লেখ করেছিলাম, তাঁদের মধ্যে নট, সপেরা, কনমৈলিয়া, কলাবাজ প্রভৃতি বহু পেশাধারী মানুষের অস্তিত্ব এ সমাজে আর নেই। পেশার ঘটেছে পরিবর্তন। যুগের দাবি অনুযায়ী রোজগারের পথ বেছে নিতে হয়েছে।

অশৌচ পালনের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটেছে। জন্মাশৌচ ও মৃতাশৌচে হিন্দু ধর্মের ছাপ স্পষ্ট। এখন শ্রাদ্ধাদি কর্ম দশদিনে করা হয়। অর্থের অভাবে শ্রাদ্ধকর্ম আর ফেলে রাখা যায় না। বিয়ে-সাদি এখন আর সম্পূর্ণ আগের মত ধারায় সম্পন্ন হয় না। পুরোহিতের প্রবেশ ঘটেছে। রেজিস্ট্রি বিয়েও হচ্ছে। জন্মাশৌচ পালন করা হচ্ছে আগের মত ছয় দিনই। কিন্তু, শিশুর 'মুখে ভাত' নবতর সংযোজন।

পেশার পরিবর্তনের একটা উদাহরণ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। মেঘা সিং এ এলাকায় একাই ৫০ বিঘা জমি কিনেছেন। অন্যান্য ব্যক্তির জমির পরিমাণও কমপক্ষে ১০০ বিঘা হতে পারে। এঁরা নিজ হাতে চাষ করেন না ঠিকই কিন্তু ধান, আলু সহ বিভিন্ন ফসল ফলান ওই জমিতে।

ভোটের রাজনীতিতে এঁরা কিছুটা হলেও ব্রাত্য। পঞ্চায়েত কিংবা বিধানসভা ভোটে এঁরা অবশ্যই ভোটার। ভোট দেন নিয়মিত। কিন্তু, এ যাবৎ এ সমাজ থেকে কোনও যাযাবর নারী বা পুরুষকে নির্বাচন প্রার্থী করা হয়নি, বা এঁরা নিজেরাও প্রতিদ্বন্দ্বিতা এগিয়ে আসেননি। বাম আমল এবং তৃণমূল কংগ্রেস আমলেও একই অবস্থা। ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে একজন অবশ্য বিজেপি দলের পক্ষ থেকে মনোনয়ন পত্র দাখিল করেছিলেন। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে শেষ পর্যন্ত তিনি মনোনয়ন পত্র তুলে নিয়েছিলেন। তাই বলা যায়, রাজনৈতিক তাপ-উত্তাপ ইরানি বস্তির নিজস্ব পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কঠোর নিগড়ে একতাবদ্ধ জীবনে সামান্য হলেও চিড় ধরাতে পেরেছিল। মুখিয়া ও সরপঞ্চের যুগের অবসানের ইঙ্গিত এটি— এমন ধারণা কিছু লোকের।

সরকারের বিরুদ্ধে এঁদের ক্ষোভ ক্রমশ ধূমায়িত হয়ে চলেছে। স্থানীয় কলকারখানায় কর্মী হিসাবে দু' একজন যাযাবর গোষ্ঠীর মানুষ নিয়োজিত হলেও পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরে তাদেরকে নাকি ছাঁটাই করা হয়েছে। এখন চলছে আলাপ-আলোচনার পর্ব। এ যাবৎ কালেও পঞ্চায়েতি স্তর থেকে জেলাস্তরে সরকারি পর্যায়ে কারোরই কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটেনি।

এঁরা চায় শিক্ষার সুযোগ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ। সরকারি কর্মবিনিয়োগ পরিকল্পনায় এঁদের সমাজ শরিক হতে চায়। ইরানি বস্তির সুন্দরী কন্যাদের বিয়ে হয়েছে বিহারে, ছত্তিশগরে, উত্তরপ্রদেশে। ওই কন্যাদের সন্তানেরা ভিন্ন পরিবেশে সুযোগ সুবিধা পেয়ে লেখাপড়া শিখে তড়তড়িয়ে এগিয়ে চলেছেন অগ্রগতির পথে। ফাটাপুকুরের ইরানি বস্তিতে বড় হওয়া ছেলে মেয়েরা যে তিমিরে ছিল ওই তিমিরেই। আলোর পথ খুঁজতে হয়ে উঠেছেন মরিয়া।

প্রত্যাশা একটাই। কোনও অন্ধকারই চিরস্থায়ী নয়। অজ্ঞানতার অন্ধকার, প্রতিবন্ধকতার অমানিশা একদিন কেটে যাবেই। কারণ, ফাটাপুকুরের ইরানি বস্তি এখন আর বৃহত্তর সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এ বস্তিতে সবারই সমান প্রবেশাধিকার। এ সমাজে আত্মমর্যাদা বেড়ে গেছে। এখন এখানে দেশিয়া, ভাটিয়া, বানজারা; হিন্দু-অহিন্দু, বাঙালি-অবাঙালি, সব একাকার। এই মহামিলনভূমি থেকেই সরকার বাধ্য হবে নতুন পথের সন্ধান দিতে। অচল জগন্নাথের রথের চাকা একদিন সরকারি উন্নয়ন প্রচেষ্টার রসিতে টান লেগে সচল হয়েছে। সরকার একদিন স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করবে এ সমাজ 'সিডিউল ট্রাইব'-এর অন্তর্গত। তপশিলি উপজাতি ভুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। দু' চারজন অন্য প্রদেশের ভাই-বেরাদরদের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক দেখিয়ে ওই শংসাপত্র সংগ্রহও করেছেন। সরকারি প্রচেষ্টায় সার্বিকভাবে মান্যতা পেলে এঁদেরও উন্নয়নরূপী রথের চাকা একদিন সচল হয়ে উঠবে।

সবশেষে

ফাটাপুকুরের এই জিপসি গোষ্ঠীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, বিবর্তন, সমাজ, ধর্ম, নেশা, পেশা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, জীবিকা নিয়ে সরকারি উদ্যোগে গবেষণা হওয়া জরুরি। এরূপ গবেষণায় শুধু সমাজবিজ্ঞানই উপকৃত হবে না, সমৃদ্ধ হবে দেশ ও জাতি। প্রশাসন পাবে নতুন পথের সন্ধান। এঁরা 'বৃহতের দলে' মিশে যেতে চায়। অপরাধ প্রবণ জাতির তকমা নিয়ে কেউ তো আর মাথা উঁচু করে চলতে পারে না। এ সমাজ একদিন বৃহতের দলে মিশে যাবে সত্য, কিন্তু আমরা হারিয়ে ফেলব আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে। তাই স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে এ কাজে এগিয়ে আসতে হবে। বর্তমান প্রতিবেদক গবেষক নন, এ নিবন্ধও গবেষণা পত্র নয়। তিনি শুধুমাত্র সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ থেকে এ ক্ষেত্রানুসন্ধান শুরু করেছিলেন। ক্ষেত্রানুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে ইতিহাসের ঝলক, প্রাচীন ও লুপ্তপ্রায় সমাজ ও সংস্কৃতির আলোকরেখা এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল কিছু বিষয়। যদি ওই তথ্যগুলো সেই সময়ে সংগ্রহ করা না হত, তাহলে এ সমাজ 'বৃহতের দলে' মিশে গিয়ে হারিয়ে ফেলত নিজস্ব সংস্কৃতি। তাই সংগৃহীত বিষয়গুলি যদি কোনও দিন কোনওভাবে কোনও সঠিক ব্যক্তির কাজে লাগে ও পূর্ণতা পায়, তবে এ অনুসন্ধানের পরিশ্রম সার্থক হতে পারে। আর যদি সরকার এঁদের কল্যাণের জন্য, মূল স্রোতে মেশানোর জন্য, সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করেন, তবে তা হবে আনন্দের বিষয়। সংগৃহীত তথ্যগুলি প্রকাশের সময়ে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে আহত করবার সামান্যতম অভিপ্রায় প্রতিবেদকের নেই। তবুও কেউ যদি নিজেকে অবমানিত মনে করেন, কেউ যদি সামান্য কারণে আহত হয়ে থাকেন, তা ঘটেছে সম্পূর্ণভাবে অনিচ্ছাকৃত দুর্ঘটনায়। এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিবেদক নিঃশর্তভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।

এক নজরে ইরানি বস্তি (২০১৮)

জেলা— জলপাইগুড়ি

বিধানসভা— রাজগঞ্জ। থানা— রাজগঞ্জ

গ্রাম পঞ্চায়েত— পানকৌড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত।

বস্তির আয়তন— ৩.৫ হেক্টর।

নির্বাচন ক্ষেত্র— ১৪/১৮/৯০

বুথে মোট ভোটার— ১৫৫১ জন। পুং ৭৯৩, স্ত্রী ৭৫৮

যাযাবর সমাজের ভোটার— ৬৪৭ জন। পুং ৩৪৫, স্ত্রী ৩০২

যাযাবর সমাজের জনসংখ্যা— ২৫২৮ জন।

* ২০০১-২০১৮ এই সময় সীমায় যাযাবর বস্তির লোক সংখ্যা কমেছে (৭৯৩-৬৪৭) ১৪৬ জন।

কভার স্টোরি

কী হারাল আর কী পেল দেড়শ বছরের জলপাইগুড়ি ?

‘সিংহাবলোকন’ বলে একটা কথা আছে, পশুরাজ সিংহ যখন চলেন তখন তিনি ডাইনে-বাঁয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। জলপাইগুড়ির দেড়শ বছরের পরিচয় পেতে হলে এই সিংহাবলোকন প্রয়োজন। সেই সঙ্গে মনে হয় গ্রিক দেবতা ভেনাসের মত যদি আমাদের পেছনে দুটো চোখ থাকত তবে সামনের দিকে চলতে চলতে, সামনে থেকে পিছনটাকেও এক নজরে দেখা যেত। এই চলা তো একমুখী সরলরেখায় এগিয়ে চলা নয়, নানা ইতিহাস অভিজ্ঞতার বাঁকে ঘুরতে ঘুরতে দেড়শ বছরে অবতরণ।

“একটি জনপদের শতবর্ষ পূর্ত্তি শেষে জনপদের প্রসারের সঙ্গে জড়িত অসংখ্য ঘটনা, অসংখ্য বিশিষ্ট ব্যক্তির কীর্তি কাহিনী ভিড় করিয়া আসিতেছে। জনপদের বহিরঙ্গে ও অন্তরঙ্গে যে ঘটনার ধারা বহিয়া চলিয়াছে, ব্যক্তির তাহাতে বিশিষ্ট ভূমিকা আছে বটে কিন্তু জনপদকে আশ্রয় করিয়াই ঘটনা-প্রবাহ উৎসারিত হইতেছে— তাই আমার এই জিলার শতবর্ষ পূর্ত্তি উপলক্ষ্যে ব্যক্তিবিশেষের কীর্তি কলাপের বর্ণনা না করিয়া প্রাচীন এথেন্স নগর রাষ্ট্রের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী জলপাইগুড়ি জনপদের এবং জলপাইগুড়ি নগরের গৌরব ও কীর্তির কথা সমষ্টিগত ভাবে স্মরণে আনিবার চেষ্টা করিব।”

এই কথাগুলি দিয়েই ‘জলপাইগুড়ি জেলা শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ’ শুরু হয়েছিল, লেখাটির শিরোনাম ছিল— ‘বন্দে জলপাইগুড়িম’। পঞ্চাশ বছর পরে দেড়শ বছরের জলপাইগুড়িকে স্মরণ করতে গিয়ে মনে হল এর চেয়ে ভাল পুনরুল্লেখ আর কিছু হতে পারে না। ‘সিংহাবলোকন’ বলে একটা কথা আছে, পশুরাজ সিংহ যখন চলেন তখন তিনি ডাইনে-বাঁয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। জলপাইগুড়ির দেড়শ বছরের পরিচয় পেতে হলে এই সিংহাবলোকন প্রয়োজন। সেই সঙ্গে মনে হয় গ্রিক দেবতা ভেনাসের মত যদি আমাদের পেছনে দুটো চোখ থাকত তবে সামনের দিকে চলতে চলতে, সামনে থেকে পিছনটাকেও এক নজরে দেখা যেত। এই চলা তো একমুখী সরলরেখায় এগিয়ে চলা নয়, নানা ইতিহাস অভিজ্ঞতার বাঁকে ঘুরতে ঘুরতে দেড়শ বছরে অবতরণ। এই অবলোকন কোনও ব্যক্তিগত হতে পারে না। সময়ের অতন্দ্র প্রহরীরাই তা পারেন সমবেতভাবে ইতিহাস নির্মাণ করতে। জলপাইগুড়িকে ফিরে ফিরে দেখতে।

বর্তমান জলপাইগুড়ি জেলার শুরু ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি থেকে। এই আধুনিক জলপাইগুড়ির ইতিহাসগত নাম বৈকুণ্ঠপুর। ফকিরগঞ্জ, খড়িয়া বৈকুণ্ঠপুর এসবের মধ্যে জলপাইগুড়ির অস্তিত্ব শুধু ভূমি রাজস্ব দপ্তরের মানচিত্রে। এখন জলপাইগুড়ি জেলা শহরের প্রাণকেন্দ্র বর্তমান কোতোয়ালি থানাটির নামছিল ‘ফকিরগঞ্জ’, এই জনপদটিও সেই নামে পরিচিত ছিল। তবে এই ফকিরগঞ্জ থানাটি ছিল বৈকুণ্ঠপুর রাজ এস্টেটের কেন্দ্রস্থলে, এর সংশ্লিষ্ট এলাকা নিয়েই পৌর শহর গড়ে উঠেছিল। রংপুর জেলা শহরের প্রাণকেন্দ্র ছিল কৃষ্ণগঞ্জ, সেই জেলারই প্রান্তিক গঞ্জের নাম ফকিরগঞ্জ। ১৮৬৯ সালে গঠন হওয়ার পর জলপাইগুড়ি জেলার প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন ঘটেছিল। তার আগে ১৮৬৫ সালে রাজসাহী কোচবিহার বিভাগ গঠিত হয়েছিল। পরে ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে জলপাইগুড়ি এই বিভাগের অন্তর্ভুক্তি ঘটলে জলপাইগুড়ি রাজশাহী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৪৭ সালের ১৭ আগস্ট

থেকে জলপাইগুড়ি প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৬৩ সালের ৪ মার্চ জলপাইগুড়ি বিভাগ গঠিত হওয়ার পর জলপাইগুড়ি জেলা এই বিভাগের একটি জেলা হিসাবে বিবেচিত হয় আর জলপাইগুড়ি শহর হয় সদর কার্যালয় ও বিভাগীয় শহর। বিভাগীয় শহরের কোনও গরিমাই আজ আর তেমন নেই। ২০১৪ সালে জলপাইগুড়ি জেলার অন্যতম মহকুমা আলিপুরদুয়ার স্বতন্ত্র জেলার মর্যাদা লাভ করেছে। সার্দ্ধশতবর্ষে এসে জলপাইগুড়ির ভৌগোলিক সীমানার এটা একটা বড় পরিবর্তন বটে। দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে জলপাইগুড়ির জীবন। শুধু নাগরিক জীবন নয় গ্রামীণ জীবনও। 'জলপাইগুড়ি' নামটি উচ্চারিত হত বিভিন্নভাবে। যোশেফ ডালটন হুকারের মুখে Jellipigore জিল্লী গোরী, ডেভিড ফিল্ড রেণীর উচ্চারণে Julpi Gorie জুলপি গোরী। এত সবের পরেও জলপাইগুড়ি আছে জলপাইগুড়িতেই শেকস্পীয়ারের সেই অসামান্য উক্তি গোলাপকে যে নামেই ডাক সুগন্ধ তার একই থাকবে। প্রবাদের সঙ্গে জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। জলপাইগুড়ির জীবন অভিজ্ঞতা থেকেও উঠে এসেছে এমন প্রবাদ— কাটা মারি গুড়ি। এই তিনে জলপাইগুড়ি। কিংবা জল জলাভূমি জঙ্গল। এই তিনই জলপাইগুড়ির অমঙ্গল। জলপাইগুড়ির লোক মানসের অভিজ্ঞতার এরকম প্রকাশ বহু প্রবাদে আছে। দেড়শ বছর আগে আধুনিক জলপাইগুড়ি যখন সৃষ্টি হল কেমন ছিল তার স্বরূপ— "স্বল্প সংখ্যক জনগোষ্ঠী, শ্বাপদসংকুল বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ ও সর্বনাশা বেগবতী নদনদী দ্বারা অযথা প্লাবিত ও ক্লিষ্ট, কুখ্যাত করাল ব্যাধি মূর্তিমান যমের ন্যায় সতত ছিল সংহার কাজে লিপ্ত। খাদ্য সম্ভার ছিল নিতান্ত স্বল্প, বৈচিত্র্যহীন ও অপুষ্টিকর। অধিবাসীদের জীবনযাত্রা ছিল আদিম ও মন্থর, অশিক্ষা ও কুসংস্কারে পরিপূর্ণ ছিল জনমানস। এমনকি প্রকৃতিও ছিল কৃপণ। ষড় ঋতুর মধ্যে প্রধান ও ব্যাপক ছিল বর্ষা। শীত-শরৎ-বসন্ত ছিল চির অনুপস্থিত।" একদার 'পান্ডববর্জিত' এই স্থানের বহুভাবে পরিবর্তন হয়েছে। প্রমাণ করেছে জলপাইগুড়ির জীবন কতটা সজীব ও সচল।

১৯৪৭ সালেও জলপাইগুড়ির অঙ্গচ্ছেদ হয়েছিল। র‍্যাডক্লিফ সাহেবের কলমের খোঁচায় বাদ গেল পাটগ্রাম, বোদা, পচাগড়, তেঁতুলিয়া, দেবীগঞ্জ। আজও জলপাইগুড়ির সীমান্তে বিচ্ছেদের স্মৃতি, কাঁটাতারের বেড়া। আধুনিক জলপাইগুড়ির যখন পত্তন হল, তখন আর কেউ এই এলাকাকে আর পান্ডববর্জিত বলে মনে করল না। নগর পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগল সরকারি কর্মচারী, আইন ও চিকিৎসা ব্যবসায়ী। যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, করলা নদী দিয়ে দিনবাজারের কালীবাড়ির ঘাটে লাগল তরী। সবাই এসেছিলেন জলপথে। ১৮৭২ এ জলপাইগুড়ি শহরে লোকছিল সাড়ে ছয় হাজার ১৯০১ এ দশ হাজার, ১৯৪১ আঠাশ হাজার, ক্রমে লোক বাড়তে লাগল। জলা জঙ্গল ধান খেতের মধ্যে মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিতে হবে। শহরের উঁচু জায়গা বলতে উকিলপাড়া, হাকিমপাড়া, রায়কত পাড়া, বাবুপাড়া, তেলী পাড়া। এইসব পাড়াতে লোকবসতি শুরু হল। 'নূতন পাড়া, মোহান্ত পাড়া, নিউটাউন, পান্ডাপাড়া, কদমতলা, হাসপাতাল পাড়া অধিকাংশই ছিল ধানখেত, জলা ও জঙ্গল। ভয়াবহ জঙ্গল ছিল শিল্প সমিতি পাড়াটি। দিনেই বাঘ দেখা যেত। ভূতের ভয়ে সন্ধ্যার পর ওদিকে কেউ যেত না।" রাতে শহরের ভেতরে বাঘ আসত। ফেউ-এর ডাক শোনা যেত। কাঠ ও খড়ের বাড়ি ছিল বেশিরভাগ। ২০১৮-তে এসব তো ইতিহাস। শহরে এখন ইট, কাঠ, কংক্রিটের জঙ্গল। পাড়াগুলো ঢুকে যাচ্ছে বহুতল ফ্ল্যাটবাড়িতে। ১৮৭৮ সনে নির্মিত জলপাইগুড়ির বড় ডাকঘরটি ছিল শহরের প্রথম দোতলা বাড়ি। আজ তো একতলা কাঠের বাড়ি, খড়ের ছাউনি এসব আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

জলপাইগুড়ি পৌরসভা গঠিত হয়েছিল ব্রিটিশ আমলেই। শতবর্ষ যাপনের ঐতিহ্য নিয়ে চলছে এই সংগঠন। পৌর পরিষেবারও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। রাস্তাঘাট নির্মাণ, সংস্কার, পথবাতি, জলনিকাশী, শৌচাগার, পার্ক স্থাপন, পাড়া-রাস্তার নামকরণ, বাজার নির্মাণ, শ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লি স্থাপন বহু পরিবর্তন লক্ষ্যনীয় হয়ে উঠেছে। জলপাইগুড়ি পৌরসভা স্বপ্ন দেখছে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের। পৌর পরিষেবার সঙ্গে পৌরসভার রাজনীতি ও শহরে বেশ আলোচনার বস্তু।

জলপাইগুড়ির অর্থনীতি এক সময় তিনটি 'টি' দিয়ে চিহ্নত হত, টি, টিম্বার আর টোবাকো। জলপাইগুড়িকে তো চায়ের শহরই বলা হত। ভারতীয় চা-করদের অনেকেই তো ছিলেন জলপাইগুড়ির অধিবাসী। জলপাইগুড়ি জেলায় চা-বাগানের শুরু গাজলডোবাতে পেশকার সাহেব মুন্সী রহিম বক্সের উদ্যোগে। পরে ইংরেজরা বহু চা-বাগানের পত্তন করেন। চা-শিল্পে বাঙালি উদ্যোপপতিদের কথা বলতে অবশ্যই মনে পড়বে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর পিতা ভগবানচন্দ্র বসুর কথা। তিনি জলপাইগুড়ির ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। বাঙালিদের সঙ্গে জলপাইগুড়ির বর্দ্ধিষ্ণু মাড়োয়ারিরাও আসেন। বিনিয়োগ করেন চা-শিল্পের ক্ষেত্রে। দেড়শ বছরের ইতিহাসে জলপাইগুড়ির বাঙালি চা-করদের গৌরব আজ আর তেমন নেই। বহু চা-বাগানের হেড অফিস জলপাইগুড়ি থেকে চলে গেছে, একাধিক চা-বাগান বন্ধ হয়ে আছে। বহু আশা জাগিয়ে চায়ের শহর জলপাইগুড়িতে চা-নিলাম কেন্দ্র স্থাপিত হলেও তার অস্তিত্বেও বহু সংকট। চা-শিল্পের সঙ্গে জলপাইগুড়ির অর্থনীতির সম্পর্ক ক্রমশই আলগা হয়ে যাচ্ছে।

একসময় কোচবিহার আর জলপাইগুড়িতেই পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে তামাক চাষ হত। জলপাইগুড়ির তামাক দিয়ে ব্রহ্মদেশে বিখ্যাত 'বার্মা চুরুট' তৈরি হত। আজ এসব অবলুপ্তির পথে। টিম্বার, কাঠের ক্ষেত্রেও অনেক বিধিনিষেধ। জলপাইগুড়ির বাস্তুসংস্থানিক অঞ্চলগুলির সীমারেখার পরিবর্তন হচ্ছে। জলপাইগুড়িতে আরেকটি 'টি' অর্থাৎ টুরিজম খুব সম্ভাবনাময় ও অর্থকরী শিল্প হয়ে উঠছে, তবে অরণ্য চলে যাচ্ছে নদীগর্ভে, নদীচরে গড়ে উঠছে গ্রাম। গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠছে চা-বাগান। টুরিস্টদের আকৃষ্ট করবার জন্য বন, বন্যপ্রাণী ও তার সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা আরও প্রসারিত করা দরকার। পশুদের বাসযোগ্য স্থান সংকোচন করে কৃষি জমি, চা-বাগান তৈরি করা আমাদের অনেক প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। মাঝে মাঝেই

শিউরে উঠতে হচ্ছে ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যুর দৃশ্য দেখে। কখনও অরণ্য ছেড়ে দলবেঁধে হাতির পাল বেরিয়ে পড়ছে লোকালয়ে। মানুষ ও পশুর সংঘাত, সার্দ্ধশতাব্দীর জলপাইগুড়িতে একটা বড় কঠিন প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাকৃতিক রূপ-লাবণ্যে অত্যন্ত আকর্ষণীয় জেলা জলপাইগুড়ি। পর্যটন কারবারিদের ক্ষেত্রেও কিছু বিধিনিষেধ, নিয়মকানুন আরোপ করা দরকার, যাতে তা প্রকৃতি ও পর্যটনে কোনও অন্তরায় সৃষ্টি করতে না পারে।

ছোটবেলায় দেখা ঘনকুয়াশায় ঢাকা শীতকাল আর জলপাইগুড়িতে হয় না। বর্ষার উল্লাসও কমে গেছে। নাব্যতা কমে গেছে তিস্তা-করলা-জলঢাকার। গত দেড় শতকের আবহাওয়া পরিবর্তন জলপাইগুড়ি জেলার পরিবেশ ও আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার উপর যে ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে তা কিন্তু ভেবে দেখা দরকার। জলপাইগুড়ির মানুষ হারিয়ে ফেলেছে, দিনের পর দিন সেই পরিচিত বর্ষা, কুয়াশামাখা শীতের সকালকে।

একটা শহরের গতি-প্রগতি অনেকটাই নির্ভর করে পথঘাট পরিবহণ ব্যবস্থার উপর। পুরনো দিনের জলপথ আর নেই। সড়ক ব্যবস্থায় সম্প্রতি ফোর লেনের দৌলতে আধুনিকতার ছোঁওয়া লেগেছে। তবে শহরের রাস্তাগুলি প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট অপরিসর। টোটো আসাতে পুরনো রিক্সা প্রায় অবলুপ্ত হতে বসেছে। পায়ে হাঁটা রাস্তাও মাঝে মাঝে উধাও হয়ে যায়, পথিপার্শ্ব ব্যবসায়ীদের জন্য। দেড়শ শতকে রেলের ব্যবস্থাও তেমন আশানুরূপ নয়। ১৮৭৮ সালে সাড়া (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত মিটার গেজ রেলপথের পত্তন হয়েছিল। এই রেলপথটি হলদিবাড়ি-জলপাইগুড়ি হয়ে শিলিগুড়ি পৌঁছাত। এটাই ছিল জলপাইগুড়ি রেলপথের প্রথম পদসঞ্চার। পরে ১৯১৫ সালে সাড়ায় হার্ডিংস রেলসেতু তৈরি হলে কলকাতার সঙ্গে জলপাইগুড়ির সরাসরি রেল যোগাযোগ শুরু হয়েছিল। এরপর বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলপথের সম্প্রসারণ বার্ণেশ ঘাট থেকে ডামডিম, লাটাগুড়ি থেকে রামশাই। ৬ মাইল রেলপথ ছিল ১৮৯৩ সালে। ১৯০০

এত সবের মাঝখানেও মনে হয় হারিয়ে গেছে অনেক কিছু। বিশেষ করে ৬৮'র বন্যায় হারিয়ে যাওয়া মানুষজন, এই নগরে স্মৃতি বিজড়িত বহু অভিজ্ঞতাগুলি। এই সবকিছুর স্মরণে দেড়শ বছরের জলপাইগুড়িতে একটা স্মৃতি সৌধ স্থাপন করা যায় না?

সালে বি.ডি.আর— বার্ণেশ জংশন থেকে ময়নাগুড়ি রোড, ভোটপট্টি, চ্যাংরাবান্ধা স্টেশন থেকে বাংলাদেশের রংপুর জেলার লালমণির হাট জংশন। এসব আজ গল্পকথা। ৪৭'এর দেশভাগ, ৬৮'র বন্যায় অনেক চিহ্নই মুছে গেছে। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের গুরুত্ব বাড়লেও জলপাইগুড়িবাসীর গুরুত্ব বাড়েনি। জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন বর্তমানে অনেকটাই ভরসাস্থল। তবুও কী আশ্চর্য পদাতিক এক্সপ্রেসের স্টপেজের জন্য কী করুণ আন্দোলন করতে হয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে জলপাইগুড়ির যে সুনাম ছিল তা ক্রমঃহ্রাসমান। এই জেলা থেকে বহু কৃতী ছাত্র-ছাত্রীরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে যশস্বী হয়েছেন আবার দুঃখজনক বিদ্যালয় শিক্ষায় যারা পশ্চিমবঙ্গের নিরিখে পাশের হার একেবারে নীচের দিকে। শহরের বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয়গুলো পুরনো গৌরব হারিয়ে ফেলছে। বেসরকারি স্কুল-কলেজের সংখ্যা বাড়ছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জলপাইগুড়ি ক্যাম্পাস হয়েছে। জেলাতে একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় হোক ক্রমশ দাবিও উঠছে। চোখের সামনে বড় দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে জলপাইগুড়ির ভাষা-আচর আচরণও। ভাবতে কষ্ট হয় জলপাইগুড়ির সুপ্রাচীন ফার্মেসি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে অথচ ওখানেই ১৯৩০ সালে জ্যাকশন মেডিকেল স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। সম্প্রতি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের প্রচেষ্টা চলছে। পুরনো রাণী অশ্রুমতী যক্ষা হাসপাতালের কম্পাউন্ডে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল।

সাহিত্যে-শিল্পে জলপাইগুড়ির সুনাম আছে। পুরনো প্রেক্ষাগৃহ রূপশ্রী এখন বিজনেস কমপ্লেক্স। আলোছায়া যার পরবর্তী নাম রূপমায়া এখনও আছে। দীপ্তি টকিজ, তথা বান্ধব নাট্যসমাজের ভগ্নদশা। সরোজেন্দ্র দেব কলাকেন্দ্র শহরের মুকুটে নতুন পালক হলেও সেখানেও বিস্তর সমস্যা। ১৯০৫ সালে শশীকুমার নিয়োগী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আর্য্যনাট্য সমাজগৃহ— বর্তমানের রবীন্দ্রভবন, যা আজও প্রত্যাশা মত রূপ পাচ্ছে না। শহরের প্রথম প্রকাশিত পত্রিকা (১৯০০) ত্রিস্রোতা অনেকদিন বন্ধ হয়েছে। ক্ষুদ্র সংবাদ-সাময়িক পত্রের যে ঐতিহ্য ছিল, বড় বড় দৈনিক পত্রিকার 'জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি' ক্রোড়পত্রের চাপে চাপা পড়ে গেছে। মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, রবিশঙ্কর, বড়ে গোলাম আলি, বাংলা সংগীত-অভিনয়-সাহিত্য জগতের বহু দিকপালেরা এসেছেন এই শহরে। বহু জনজাতির বাস এখানে। কত স্মৃতি-সম্পদ হারিয়ে যাচ্ছে অথচ একটা মিউজিয়াম-এর স্বপ্ন অধরাই থেকে গেল। শহর কয়েক দশক ধরে হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের জন্য প্রহর গুণছে। কদমতলায় কবে এক ক্লক টাওয়ার মাথা তুলে দাঁড়াবে? ঝলমলে শপিং মলের সংখ্যা বাড়ছে, পুরনো দিনবাজারের নবনির্মাণ হচ্ছে। দেড়শ বছরের জলপাইগুড়ি ও কল্লোলিনী তিলোত্তমা হতে চায়। ১৯৬৮-এর বন্যা এই শহরে যে স্থবিরতা এনে দিয়েছিল, তার অনেকটাই কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। শহরটার বুকের ভেতর অনেককিছু হারিয়ে ফেলবার দুঃখ কষ্ট আছে, না পাওয়ার হতাশা আছে। তবু সে পাল্টাচ্ছে দেড়শ বছরের অনেক চিহ্ন নিয়ে, এসবই তো প্রমাণ করে জলপাইগুড়ির জীবন কতটা সজীব-সচল। ভালবাসার আবেগে মথিত হয়ে এই জেলার মানুষই তো বলতে পারে— 'আমি তারে ভালোবাসি অস্থিমজ্জাসহ'। বৈকুণ্ঠপুরের রাজ-রাজারা থেকে স্বপ্না বর্মণ, সবই জলপাইগুড়ির ইতিহাসের অন্তর্গত।

জলপাইগুড়ির দেড়শ বছরের কথা লিখতে গিয়ে বার বার স্মৃতি তাড়িত হচ্ছি। আমার জন্ম-জীবনযাপন সবই জলপাইগুড়িতে। শহরটা চোখের সামনে কত বদলে গেল। কত চেনা মানুষ হারিয়ে গেলেন, কত পরিচিত বাড়িঘর ভেঙে নতুন বহুতল তৈরি হচ্ছে। গাছপালা, পাখি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যে স্মৃতি এখনও তাড়া করে বেড়ায় তা হল ১৯৬৮'র ৪ঠা অক্টোবরের ভয়াবহ বন্যার কথা। জলপাইগুড়ি শহর সেদিনের পর থেকে এক মহাশ্মশানে পরিণত হয়েছিল। তিস্তার স্রোতে ভেসে নগর জীবন, শত শত মানুষ, গবাদি পশু মারা গেল। একতলা সমান উঁচু জল, পলিমাটি ভেসে আসা কাঠ শহরটাকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছিল। হাসপাতালের নীচতলার অসহায় রোগীরা, জেলখানার কয়েদীরা অতলে তলিয়ে গেল। শহরে তখন কাঁচা বাড়ির সংখ্যাও কম ছিল না, অনেক ঘর চাপা পড়ে, কেউ বা জলের তীব্র স্রোতে হারিয়ে গেলেন। খাদ্য নেই, পানীয় নেই, মৃত মানুষ, মৃত গবাদি পশুর উৎকট গন্ধ। ধীরে ধীরে ত্রাণ এল, পলিমাটি সরল, বাড়িঘর মেরামত হল, হাটবাজার বসল, অফিস-আদালত খুলল, কিন্তু শহরটা কেমন ম্লান স্থবির হয়ে গেল। আবার নতুন করে সবকিছু গড়ে তুলবার উদ্যোগ, উদ্যম হারিয়ে গেল বন্যার আতঙ্কে। জলপাইগুড়ি শহর বিভাগীয় শহরের গরিমা হারিয়ে ফেলল। সরকারি, বেসরকারি বহু অফিস স্থানান্তরিত হল। আশির দশকে এসে সেই আতঙ্ক কাটল বলা চলে। মাঝে সত্তরেও বহু দুর্যোগ গেছে শহরের উপর দিয়ে। সন্ধ্যার পরেই পথঘাট শুনশান, মূর্তি ভাঙা, স্কুল-কলেজ পোড়ানো। বহু বাড়ির যুবক ছেলেরা জেলবন্দি রাতে পুলিশের গাড়ি, সিআরপি বুটের আওয়াজ। দেওয়ালে দেওয়ালে বিপ্লবের ডাক। শহরটার স্বাভাবিক হতে অনেক সময় লেগেছিল। ১৯৬৮'র বন্যা, শহরটাকে প্রায় পঙ্গু করে দিয়েছিল। নগর মানসিকতায় এসেছিল অপরিসীম জাড্যতা। ধীরে ধীরে শহরটা তা কাটিয়ে উঠল, আধুনিক বিনোদনের ব্যবস্থা হয়েছে, হোটেল, বাজার হয়েছে। কিন্তু এত সবের মাঝখানেও মনে হয় হারিয়ে গেছে অনেক কিছু। বিশেষ করে ৬৮'র বন্যায় হারিয়ে যাওয়া মানুষজন, এই নগরে স্মৃতি বিজড়িত বহু অভিজ্ঞতাগুলি। এই সবকিছুর স্মরণে দেড়শ বছরের জলপাইগুড়িতে একটা স্মৃতি সৌধ স্থাপন করা যায় না?

বিস্মৃতির ধূসর আস্তরণের নীচে ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া ইতিহাস। দেড়শ বছরের দূরত্বে হয়ত তা বিবর্ণ, ক্ষয়াটে, তবুও জলপাইগুড়ির ছবি আজও অম্লান। ধুলো সরালেই ধরা পড়ে তার নিজস্ব রূপ, যা পুরনো জলপাইগুড়িকে যুক্ত করে দেয় আধুনিক জলপাইগুড়ির সাথে।

রণজিৎ কুমার মিত্র

সূত্র— জলপাইগুড়ি জেলা শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, সম্পাদক চারুচন্দ্র সান্যাল ও অন্যান্য। জলপাইগুড়ি জেলা শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ কমিটি, ১৯৭০। জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, মধুপর্ণী, সম্পাদক অজিতেশ ভট্টাচার্য ও অন্যান্য। বালুরঘাট, ১৩৯৪। জলপাইগুড়ি জেলা বিশেষ সংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা, কলকাতা, ২০০১।
জলপাইগুড়ি জেলা সংকলন (২য় খণ্ড) কিরাতভূমি, সম্পাদক অরবিন্দ কর, জলপাইগুড়ি, ১৯৯৫।

ওপার বাংলার চিঠি ডুয়ার্সকে

কী অসাধারণ দৃশ্য! না দেখলে ঠাহর করা মুশকিল। কোথাও হাতির পাল, কোথাও বাইসন কিংবা গন্ডারদের অবাধ চলাফেরা দেখতে দেখতে কখন যে চলে এলাম ময়ূরের দেশে— বুঝতেই পারিনি। এখানকার ঘন অরণ্যে বন্য পশুপাখি দেখার জন্য কখনও ওয়াচ টাওয়ারে, আবার কখনও খোলা জিপে দাঁড়িয়ে কল্পনার জগতে অবগাহন করেছি। এই অরণ্যে এসে আলো-আঁধারের খেলায় পাখিদের কলরবে কেটেছে সময়। কত রকমের ফুল-ফল আর সবুজের সমাহার, বলে শেষ করা যাবে না। বহু বৈচিত্র্যে বর্ণময় ডুয়ার্স যে ছবির মতই সুন্দর।

গত নভেম্বরে উমেশ শর্মা-বাবুর জলপাইগুড়ির ইতিহাস গ্রন্থের আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ থেকে এসে জলপাইগুড়িতে হোটেল রত্নদীপ-এ সমরেশ মজুমদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতায় উঠে এসেছিল ডুয়ার্স প্রসঙ্গ। সমরেশ মজুমদারের সঙ্গে লম্বা সময় ধরে রাতভর আড্ডা দেয়ার সুযোগে তাঁর লেখা 'কালবেলা' ও ডুয়ার্স সম্পর্কে নানা মজার প্রসঙ্গ উঠে আসে। এরপর সময় নষ্ট না করে হঠাৎ করেই ডুয়ার্স ভ্রমণের সিদ্ধান্ত।

বাংলাদেশ থেকে বুড়িমারি-চ্যাংরাবান্ধা বর্ডার দিয়ে জলপাইগুড়ি পৌঁছাই। জলপাইগুড়ির উমেশ শর্মা বাবু ছিলেন আমার ভ্রমণসঙ্গী। আমরা জলপাইগুড়ি থেকে সকাল বেলায় যাত্রা শুরু করলাম। অবনীবাবু আমাদের সঙ্গে যুক্ত হলেন জলদাপাড়া থেকে। ডুয়ার্সের পথে যে সকল চা-বাগান আর অরণ্য দেখতে পাওয়া যায়, তা যেন ছবির মতই। পার্থক্য শুধু একটাই— কাগুজে ছবিগুলো স্থির, আর অরণ্যের দৃশ্যাবলী প্রকৃতির বায়ুতে আপন মনে খেলা করে! দুর্দান্ত ভাললাগা কাজ করছিল; মরে যাওয়া মনটা মুহূর্তেই উজ্জীবিত হল। অরণ্যের মধ্য দিয়ে রাস্তায় কখনও হাতি, বানর কিংবা পশু পাখিদের অবাধ বিচরণ দেখে হৃদয়ের সবকটা জানালা খুলে যাচ্ছিল।

ডুয়ার্স ভ্রমণ অনবদ্য ছন্দে আমাকে উজ্জীবিত করে। বার বার মনে হচ্ছিল স্বর্গের সিঁড়ি বেয়ে যেন আরও নতুন কিছুর সন্ধান পাচ্ছি। শান্তির পরশে থাকা অবস্থায় ভ্রমণসঙ্গী অবনীবাবু আর উমেশবাবুর বিভিন্ন মনমাতানো গল্প ভ্রমণে এনেছিল নতুন মাত্রা। অনাবিল আনন্দ আর সুখে পুলকিত হচ্ছিলাম। এক অজানাকে জানার আগ্রহ আর অদেখাকে দেখার তীব্র আকাঙ্খা পূরণে যেন চূড়ান্ত তৃপ্তিতে ছিলাম। ডুয়ার্স ভ্রমণে অরণ্য, চা-বাগান আর বন্য পশুপাখি ও আদিবাসীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার ঘটনা আমাকে পৃথিবীর অপার সৌন্দর্যকে অনুভব করতে সাহায্য করেছে। অরণ্যের মধ্য দিয়ে ঝি ঝি পোকার ডাক আর নানা রকমের পশুপাখিদের গানে গানে কেটেছে সময়।

সৌন্দর্যের লীলাভূমি জয়ন্তি

গাড়ি এগিয়ে চলছে, গাড়ি থেকেই দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন গাছপালা আর বন্য পশু পাখি। একটু পর পর রাস্তার দুধারে গাড়ি থেকেই দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন প্রজাতির অসংখ্য অর্কিড আর নানা রঙ্গের ফুল। একসাথে এতো অর্কিড আর নানা রঙ্গের প্রজাপতি এর আগে কখনওই চোখে পড়ে নি। সব কিছু মিলে অরণ্যের প্রাকৃতিক পরিবেশ অনবদ্য। ঘন অরণ্যে নীরবতা ভেঙ্গে দিয়ে ঝিঁঝি পোকারা ধারাবাহিকভাবে ডেকেই চলছে। ওদের ডাক আর অরণ্যের স্বপ্নিল আবেশে একাকার হয়ে যাচ্ছিলাম। অরণ্য পাড়ি দিয়ে রাস্তার শেষ প্রান্তে এসে গাড়ি থামল একটি নদীর পাশে, যার নাম জয়ন্তি। গাড়ী থেকে নামতেই দৃষ্টির সীমানার পুরোটাই জুড়ে নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখে অভিভূত না হয়ে পড়লাম না। সত্যি পৃথিবীতে কতো সুন্দর স্থান রয়েছে। এখানকার দৃশ্যগুলো ছবির মতই সুন্দর। এই জয়ন্তির তীরে অবস্থিত পাহাড়ি পরিবেশে একটি ছোট্টজনপদ জয়ন্তি।

কি দুর্দান্ত! জয়ন্তির প্রাকৃতির সৌন্দর্যে আবেগতাড়িত না হয়ে পারা যায় না। অরণ্যে ভরপুর জয়ন্তি পেরিয়ে ভুটান পাহাড়ের পাশেই ছোট্ট নদীটিতে অবগাহন করার পর মনে হচ্ছিল আবেগের পরশে বাধা পড়ছি। শরীরটা ভিজে যাওয়ার সাথে সাথে মনটাও ভিজে যাচ্ছিল। রোজকার আয়-ব্যয়ের হিসাব আর সাংসারিক চিন্তার বেড়াজালে আবদ্ধ থাকতে থাকতে প্রকৃতির রূপ গন্ধের কথা ভুলে যাওয়ার জো হয়েছিল। হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়ার মত দৃশ্য। জয়ন্তি নদীর কুলকুল শব্দে বয়ে যাওয়া জলের ধারে বসে সামনে নীল পাহাড়ের সারি ও পাহাড়ের কোলে মেঘের লুকোচরি খেলা দেখতে দেখতে সময় পার হয়ে যায়। এখানে এসে নিজেকে সামলে রাখতে পারলাম না। জয়ন্তির বুকে নিজেকে সমর্পণ করে ফেললাম। এ যেন প্রথম দেখায় প্রেমে পড়ার মতো একটি ঘটনা। এ প্রেম, এই ভালবাসা বুকের ভেতর থেকেই উৎসারিত। বুঝতে পারলাম একটা মমত্ববোধ আর ভালোবাসায় জয়ন্তি আমাকে সিক্ত করে দিয়েছে। জয়ন্তির অমৃত ধারা আমি মুখে পুরে নিয়ে সুখ অনুভব করলাম।

জয়ন্তি নদী আর পাড়ের ছোট্টজনপদ একাকার হয়ে আছে। এখানকার শিশুরা নদীর তীরেই খেলা করে, নদীতে স্নান করে। একদল শিশু পাথর দিয়ে খেলছিল এক ধরনের লোকখেলা। উদোম শরীরে ভরদুপুরে কেউ বা মাছ শিকারে ব্যস্ত। মাঝে মধ্যে দু-চার জন আদিবাসি নারী দেখা যাচ্ছে যারা জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে ব্যস্ত। একজন আদিবাসি পুরুষকে দেখলাম মধু সংগ্রহ করে অরণ্য থেকে লোকালয়ে আসছে নদী পার হয়ে। এখানে এ সবই ওদের নিত্যদিনের কাজ।

দিন শেষে ঘরে ফেরার সময় মনে হচ্ছিলো জয়ন্তির পশু পাখি ও বৃক্ষের সাথে এখানকার অধিবাসীরা একাকার হয়ে সন্ধ্যের আগেই নিশ্চুপ হয়ে যায়। ঝিঁঝি পোকা আর ব্যঙ্গের ডাক ছাড়া আর তেমন কিছু শুনতে পাওয়া যায় না। প্রকৃতির শাসনই এখানে চলমান রয়েছে। কিংবা প্রকৃতির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেই এখানকার মানুষরা খাপ খাইয়ে নিয়েছে নিজেদেরকে। জয়ন্তিতে এসে আমি যেন থমকে গিয়েছি। এখানে আদি ও অকৃত্রিম গন্ধ রয়েছে, শিশুদের খেলাধুলা ও শৈশবের রংমোড়া দিনগুলোতে মানুষের জীবন যাপন ও ধর্মে কর্মে। সত্যি বলছি এ প্রেম প্রকৃতির , যেখানে নেই কোন স্বার্থপরতা আর ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়ার জটিল সমীকরণ। বরং সরল অংকের মতোই মিলে যাচ্ছিল সব হিসাব নিকেশ। এভাবেই রোদ বৃষ্টির লুকুচুরির খেলার মধ্য দিয়ে সময় গড়িয়ে চলতে শুরু করে। কিন্তু শিশুদের দৌড়ঝাপ আর বিরামহীন খেলাধুলার শেষ নেই।

ঘড়ির কাটা মনে করিয়ে দিলো সময় যে হয়ে এল ঘরে ফেরার। পৃথিবীর নিয়মের বেড়াজাল ছিন্ন করে আমি জয়ন্তির বুকে থাকতে পারলাম না। ফলে বিদায় নিতে হল জয়ন্তির কাছ থেকে। বিদায় নিতে হল সেই সকল বাধন হারা শিশুদের কাছ থেকে যারা শুধু খেলতে খেলতেই দিন পার করে দেয়। রাত্রি নেমে এলে ক্লান্ত শরীরে মায়ের বুকে ঘুমিয়ে পড়ে নতুন আরেকটি ভোরের আশায়। হয়তো আবার দেখা হবে অন্য কোনও দিন, অন্য কোনও সাজে। হয়ত আমি নয় অন্য কেউ নিজেকে খুঁজে পাওয়ার আশায় চলে আসবে জয়ন্তিতে।

পদব্রজে বক্সার পথে পথে

'অমৃতের পুত্র মোরা কাহারা শোনাল বিশ্বময়,
আত্মবিসর্জন করি আত্মারে কে জানিল অক্ষয়'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কথাগুলো বলেছিলেন বক্সায় আটক হয়ে থাকা বন্দী বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যে। এটি ছিল কবির জবাব বন্দীদের উদ্দেশে। সে সময় বন্দী বিপ্লবীরা বক্সার অভ্যন্তরেই রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করেছিলেন। তখন কবিগুরু দার্জিলিং-এ অবস্থান করছিলেন। ইতিহাস ও সাহিত্যের প্রসঙ্গে ভাবতে ভাবতেই বক্সা দুর্গের দিকে পা বাড়াই। পদব্রজে বক্সার ঢালু পাথুরে পথে চলতে থাকি ধীর গতিতে।

দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার। সময় তখন মধ্য দুপুর। ক্যালেন্ডারের পাতায় ঝুলে রয়েছে জুন মাস। অথচ দিনের আলো গাছের ফাঁক দিয়ে কখনও মাটি স্পর্শ করছে, আবার কখনও করছে না। এমন আলো আঁধারির মধ্য দিয়েই আমি দুর্গের দিকে ধাবিত হচ্ছি। কোথাও কোথাও আলো একেবারেই কমে এসেছে। স্বাভাবিক ভাবে অরণ্যের প্রকৃত দৃশ্য ফুটে উঠছে। আকা-বাঁকা রাস্তার দুধারে উচু গাছগুলো থেকে যতটা পাখিদের কলরব শোনা যায় তার চেয়ে অনেক বেশি শব্দ পৌঁছে দিচ্ছে ঝিঁঝি পোকারা। এই ঝিঁঝি পোকার ডাকে অরণ্যের পরিবেশ আরো নিবিড় ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। সময়টা বর্ষাকাল হলেও বিগত ৪-৫ দিন থেকে এখানে বৃষ্টি না হওয়ায় আমি স্বাভাবিকভাবেই পদব্রজে বক্সার পথে পথে ঘুরে বেড়াতে পারছি। খোলা আকাশের নিচে ঘন অরণ্য, আর তার নিচে আমি বক্সার আকা বাঁকা উঁচু

নিচু অরণ্যময় পথ ধরে বক্সা দুর্গের দিকে চলছি। আকাশের বুকে কয়েক খণ্ড সফেদ সাদা মেঘ। প্রকৃতিতে বৃষ্টি নামবে নামবে ভাবে ভ্রমণ পিপাসুদের এই স্থানটির প্রতি দুর্বলতা রয়েছে।

বক্সা দুর্গ ভ্রমণ কোন সাধারণ ভ্রমণ নয় বরং এই ভ্রমণের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ। বক্সার ভাঙ্গা প্রাচীরের ফাক ফোকর আর নানা ঘটনা ও দুর্ঘনার চাপা ইতিহাস রয়েছে এই দুর্গের নানা প্রান্তে। এ ভ্রমণ যেমন আমাকে আনন্দ দিয়েছে তেমনি ইতিহাস, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকেও স্বরণ করিয়ে দিয়েছে। শুধু অনুভুতি আর কল্পনার রাজ্যে অবগাহন করে শত শত বছরের পুরোন এই দুর্গকে না ভেবে বাস্তব দৃশ্যপট দেখে উপলব্ধিতে নিয়ে এ ভ্রমণ সত্যি আমার জন্য আনন্দদায়ক ছিল।

পুনশ্চ রাজাভাতখাওয়া

‘ভ্রমণ প্রথমে তোমাকে নির্বাক করে দিবে, তারপর তোমাকে গল্প বলতে বাধ্য করবে’ -ইবনে বতুতা।

রাজাভাতখাওয়া অরণ্য ও তৎসংলগ্ন ছোট্ট জনপদ ভ্রমণে এসে আমি আমার শিশু বয়সের বিস্মিত হওয়ার মত অনুভূতিটুকু ফিরে পেয়েছি। ফলে পুলকিত হয়েছি, অবাক বিস্ময়ে ভ্রমণ করেছি আর অরণ্যের অপার সৌন্দর্যে নিজেকে মেলে ধরেছি। ডুয়ার্স প্রসঙ্গে অনেকেই রাজাভাতখাওয়াকে ততটা গুরুত্ব না দিলেও আমার কাছে এই অরণ্য ও ছোট্ট জনপদটির চালচিত্র অনন্য সাধারণ মনে হয়েছে। আলিপুরদুয়ারে বক্সা টাইগারের ভিতর অবস্থিত এটি একটি ছোট্ট জনপদ।

সেবারও আমি বুড়িমারি-চ্যারাবান্ধা বর্ডার হয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করে জলপাইগুড়ি পৌছে যাই। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে আলিপুরদুয়ারের ট্রেন ধরে চলে আসি আলিপুরদুয়ারে। আলিপুরদুয়ার আমার কাছে নতুন শহর। হোটেলে উঠে রাতের খাবার খেয়ে আর দেরি না করে ঘুমিয়ে পড়ি। জীবনে প্রথম এই শহরে রাত্রিযাপন করলাম। পাখির কিচির মিচির শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলতেই দেখি জানালার উপর দুটো পাখির মিস্টি আলাপচারিতা। আমার হোটেল কক্ষের নির্জনতা ভেঙ্গে দিয়ে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছিল ওরা। জানালা দিয়ে সকালের ডুয়ার্সের মিস্টি হাওয়া আমাকে আলিপুরদুয়ারের পক্ষ থেকে সুপ্রভাত জানালো। রাতভর ঘুমানোর পর ভোরবেলা যখন ঘুম থেকে উঠলাম তখন আমি সজিবতায় ভরপুর। ফলে আর দেরি নয় সকালের স্বাভাবিক কাজকর্মগুলো সেরে নিয়ে ভ্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য উঠব এমন সময় অমল বাবুর ফোন। রিসিভ করার সঙ্গে অন্যপ্রান্ত থেকে শুনতে পেলাম- ‘দাদা দেরি করবেন না যেন। ফিরে আসতে সময় লাগবে।’ হ্যাঁ, অমল বাবুকে আমি গাইড হিসাবে আগের রাতেই বুকিং দিয়ে রেখেছিলাম।

ফ্রেস হয়ে যখন ড্রেস পড়লাম ঘড়িতে তখন সকাল ৮ টা। সকালের নাস্তা শেষ করে আমি ভ্রমণ শুরু করতে প্রস্তুত। হোটেল থেকে নিচে নামতেই চোখে পড়লো অমল বাবুকে। সত্যি কাজের মানুষ তিনি। আমাকে একটি হ্যালমেট পড়ালেন। এবারে যাত্রা শুরু হল। আমরা রাজপথ দিয়ে যাত্রা শুরু করলেও অল্প কিছুক্ষণ পড়েই মেঠো পথ দিয়ে বাইক ছুটে চলল। চারিদিকে সীমাহীন সবুজের সমাহার। সবুজের মাঝখান দিয়ে ছুটে চলা বাইকটি যেন আমাকে দ্রুতই পৌছে দিবে আমার গন্তব্যে। কিন্তু গন্তব্যে যাওয়ার পথে রাস্তার দুধারে আমার চোখে যে অরণ্য ও পশুপাখির সমাহার সেটাও আমার কাছে উপভোগ্য ছিল। এই ভ্রমণে আমার সাথে ছিলেন অমল লহরি ও তার বাইক। লোকালয় ছেড়ে চলে এলাম ঘন অরণ্যে। অমল লহরি বাবু ভাল বাইক চালাতে পারেন। বাইকে চড়ে ডুয়ার্সের কোনও অরণ্য ভ্রমণ এই প্রথম।

অরণ্যে হাতির দলের হামলা মাঝে মধ্যেই হয়, অমল বাবুর মুখে এ রকম কথা শুনতে না শুনতেই একটু দুরে একদল হাতির দেখা পাওয়া গেল। অমলবাবু বাইক থামিয়ে দিলেন। হাতির দল রাস্তা পার না হওয়া পর্যন্ত থেমে থাকাই নিরাপদ। দলের মধ্যে একটি হাতি এতটাই বিশালাকার যে আমি একটু বিব্রত আর অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়ে যাই। অমলবাবু বুঝতে পেরে আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন যে, আমার নিরাপদ দুরত্বেই রয়েছি। ফলে আমি এরচেয়ে সুন্দর সুযোগের অপেক্ষা না করেই তরিঘড়ি করে ক্যামেরা ওপেন করে বেশ কয়েকটি স্থির চিত্র নিয়ে নিলাম। ঘন অরণ্যের মধ্যে গাছের নিচে সূর্যের আলো খুব সামান্যই প্রবেশ করতে পারে। চারিদিকে শুধু নিস্তব্ধতা। নৈঃশব্দের কাছে এসে প্রাকৃতিক নৈসর্গে একাকার হয়ে যাচ্ছিলাম।

এখানকার সাধারণ মানুষরা হাতিকে ভগবান হিসাবে ভক্তি করেন। সে কারণে তারা হাতিকে আঘাত না করে পটকা ফুটিয়ে, থালা বাজিয়ে তাড়িয়ে দেয়। পথ চলতে চলতে রাস্তার দুধারে মাঝে মধ্যেই দু-চারটা ময়ূর দেখতে পেয়ে আনন্দে মনটা ভরে গেলো। অরণ্যের মধ্যে নির্জন পরিবেশে এ রকম হাতি ও ময়ুর দেখার অভিজ্ঞতা এটাই প্রথম। এ সবকিছু দেখতে দেখতে আমি ট্রাভেল ডেস্টিনেশন পৌছে গেলাম।

রাজাভাতখাওয়া জনপদের মানুষগুলো একেবারেই সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত। সাধারণত এই পাহাড়, অরণ্যের মানুষগুলো যেমন কাঠের গুড়ির ওপর বাড়ি তৈরি করে। ঘরের উপরের অংশে রয়েছে টিন এবং মাটি থেকে ঘরে প্রবেশের জন্য রয়েছে কাঠের সিঁড়ি। বাড়ির সম্মুখে একটু বেলকনির মতো স্পেস রয়েছে। প্রায় প্রতিটি বাড়ি একই আদলের।

এই জনপদে পাকা ঘর-বাড়ি তেমন একটা চোখে পড়ে নি। বিস্তর খোলা প্রান্তর, পশু-পাখি আর অরণ্য। একটি বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি কিছুটা দুরত্বে অবস্থিত। গ্রামের মাঝখানে একটি গির্জা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখানকার মানুষগুলোর জীবন জীবিকা আদি ও অকৃত্রিম। অরণ্যের মাঝে সভ্য সমাজ থেকে বহুদূরে নিজেদেরকে সন্তর্পনে সরিয়ে রেখেছে ওরা। প্রতিনিয়ত ওদের মুখে সজীবতায় ভরপুর অনাবিল হাসি লেগে আছে। যেই হাসি নদীর পনির মতো, পাখির গানের মত কিংবা বনের মর্মর শব্দের মতই প্রাকৃতিক।

এখানে এসে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি ডুয়ার্স। সুন্দরের সন্ধানে, নতুন স্থানের খোঁজে ভ্রমণপিয়াসীদের মনকে তৃপ্ত করার ক্ষমতা রয়েছে ডুয়ার্সের। অন্য যে কোনও স্থানের চেয়ে ডুয়ার্সের রূপ ও সৌন্দর্যে ভিন্নতা রয়েছে। এখানে প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে একাকার করা সম্ভব। নিজেকে চিনে নেওয়ার ও আবিষ্কারের একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে ইট-পাথরের পৃথিবীতে প্রকৃতির রূপে গন্ধে নিজেকে মাখিয়ে নিয়ে সৃষ্টির অপার রহস্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়েছিল কয়েকদিনের জন্য। ডুয়ার্সে রয়েছে ছোট-বড় প্রচুর পাহাড়। এখানে মন খারাপ হলে আশ্চর্যরকমভাবে কুয়াশা ঝরে। কান পাতলেই শোনা যায় পাহাড়ের পদাবলী। ডুয়ার্সের সর্পিল পথ মিশে গেছে অন্য আরেকটি পথে। এভাবেই সকাল থেকে সন্ধ্যা নেমে আসে। মনে হয় আবারও ডুব দিই ডুয়ার্সের নিঝুম অরণ্যে। ডুয়ার্স ভ্রমণ অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি নিবন্ধ যথেষ্ট নয়।

জাহাঙ্গীর আলম সরকার
ঢাকা, বাংলাদেশ

দুয়োরানি দোমোহানি

আগেকার দিনে জলপাইগুড়ি শহর থেকে মালবাজার যেতে হলে তিস্তা পার হয়ে উঠতে হত দোমোহানি ঘাটে। সেখান থেকে ট্রেন ধরে মালবাজার। তখন দোমোহানি সুয়োরানি। এখন সে এক নির্জন, চুপচাপ। আশ্বিন মাসের দুপুরে ভাদ্রতুল্য গরম ছাদে নিয়ে আমাদের গাড়ি যখন দোমোহানি মোড় থেকে উত্তরে বাঁক নিল, তখন দেখলাম সামনের রাস্তাটা বিলকুল ফাঁকা। অবশ্যি বিলকুল বলতে লোকজন কিংবা সাইকেল-ভ্যানরিক্সা মায় বাইক পর্যন্ত নজরে এল না। কেবল হুসহাস করে বেরিয়ে যাচ্ছিল রকমারি গাড়ি। জাতীয় সড়কে জ্যামজট এড়াতে অনেক গাড়ি ভায়া দোমোহানি চলে যায় লাটাগুড়ি বা ময়নাগুড়ির দিকে। তাই এ পথে গাড়ির বিরাম নেই। লোকালয়ে ঢোকার মুখে লেবেল ক্রশিং পার হওয়ার দিন এখন অতীত। আন্ডার পাস দিয়ে ওধারের উঁচু রাস্তায় ওঠার পর চোখে পড়ল রাস্তার পাশে কয়েকজন বসে তাস পেটাচ্ছে। বাঁ দিকে সুপ্রশস্ত তিস্তা।

এই উঁচু রাস্তা আসলে বাঁধ। রাস্তা আবার ঢালু হয়ে ঢুকে সোজা ঢুকে পড়েছে দোমোহানির বাজারে।

বস্তুত জাতীয় সড়ক থেকে মাত্র দু-কিলোমিটারের মধ্যে দোমোহানির মত এত থমথমে জায়গা আমি খুব একটা দেখি নি। সাহিত্যিক শীর্ষেন্দুবাবুর মনে দোমোহানিতে ভূতের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ যে নেই, সেটা জানার পর থেকে খুব ইচ্ছা ছিল সেখানকার স্টেশানে এক রাত্তির কাটাব। সে স্টেশন তখন ঘোরতর পরিত্যক্ত। দেয়ালময় ঘুঁটে। রাত কাটাতে সে বার গেলাম বিকেলে। শীতের সন্ধে টুপ করে রাত্তির হয়ে যেতেই মনে হল শীর্ষেন্দুবাবু একদম ঠিক। গোটা দোমোহানি জুড়ে যেন এক ভুতুড়ে আবহাওয়া নেমে এলো। বহু দূরে দূরে বাড়ি। ফাঁকা-খাঁখাঁ জমির পরিমাণ ঢের ঢের বেশি। প্রাচীন বৃক্ষের দল সেই আঁধারে আকার বিশিষ্ট কালোতে পরিণত হয়ে যেন পরলোকগতদের ডাকছিল 'আয় আয়' বলে।

পরিত্যক্ত জনপদ বলতে কী বোঝায় সেদিন হাড়ে হাড়ে অনুভব করছিলাম। কিন্তু দোমোহানি মোটেই পরিত্যক্ত গ্রাম নয়। লোকজন দিব্যি থাকেন সেখানে। জাতীয় সড়ক এড়িয়ে যাওয়ার জন্য দোমোহানি দিয়ে শর্টকাট মারলে জনপদটিকে বোঝা যাবে না। রেলের আন্ডার পাসে পেরিয়ে ডান দিকে তাকালে নিচুতে ঘরবাড়িগুলো নজরে আসবে। সেটাও দোমোহানির আসল পরিচয় নয়। তবে হ্যাঁ! দোমোহানি সত্যিই জনবিরল।

হাটবার বাদ দিলে গ্রামের বাজারে এই ভর দুপুরে লোকজন তেমন থাকার কথা নয়। বাজারে ঢোকার আগে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে নিয়েছি ডান দিকে সেই পুরোন কাঠের দোতলা বাড়িটা আছে কি না। আছে। বাজার দেখে অবশ্যি মনে হচ্ছিল কারফিউ লেগেছে। রাস্তা দু-ভাগে ভাগ হয়ে পুব-পশ্চিম চলে গেছে। স্টেশান যাব বলে চালককে বললাম পুবমুখি হতে। চালক দোমোহানি দিয়ে কয়েকশো বার লাটাগুড়ির দিকে গেলেও দোমোহানি স্টেশান দেখে নি কোনওদিন। মিনিট কয়েকের মধ্যেই ছিমছাম ছোট্ট স্টেশানের সামনে হাজির হলাম আমরা। সেই ঘুঁটেময় পোড়ো রেলস্টেশানটার বর্তমান চেহারা দেখলে ভূত লজ্জা পেয়ে আর আসবে না। আসামের দিকে যাওয়া বা আসাম থেকে আসা ট্রেনগুলো ঝমঝম করতে করতে চলে যায় দোমোহানি ঘেঁসে ময়নাগুড়ি বা জলপাইগুড়ি রোডের দিকে। এই স্টেশানের লাইনে তাদের চাকা গড়ায় না। শিলিগুড়ি জংশন থেকে আসা লাইন গুলমা-সেবক- ওদলাবাড়ি-মালবাজার-লাটাগুড়ি হয়ে এই স্টেশান ছুঁয়ে চলে যায় চ্যাংড়াবান্ধা-মাথাভাঙ্গা পাড়ি দিয়ে কোচবিহার। একটাই দু-মুখো ট্রেন। সকালে আসে সন্ধ্যায় যায়।

স্টেশান প্রায় ফাঁকা। জায়গাটা এলাকার উঠতি ছেলেমেয়েদের কাছে গল্প করে দু-দণ্ড কাটাবার স্থান হিসেবে কিঞ্চিৎ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। বাইরে সার সার টিনের চালযুক্ত ঘর। রেলের কোয়ার্টার। রেল লাইনের সমান্তরাল সে কোয়ার্টার যেন নিজেই একটা রেলগাড়ি। স্টেশানের বাইরে গাছের নিচে বেশ কয়েকজন তাস খেলছে। ছোট্ট একটা দোকান। চকচকে কেরোসিন স্টোভ আর কাচের গেলাস সাজান। কিন্তু দোকানিকে দেখা গেল না। পাশে বাক্সের মত রিক্সাগাড়িতে পান-বিস্কুট-চকলেট-সিগারেট নিয়ে এক মহিলা। তার পাশে ভ্রাম্যমান স্টোভ নিয়ে এক বুড়ো। চা তিনিই বানালেন।

স্টেশানের আপিস ঘরগুলো সবকটা বন্ধ। প্লাটফর্মে দুটো রাউন্ড দিয়ে বেরিয়ে আসতে গিয়ে চোখে পড়ল রেলের নোটিশ বোর্ড। দু-মুখো ট্রেন কখন আসে-যায়, তা লেখা। নিচে একফালি কাগজ সেটে কলম দিয়ে লিখে দেওয়া হয়েছে যে ট্রেন তিরিশ তারিখ অব্দি বন্ধ।

বেলা হুড়মুড় করে গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল। ঝপাঝপ রোদ্দুর পড়ে যাবে। চালককে বললাম, 'দোমোহানির লোকজন কোথায় থাকে জান?'

'না দাদা। এখানে পাড়া-টাড়া নেই।'

স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর ধোঁয়া উড়িয়ে বললাম, 'চলো।'

আবার দু-মিনিটের চলা। চমৎকার রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে পলহোয়েল স্কুল পেরিয়ে একটা বাঁক নিয়ে এসে পড়লাম বৃক্ষছায়াময় পথে। সামনেই রেলপুলিশের ট্রেনিং সেন্টার। এটা এখনও দোমোহানি ছেড়ে যায় নি। পেল্লায় লোহার গেটের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ল ঝাঁকে ঝাঁকে কাশফুল ফুটেছে। রাস্তা বাঁক নিয়েছে বাঁ দিকে। কয়েকজন ছাত্রী যাচ্ছে সাইকেল চালিয়ে। হুস হুস করে ছুটে গেল দুটো টোটো। বাঁ দিকের রাস্তা ধরে গাড়ি এগোতে লাগল ধীরে ধীরে। ছোট ছোট পাকা বাড়ি। অনেকটা জায়গা নিয়ে। ঝোপঝাড়-বাগান-গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে একটা ছোট্ট পাড়া। আরেকটু এগিয়ে গেলে একটা মোড়। কয়েকটা টোটো দাঁড়িয়ে। কয়েকটা দোকান।

ঠিক যেমন হয় এদিককার ছোট মফঃস্বলের পাড়াগুলো।

চালক আপ্লুত। আচ্ছা! এটাই হলো দোমোহানির

আসল এলাকা! তারপর দোমোহানি ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের আপিস, লোকনাথের মন্দির ইত্যাদি দেখার পর সে নিশ্চিন্ত হল যে দোমোহানি আসলে বাজারের চারপাশে জড়ো হয়ে থাকা কয়েকটা বাড়িঘর নয়। সে মোবাইল বের করে দেখে নিল ইন্টারনেট ধরছে কি না। ধরল।

যদি বলেন দোমোহানি যোগাযোগের দিক থেকে খারাপ জায়গায়, তা হলে খুব প্রতিবাদ করব। সেখান থেকে কুড়ি মিনিটে ময়নাগুড়ি অথবা জলপাইগুড়ি আসা যায়। সাঁইতিরিশ মিনিটে লাটাগুড়ি যাওয়া খুব সম্ভব। জাতীয় সড়কে এসে শিলিগুড়ির বাস ধরতে সময় লাগে সাত মিনিট। যেতে হয় পঞ্চাশ কিলোমিটারের কম। সুতরাং থাকার পক্ষে দোমোহানি মোটেই খারাপ জায়গা নয়। অথচ, আগেই বলেছি, দোমোহানি জনবিরল। বোধহয় দুয়োরানির কাছে কেউ থাকতে চায় না। তাই গ্রাম নয়, দোমোহানি যেন বিরাট একটা পাড়া।

বিস্তৃত খেত সবুজ হয়ে আছে। তার ওপর দিয়ে ঢেউ খেলে যাচ্ছে বাতাস। বাজার থেকে পশ্চিমমুখো রাস্তাটা উঁচু হয়ে তিস্তার বাঁধ বেয়ে চলে গেছে বাসুসুবা হয়ে ক্রান্তিমোড়। ডুয়ার্সের পুরনো চেহারা থমকে আছে সে সব জনপদে। সেদিকে হাঁসখালি পর্যন্ত গেছিলাম একবার। এবার অবশ্য পশ্চিমের পথ ধরার লক্ষ্য ছিল তিস্তার চেহারাটা একবার ভাল করে দেখা। খানিকটা গেলেই বাঁধ ফুরিয়ে যাবে। ঘিস নদী এসে মিশবে তিস্তায়। দুই নদীর মোহনার জন্যই তো দোমোহানিরা জন্মায়! তারপর একের পর এক বন্যাসংকুল জনপদ। বর্ষার তিস্তা ছিন্নভিন্ন করে দেয় সেসব জায়গা। চোখে না দেখলে বোঝা অসম্ভব!

কিন্তু সেদিকে এখন যাব না।

বাঁধের একদিকে নদী অপর দিকে বসতি। সবুজ গাছপালার ফাঁক দিয়ে বাড়িঘরের চাল দেখা যাচ্ছে। কয়েক দশক ধরে বাইরে থেকে আসা মানুষেরাই বসতি গড়ে তুলেছেন এদিকে। বাইক-গাড়ি ছুটছে মাঝে মাঝে। গাজলডোবার পর তিস্তার পূবপাড় ঘেঁসে থাকা জনপদগুলি থেকে লোকজন জাতীয় সড়কে উঠে জলপাইগুড়ি বা শিলিগুড়ি যাওয়ার জন্য এই পথটাই ব্যবহার করে বেশি। নদীর ওপর ঝুলে থাকা সূর্য একটু পরেই ডুব দেবেন। তিস্তার জল চিকচিক করছিল তার আলোয়। জাল হাতে জলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে একটা দুটো মানুষ। বোঝা গেল যে জল অনেকটা দূর পর্যন্ত গভীর নয়। একটু ঘাড় ঘোরাতেই দূরে তিস্তা ব্রিজের একটা অংশ চোখে পড়ল।

খানিক আগে স্টেশানে দাঁড়িয়ে থাকার সময় আমি মনে মনে নিজেকে রেলমন্ত্রী ভেবে নিয়ে দোমোহানির জন্য একটা প্রোজেক্ট ঘোষণা করে দিয়েছিলাম। একটা চকচকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রেলগাড়ি এনজেপি থেকে আসবে দোমোহানি। স্টেশানে থাকবে চমৎকার স্টল। ডুয়ার্সের নিজস্ব জিনিসপত্রে সাজান। পর্যটকেরা সেখানে কেনাকাটা করবেন। লাটাগুড়ি টুঁ মেরে আসবেন। স্টেশান লাগোয়া দোকানে ইচ্ছে হলে খেয়ে নেবেন কালো নুনিয়া চালের গরম ভাত আর—

ইয়েস! আর 'টাটকা মাছের ঝোল'। যদি বলেন দোমোহানির সেরা সম্পদ কী? তবে আমি একবাক্যে বলব 'তিস্তার টাটকা মাছ'। বিকেল-সন্ধে নাগাদ যাঁরা কাজ সেরে ভায়া দোমোহানি ফেরেন, তাঁদের অনেকেই একটু থমকে যান বাজারের সামনে। সাত সকালে দোমোহানি থেকে আজও কেউ কেউ মাছের হাঁড়ি নিয়ে জলপাইগুড়ি টাউনের দিনবাজারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন। কেউই একঘন্টার বেশি দাঁড়ান না। কারণ টাউনের নোবেলপ্রাপ্ত মৎস্যপ্রেমিরা মাছের হাঁড়ি ফাঁকা করতে এর বেশি সময় নেন না।

কিন্তু মাছ আর দোমোহানির ক'টা পরিবারকে অক্সিজেন যোগায়! বিচিত্র জনবিরলতা দোমোহানির অর্থনীতিকে বহুকাল ধরে বদ্ধ জলাশয়ের মত আটকে রেখেছে। কোনও তরঙ্গ ওঠে না। ওঠার আশু কোনও সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। অনেকবার মনে হয়েছে যে দোমোহানি হল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল স্থাপনের আদর্শ জায়গা। অথবা এখানে হতে পারে দুর্দান্ত ইকোপার্ক।

মানুষ দেখতে আসবে। নির্জন-নিঝুম অথচ যোগাযোগের পক্ষে ভাল জায়গায় থাকা এমন একটা জনপদ অথচ একটা রেলস্টেশন আছে।

কিন্তু দোমোহানিকে বোঝে কে? সে যে দুয়োরানি!

ফেরার পথে ম্লান হয়ে আসা আলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজেকে প্রধানমন্ত্রী ভেবে নিলাম। দোমোহানির জন্য বানিয়ে দিলাম একটা চমৎকার সায়েন্স সিটি। মানসচক্ষে দেখলাম সংসদে দাঁড়িয়ে বলছি, 'দোমোহানির সব চাইতে প্লাস পয়েন্ট হল সেখানে কোনও ব্রিজ নেই।'

ব্রিজের ব্যাপারটা কিন্তু সত্যি। দোমোহানিতে ঘোরাঘুরি করতে গিয়ে কোনও ব্রিজ চোখে পড়ে নি। বিশ্বাস না হলে ঘুরে আসুন।

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

নানা অভাব নিয়েও চলছে গুরজংঝোরা তুনবাড়ি মালনদি

ডুয়ার্সের চা বাগান চিনুন

শিলিগুড়ির যানজট পেরিয়ে সেবক রোড ধরে একটু এগোতেই এসে যায় মহানন্দা অভয়ারণ্য। দুধারে শাল-সেগুনের নিবিড় জঙ্গল নিয়ে মসৃণ পিচপথ তীরের মত সোজা চলে গেছে দূরে নীল পাহাড়ের দিকে। আর মনটা চলে গেল ইতিহাসের পাতায়। ব্রিটিশদের চা বাগিচা পত্তনের সাতকাহন শুনেছিলাম রাম অবতার শর্মার কাছে। ১৮৭৫ সালে এইচ পি ব্রুহাম এবং হাউটনের স্থাপিত প্রথম চা বাগিচা গজলডোবা। এরপর মিস্টার পিলাম প্রতিষ্ঠিত ফুলবাড়ি, কর্নেল মুন্সি প্রতিষ্ঠিত বাগরাকোট, মিনর্থ এর রাঙাতি, ক্রেসওয়েল কোং এর বাগিচা ছিল গ্যান্ডাভিল যার মালিক ছিলেন ডব্লিউ এস ক্রেসওয়েল। এই সমস্ত ব্যক্তি এবং কোম্পানির নামে প্রথমে পাট্টা প্রদান করা হয়। ১৮৮৭ তে বেতবাড়ি, বামনডাঙ্গা, এলেনবাড়ি, ডামডিম, কুমলাই,ওয়াশাবাড়ি এই ছয়টি বাগান ৫ বছরের পাট্টায় শিলিংফোর্ড এন্ড কোং এর নামে প্রদান করা হয়। মালবাজার মহকুমায় এই সময়কালের মধ্যে স্থাপিত যে বাগানগুলি এখনও ভালভাবে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে কাজ করছে তাদের মধ্যে অন্যতম বাগান হল ওয়াশাবাড়ি এবং এলেনবাড়ি।

ডামডিম মোড়। এখান থেকে একটি পথ রানিচেরা, সাইলি চা বাগান, গরুবাথান হয়ে লাভার দিকে প্রসারিত। অন্য রাস্তাটা ডামডিম হয়ে সোজা সরলভাবে গেছে রাজা চা বাগানের দিকে। এবার আমরা যাব মালনুদি, তুনবাড়ি এবং গুরজংঝোরা চা বাগানে। নিউ মাল স্টেশনে দূরপাল্লার ট্রেনের স্টপেজ অনেকগুলো। সরাসরি দিল্লি, কলকাতা এবং গৌহাটির সঙ্গেও যোগাযোগ করা যায়। রয়েছে প্যাসেঞ্জার এবং এক্সপ্রেস ট্রেন। ছবির মতো ঝকঝকে তকতকে স্টেশন দেখেই মন আনন্দে ভরে যায়। একসময় খুবই জমজমাট ছিল মালবাজার। বাঁ দিকে নিউ মাল জংশন হয়ে একটি শাখা রেলপথে দেশভাগের আগে নেওড়ানদী, বড়দিঘি, লাটাগুড়ি, ময়নাগুড়ি রোড, চ্যাংড়াবান্ধা হয়ে রংপুর, লালমনিরহাট পর্যন্ত যাতায়াত করত যাত্রীবাহী ট্রেন। আজ তা চলে চ্যাংড়াবান্ধা হয়ে মাথাভাঙ্গা, নিউ কোচবিহার। যা যুক্ত আছে আসাম মেইন লাইনের সঙ্গে। ডুয়ার্সের বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার জন্য পশ্চিম প্রান্তের অন্যতম জংশন মাল। শিলিগুড়ি যাওয়ার বাস হরদম পাওয়া যায়। মালবাজার শহর থেকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গোরুমারা জাতীয় উদ্যান হয়ে জলপাইগুড়ি যাওয়ার বাস। মালবাজারে থাকা এবং খাওয়ার জন্য অনেকগুলি হোটেল রয়েছে।

গুরজংঝোরা

মালবাজার পার্ক থেকে গুরজংঝোরা চা বাগান ৬ কিলোমিটারের মতো। এল আই সি অফিস থেকে বাঁদিকে কিছুটা গিয়ে লাভা রোডে উঠে বাঁদিকে বাঁক নিয়ে কিলোমিটার তিনেক এগোলেই গুরজংঝোরা চা বাগিচা। চা বাগানটির পরিচালক গোষ্ঠী গুরজংঝোরা টি কোম্পানি। বাগানটি আই টি পি সংগঠনের সদস্য। বর্তমান কোম্পানি ১৮৮২ সালে বাগানটির দায়িত্ব গ্রহণ করে। কোম্পানির মালিকের নাম কিষাণ কল্যাণী। কোম্পানির ঠিকানা সরস্বতীপুর বিল্ডিং,জলপাইগুড়ি। গুরজংঝোরা চা বাগানটির আয়তন এবং চাষযোগ্য উৎপাদনক্ষম আবাদীক্ষেত্র ৩২৬.৩৬ হেক্টর। প্রতি হেক্টর ড্রেন এবং সেচযুক্ত প্ল্যান্টেশন এরিয়া থেকে প্রতি হেক্টর জমি পিছু ১৩০০ কেজি করে ইনঅরগ্যানিক সিটিসি চা উৎপাদিত হয়। মোট কর্মরত শ্রমিক ৬৯৫ জন। গুরজংঝোরা চা বাগানে নিজস্ব চা পাতা উৎপাদনের গড় ১৬--১৭ লাখ কেজি। ফ্যাক্টরিতে নিজস্ব উৎপাদিত তৈরি চা ৪--৫ লাখ কেজি। বাইরের বাগান থেকে সংগৃহিত কাঁচা পাতায় তৈরি চা ১৫--১৮ লাখ কেজি। মোট বাৎসরিক উৎপাদিত চা ২০-২২ লাখ কেজি। বাগানটি এম জি এন আর ই জি এস এর সুবিধা পায় না।

গুরজংঝোরা চা বাগিচায় হাসপাতাল নেই। আউটার ডিসপেনসারি আছে। ডাক্তার আছেন। প্রশিক্ষিত নার্স নেই। বাগিচায় মিডওয়াইভসও একজন। কম্পাউন্ডার এবং স্বাস্থ্য সহযোগী ১ জন। বাগিচার হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটার নেই। অ্যাম্বুলেন্স আছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই। চিকিৎসার জন্য গড়ে বছরে ১১০ জন শ্রমিককে রেফার করা হয়। বাগিচায় পর্যাপ্ত ওষুধ সরবরাহ হয় না। ওষুধের তালিকা স্টক অনুযায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নোটিশ বোর্ডে দেওয়া হয় না। উন্নত মানের পথ্য সরবরাহ করা হয় না বললেই চলে। নিয়মিত ডায়েট চার্ট অনুসরন করা হয় না। বাগিচায় লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার নেই ২০১১ সাল থেকে। বাগিচায় ক্যান্টিন নেই। ক্রেশের সংখ্যা ১টি। ক্রেশে পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা আছে। শৌচালয় আছে। দুধ, বিস্কুট বা পুষ্টিকর খাবার, পোশাক ক্রেশের শিশুদের সরবরাহ করা হয় না নিয়মিত। পর্যাপ্ত পানীয় জল ক্রেশে এবং চা বাগানে সরবরাহ করা হয় না। ক্রেশে মোট অ্যাটেন্ডেন্ট ২ জন। বাগিচায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। বাগিচা সংলগ্ন উচ্চ বিদ্যালয় নেই। শ্রমিক সন্তানদের বিদ্যালয়ে নেবার জন্য যানবাহনের ব্যাবস্থা হিসাবে বাগিচায় বাস আছে। বাগানে বিনোদনমূলক ক্লাব আছে। খেলার মাঠ আছে। গুরজংঝোরা টি গার্ডেনে বিগত অর্থবর্ষে ১৮ লাখ টাকা প্রভিডেন্ড ফান্ড খাতে জমা পড়েছে বলে জানা গেছে। পি এফ, গ্র্যাচুইটি বাবদ বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ বকেয়া নেই। শ্রমিকদের মজুরি, রেশন, এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা চুক্তি অনুযায়ী দেওয়া হয়।

তুনবাড়ি

ক্যালটাক্স মোড় থেকে রিশি রোড হয়ে রওনা দিলাম তুনবাড়ি চা বাগান। রিশি রোড থেকে লাভা রোড ধরে অল্প গিয়ে তুনবাড়ি মোড়। তুনবাড়ি চা বাগান ডুয়ার্সের সমস্যাদীর্ণ চা বাগানগুলির মধ্যে একটি। মালিক আসে আর যায়, কিন্তু তুনবাড়ির সমস্যা যেন শেষ আর হতে চায় না।

মালবাজার সাব ডিভিশনের তুনবাড়ি চা বাগানটির পরিচালক গোষ্ঠী তুনবাড়ি টি কোম্পাণী লিমিটেড। বাগানটি ডি বি আই টি এ সংগঠনের সদস্য। মোট কর্মরত শ্রমিক ৩৩৫ জন। বাগানে প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ৩ টি — এন ইউ পি ডব্লিউ, টি টি পি ডব্লিউ ইউ, সি বি এম ইউ। কিন্তু বাগিচায় গিয়ে শাসকদলের ট্রেড ইউনিয়ন ছাড়া কোন নেতাকে বা অন্য ট্রেড ইউনিয়নের কাউকেই চোখে পড়ল না কথা বলার জন্য। তুনবাড়ি চা বাগানটির ড্রেন এবং সেচের

একসময় খুবই জমজমাট ছিল মালবাজার। বাঁ দিকে নিউ মাল জংশন হয়ে একটি শাখা রেলপথে দেশভাগের আগে নেওড়ানদী, বড়দিঘি, লাটাগুড়ি, ময়নাগুড়ি রোড, চ্যাংড়াবান্ধা হয়ে রংপুর, লালমনিরহাট পর্যন্ত যাতায়াত করত যাত্রীবহী ট্রেন। আজ তা চলে চ্যাংড়াবান্ধা হয়ে মাথাভাঙ্গা, নিউ কোচবিহার। যা যুক্ত আছে আসাম মেইন লাইনের সঙ্গে। ডুয়ার্সের বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার জন্য পশ্চিম প্রান্তের অন্যতম জংশন মাল। শিলিগুড়ি যাওয়ার বাস হরদম পাওয়া যায়।

সুবিধাযুক্ত অঞ্চল এবং মোট চাষযোগ্য উৎপাদন হয় ১৫৩.৪৩ হেক্টর জমিতে। প্রতি হেক্টর ড্রেন এবং সেচযুক্ত প্ল্যান্টেশন এরিয়া থেকে প্রতি হেক্টর জমি পিছু ১৩০০ কেজি করে চা উৎপাদিত হয়। তুনবাড়ি চা বাগানে নিজস্ব চা পাতা উৎপাদনের গড় ১০--১১ লাখ কেজি। ফ্যাক্টরিতে নিজস্ব মোট বাৎসরিক উৎপাদিত চা ২৩ লাখ কেজি। বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাগানে ইনঅরগ্যানিক সিটিসি চা উৎপাদিত হয়। বাগানটি এম জি এন আর ই জি এস এর সুবিধা পায় না। মোট শ্রমিক ৩৫৫ জন। তুনবাড়ি চা বাগিচায় হাসপাতাল নেই, কম্পাউন্ডার অথবা স্বাস্থ্য সহযোগী ১ জন। ১ টি আউটার ডিভিশন ডিসপেনসারি আছে। অ্যাম্বুলেন্স আছে। ক্রেশের সংখ্যা ১। ক্রেশে পর্যাপ্ত জলের ব্যাবস্থা নেই, শৌচালয় অপরিচ্ছন্ন, দুধ, বিস্কুট বা পুষ্টিকর খাবার ক্রেশের শিশুদের কাছে স্বপ্ন।। শিশুদের পোশাক সরবরাহ করা হয় না। ক্রেশে মোট অ্যাটেন্ডেন্ট ৩ জন। পানীয় জল ব্যবহারযোগ্য নয়। শ্রমিক সন্তানদের বিদ্যালয়ে নেবার জন্য যানবাহনের ব্যাবস্থা নেই। বাগানে বিনোদনমূলক ক্লাব আছে। খেলার মাঠ আছে। তুনবাড়ি টি গার্ডেনে বিগত অর্থবর্ষে ১৫ লাখ টাকা প্রভিডেন্ড ফান্ড খাতে জমা পড়েছে। পি এফ বকেয়া, গ্র্যাচুইটি বাবদ বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ বকেয়া, শ্রমিকদের মজুরি, রেশন এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা চুক্তি অনুযায়ী দেওয়া হলেও অনেক সময় বকেয়া থাকে।

চা বাগিচার শ্রমিক কর্মচারীরা নেই রাজ্যের বাসিন্দা হলে কী হবে, গুরজংঝোরা, তুনবাড়ি, মালনুডিতে প্রকৃতি যেন উজার করে দিয়েছে সবকিছু। নদী, পাহাড়, ঝোড়া খোলা, আরণ্যক সৌন্দর্য্য অসাধারন। মখমলে সবুজ চা বাগিচার বুক চিরে পাহাড়ের সানুদেশ ছুঁয়ে বয়ে গেছে কত নদী, ঝোরা, খোলা। বিচিত্র সব নাম। যেন কবি ছন্দ মিলিয়ে নামকরণ করেছেন লিস, ঘিস, চেল, ডায়না। ভালোবেসে কে যে নদীগুলির নামকরণ করেছিল কেউ জানে না। অজস্র শিশু, শিরীষ, শিমূল গাছের ছায়ায় ঝলমলে প্রকৃতি, পেছনে নীলাভ পাহাড় অপরূপ প্রাকৃতিক শোভা নিয়ে দন্ডায়মান। চা বাগান, পাহাড় এবং অরণ্যের পথে ফুরফুরে দক্ষিণা হাওয়ায় খুশির মেজাজে হেঁটে চলা যায় সামনে। মালনদি চা বাগান ছোটো হলে কি হবে, চা এর গুনগত মান খুব ভালো। চা বাগিচার মন্দির, চা নার্সারি, বাবুদের আস্তানা ছাড়িয়ে পৌঁছে যাওয়া যায় দিগন্তবিস্তৃত চায়ের সমুদ্রে। বিস্তৃত মাঠ, শীর্ণকায় নদী, গগনচুম্বী ঝকমকে নীল পাহাড়, পথের দুধারে কৃষ্ণচূড়া, শিরীষ, শিমূল লালে লাল। কতরকম পাখির সংগীত প্রতিযোগিতা চলছে তার কোনও হিসেব নেই।

মালনদি

মালবাজার সাব ডিভিশনের মালনুদি বা মালনদি চা বাগানটির পরিচালক গোষ্ঠী মালনুদি টি এস্টেট প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি। বাগানটি আইটিপিএ সংগঠনের সদস্য। বর্তমান কোম্পানি ১৯৯৬ সালে বাগানটির দায়িত্ব গ্রহণ করে। বাগানে প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ৩ টি— সি বি এম ইউ, এন ইউ পি ডব্লিউ, পি টি ডব্লিউ ইউ। মালনুদি চা বাগানটির মোট চাষযোগ্য আবাদীক্ষেত্র ১০৭.৬৯ হেক্টর। ড্রেন এবং সেচযুক্ত প্ল্যান্টেশন এরিয়া থেকে প্রতি হেক্টর জমি পিছু ১৯৭৪ কেজি করে চা উৎপাদিত হয়। মোট কর্মরত শ্রমিক ৩১২ জন। মালনুদি চা বাগানে নিজস্ব চা পাতা উৎপাদনের গড় ৭ লাখ কেজি। ফ্যাক্টরিতে নিজস্ব উৎপাদিত চা গড়ে ২ লাখ কেজি। বাইরের বাগান

মাল নদী চা-বাগানে বস্ত্র বিতরণ

চা বাগিচার শ্রমিক কর্মচারীরা নেই রাজ্যের বাসিন্দা হলে কী হবে, গুরজংঝোরা, তুনবাড়ি, মালনুডিতে প্রকৃতি যেন উজার করে দিয়েছে সবকিছু। নদী, পাহাড়, ঝোড়া খোলা, আরণ্যক সৌন্দর্য্য অসাধারন। মখমলে সবুজ চা বাগিচার বুক চিরে পাহাড়ের সানুদেশ ছুঁয়ে বয়ে গেছে কত নদী, ঝোরা, খোলা। বিচিত্র সব নাম।

থেকে সংগৃহিত কাঁচা পাতা ৬--৭ লাখ কেজি এবং ফ্যাক্টরিতে উৎপাদিত মোট বিক্রয়যোগ্য চা ২ লাখ কেজি। মোট বাৎসরিক উৎপাদিত চা ৪ লাখ কেজি। বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাগানে ইনঅরগ্যানিক সিটিসি চা উৎপাদিত হয়।

মালনুদি চা বাগিচায় হাসপাতাল নেই। ডিসপেনসারি আছে। ডাক্তার আছে। কম্পাউন্ডার ১ জন। অ্যাম্বুলেন্স আছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে। চিকিৎসার জন্য গড়ে বছরে ২০ জন শ্রমিককে রেফার করা হয়। বাগিচায় পর্যাপ্ত ওষুধ সরবরাহ হয় না। অস্থায়ী ক্রেশের সংখ্যা ২টি। দুধ, বিস্কুট বা পুষ্টিকর খাবার ক্রেশের শিশুদের দেওয়া হয় না। শিশুদের পোশাক সরবরাহ করা হয় না নিয়মিত। পর্যাপ্ত পানীয় জল ক্রেশে এবং চা বাগানে সরবরাহ করা হয় না। ক্রেশে মোট অ্যাটেন্ডেন্ট ১ জন। বাগিচায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। বাগিচা সংলগ্ন উচ্চ বিদ্যালয় নেই। শ্রমিক সন্তানদের বিদ্যালয়ে নেবার জন্য যানবাহনের ব্যাবস্থা হিসাবে আছে ১ টা ট্রাক্টর। বাগানে বিনোদনমূলক ক্লাব আছে। খেলার মাঠ আছে। টি গার্ডেনে প্রভিডেন্ড ফান্ড খাতে বা গ্র্যাচুইটি বাবদ বরাদ্দ অর্থ নিয়মিত জমা পড়ে। শ্রমিকদের মজুরি, রেশন এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা চুক্তি অনুযায়ী দেওয়া হয়।

পরবর্তী গন্তব্য সামাবিয়ং চা-বাগান। সেখানে নতুন একটি হোম স্টে গড়ে উঠেছে। দার্জিলিং জেলার কালিম্পং মহকুমায় পাহাড়ের ওপরে হাতে গোনা যে কয়টি চা বাগান আছে তার মধ্যে অন্যতম সামাবিয়ং টি এস্টেট। হাতবদল হয়ে যাবার পর নতুন মালিক নাম বদলে দিয়েছে। একটি চা বাগান এবং তার লাগোয়া একটি বসতির নাম আমূল পাল্টে যেতে পারে সেটা ধারণা ছিল না। গরুবাথান পেরোতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। ঘরে ঢোকার কয়েক কিলোমিটার আগে থেকেই রাস্তা ভাঙাচোরা। হেডলাইটের আলোয় বাইরের পৃথিবীটা যেন ফুরিয়ে গেছে। রাতের অন্ধকারে মনে হল নাচের ছন্দে ছন্দে দুলতে দুলতে একটা গ্রামে পৌঁছলা। রাস্তার শেষ ৫০০ মিটার আরও খারাপ। আর একটু পরে হোম স্টের সামনে পৌঁছালাম। নেপালি দিদি সপরিবারে স্বাগত জানাতে নেমে এলেন। দেখি ঠান্ডাটা বেশ মনোরম। কাঠের ঘরে ঢুকে আরাম পেলাম এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গরম চা চলে এল। মহিলা এবং তার স্বামী দুজনেই চা বাগানে কাজ করে। তার সঙ্গে সম্প্রতি হোম স্টে গড়ে তুলেছেন। জানালেন, এখানে দর্শনীয় বলতে শান্ত সুন্দর দুষণহীন সবুজ প্রকৃতি। কিন্তু সমস্যা একটাই। পানীয় জলের অভাব। স্থানীয় লোকজন অন্তত ১০০০ ফুট নিচে নদী থেকে জল এনে পান করেন। তাই পর্যটকেরা এলে শহর থেকে মিনারেল ওয়াটার সঙ্গে আনতেই হবে।

সকালে আলো ফুটতেই আমাদের হোম স্টে দেখে মুগ্ধ হলাম। পাহাড়ের উঠোনে ছাদের প্রান্তে সারি দিয়ে কয়েকটা কাঠের বাড়ি। কয়েকটা পাকা বাড়িও আছে। নানা রকমের রং দেওয়ালে। জমিতে মরসুমী ফুলের বাগান। তার সামনে দিয়ে পাহাড়ের দেয়াল ধরে কাঁচা রাস্তা চলে গেছে। পাহাড়ের দেয়ালে শতশত মরসুমী ফুল ফুটে রয়েছে। চায়ের আশায় দিদির ডাইনিং হলে উঁকি দিয়ে দেখি ছাদে দড়ি টাঙিয়ে লতানো কোয়াস গাছকে সোজা করা হয়েছে আর তাতে শত শত টাটকা সবুজ কোয়াশ ছড়ানো রয়েছে। একেবারে ছাদের কোণা থেকে শুরু করে গাছেগাছে প্রচুর কোয়াশ। তাই গাছগাছড়া দড়িসহ নুয়ে পড়েছে। গ্রামের ছেলে-মেয়েরা পরিপাটিভাবে পোশাক পরে স্কুলে যাবার পথে নিজেদের মধ্যে দৌড় প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত। ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়ি চা বাগান দর্শনে এবং আশেপাশের প্রকৃতি দর্শনের জন্য।

ভীষ্মলোচন শর্মা

পর্যটকের আদরের শহর জলপাইগুড়ি থেকে

ডুয়ার্সের অমূল্য পথে স্বল্প মূল্যে

এইসময় শহরটা আড়মোড়া ভাঙে একবার। ভোর ভোর হুইসল দিয়ে একটা ট্রেন এসময় শহরে ঢোকে। পুজোর আর বাকি নেই। আপাতত একটা হাল্কা কুয়াশার চাদর দেখা যাচ্ছে ফাঁকা ফাঁকা জায়গায়। তিস্তার চরটা কি এতদিনে কাশফুলে ভরে গেছে? অনেক কিছুই হয়নি এ শহরটার সেভাবে। খুব বড় নার্সিংহোম নেই, নামি ডাক্তার নেই, দূরপাল্লার ট্রেনগুলোও শহরের বাইরে দিয়ে চলে যায়। সাকুল্যে দুটিমাত্র ট্রেন আসে আর ছেড়ে যায় সারাদিনে এই শহরের ছোট্ট স্টেশনটায়। আর একটি ছাড়ে সপ্তাহে তিনদিন।

এই এতসব না পাওয়ার পরেও এই শহরটার নিজের মত করে কিছু পাওয়া আছে। ঠিক যেমন এই ভোরবেলা কুয়াশার চাদর সরিয়ে প্রাতঃভ্রমণকারীরা রাস্তায় নামছেন। কেউ চলেছেন তিস্তা সংলগ্ন জুবিলি পার্ক-স্পার চত্বরে, কেউ বা চলেছেন রাজবাড়ির দিঘিতে। কেউ হয়ত আবার হাঁটছেন শহরের কেন্দ্রস্থল কদমতলা থেকে খানিকদূর গেলেই বড় বড় গাছে ঢাকা তালমা চাউলহাটির রাস্তায়। অবারিত সবুজ আর ভোরের নির্মল হাওয়ায় মন প্রাণ তাজা করে প্রাতঃভ্রমণ শেষে তারা জড় হবেন কোনও চায়ের দোকানে। চলবে আড্ডা। আড্ডা এই শহরের একটা বৈশিষ্ট্য। শুধু অল্পবয়সীদের আড্ডা নয়, মধ্যবয়সী এমনকি বেশি বয়সীদের দেদার আড্ডা। ঘন্টার পর ঘন্টা চায়ের দোকানে বসে বা রাস্তার ধারে। কদমতলা মোড় থেকে থানামোড় বা থানামোড় থেকে মেরিনা নার্সিংহোমের সামনে দিয়ে বড় ডাকঘর অথবা দিনবাজার রায়কতপাড়া, আদতে পুরো শহরটার প্রায় সবখানেই দেখা যায় সন্ধে থেকে রাস্তার দুধারে নানান আড্ডা চলছে।

এরকমই কোনও এক ভোরে আপনি হয়ত এই শহরটায় নামলেন। হাতে দুদিন সময় নিয়ে। ছোট বড় মিলে বেশ কিছু হোটেল পেয়ে যাবেন। তাতে একটা জায়গা করে নিয়ে বেড়িয়ে পড়ুন একটা ই-রিক্সা নিয়ে শহরটা ঘুরে দেখতে। চলে যান তিস্তার ধারে বা দেবী চৌধুরাণী মন্দিরে। ফেরার পথে একচক্কর ঘুরে নিন ভগ্নদশায় পড়ে থাকা পুরনো বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ি বা তার পাঁচশো বছরেরও বেশি সময় ধরে দুর্গাপুজো চলতে থাকা ঠাকুরদালানে। হাঁটতে হাঁটতে চলে আসুন রাজবাড়ির দিঘিতে। দিঘি ঘিরে প্রাতঃভ্রমণকারীরা আর ঘাটে তখন সাঁতারের ভিড়। হাতে ক্যামেরা থাকলে ভালো ছবি হতে পারে একখানা। এরপর জুবিলি পার্কে বা করলার পাশে বাঁধের উপর দিয়ে সবুজ ছাওয়া রাস্তাটায় হাঁটতে আপনার ভাল লাগবেই। নদীতে নেমে নৌকোয় উঠে হারিয়ে যেতে পারেন তিস্তার কাশবনের নিবিড় চরে। পূর্ণিমার সন্ধে হলে নিজেকে 'শ্রীকান্ত' মনে হতেই পারে। বিকেলের দিকে আবার বের হয়ে পড়ুন ঘুরতে। ঘুরে আসুন শহর সংলগ্ন কালুসাহেবের মাজারে। মাঝে স্বাদ নিয়ে নিন ঢাকেশ্বরীর কালাকাঁদ আর বিশ্বনাথের কচুরীর। হ্যালোজেনের হলুদ আলোয় তখন চারিদিক মায়াময়। রাত বাড়ছে আর আড্ডাও বাড়ছে শহরের রাস্তায়। আপনার হাতে আরও দুদিন। ভাবছেন কী করা যায়?

জলপাইগুড়ি শহর ডুয়ার্সের গেটওয়ে। তিস্তা পেরিয়ে ডুয়ার্সভূমিতে ঢুকে পড়বার জন্য আপনাকে সাদর আপ্যায়ন জানাতেই যেন যুগ যুগ ধরে দাঁড়িয়ে আছে এই জল শহর। জলপাইগুড়ি থেকে সামান্য এগিয়ে বাঁদিকে বা ডানদিকে গেলেই অফুরন্ত সবুজ। চা বাগান জঙ্গল পাহাড় পাহাড়ি নদী। না, লাটাগুড়ি যেতে বলছি না আপনাকে। বলছি না গরুমারা যেতেও। এসবে তো সবাই যায়। আমরা একটু অন্যভাবে ভাবি। বৃষ্টির ভোরে ঘুম ভেঙে জলপাইগুড়ির শান্তিপাড়া থেকে বাস ধরে নিই ডুয়ার্সের গরুবাথান বা বানারহাটের। মন চাইলে নেমে যেতে পারি চালসায়। সেখান থেকে যদি ইচ্ছে হয় গাড়ি ধরে বিন্দু- ঝালং। আবার সেদিকে না গিয়ে যাওয়া যেতে পারে মেটেলি- সামসিং। আবার এতসব দিকে না গিয়ে চালসা থেকে পায়ে পায়ে কোনওদিন হেঁটে চলে যাই আইভিল বাগানে। রেললাইন পেরিয়ে পাহাড়ের ঢালে সে এক অসাধারণ চা বাগান।

যদি বাস থেকে নামতে ইচ্ছে না করে তাহলেও কোনও সমস্যা নেই। সোজা চলে যান গরুবাথান। এককাপ চা খেয়ে হাঁটতে হাঁটতে রওনা দিন চেলখোলার দিকে। দূরে পাহাড়-পাহাড়ি নদী-ছোট ছোট ছাউনিতে বসার সুন্দর ব্যবস্থা। পাশেই গরম গরম মোমো। এককথায় অনবদ্য। খানিক সময় সেখানে কাটিয়ে নদী পেরিয়ে হাঁটতে থাকুন সোজা রাস্তায়। পৌছে যাবেন আপার ফাগুর মনেস্ট্রিতে। অদ্ভুত সুন্দর এ পথে আরও খানিক গেলেই ঝান্ডি। অথবা চলে যান অল্প সময়ের জন্য লাভা। কিংবা যে রাস্তায় নেমেছেন চেলখোলার দিকে তার উল্টোদিকের পাহাড়ে খাড়া রাস্তায় যেতে পারেন ইতিহাসের ডালিমফোর্টে। যাওয়ার আগে বাজার থেকে অবশ্যই জেনে নিতে হবে যে গাড়িতে আপনি গেছেন তার ফেরার সময়টা, যদি একবারে ফিরতে চান জলপাইগুড়ি শহরে। না হলে অনেক বেলা পর্যন্তই মালবাজারের গাড়ি মেলে। সেখান থেকে গাড়ি বদলে জলপাইগুড়ি ফেরা।

আবার এমন কিছু নাও হতে পারে। ভোরের

ওদলাবাড়ির বাস ধরে নেমে যান গজলডোবায়। সেখানে এখন ভোরের আলো। দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। শীতকাল হলে নৌকো ভাড়া করে দেখতে চলুন পরিযায়ী পাখিদের। ফিরে এসে তিস্তার ধারের হোটেলে ডুয়ার্সের বোরোলি মাছ দিয়ে ভাত খেয়ে আপালচাঁদ ফরেস্টের ওপর দিয়ে চলে যান ওদলাবাড়ি। ঘুরে আসুন মংপং বা সেবক। তবে ওদলাবাড়ি থেকে জলপাইগুড়ি শহরে ফেরার সেই বাস কিন্তু ঠিক চারটের সময় ছাড়ে। আবার অন্যপথে ফিরতে চাইলে চলে যান মালবাজার। সেখান থেকে ফিরে আসুন জলপাইগুড়ি।

এসবই জলপাইগুড়ি শহর থেকে মন ভাল করার সব ঠিকানা, যাদের বুকের ভেতর চরৈবেতি তাদের জন্য দিনে দিনে ঘুরে আসবার জন্য অর্থাৎ ডে-ট্রিপ।

দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। শীতকাল হলে নৌকো ভাড়া করে দেখতে চলুন পরিযায়ী পাখিদের। ফিরে এসে তিস্তার ধারের হোটেলে ডুয়ার্সের বোরোলি মাছদিয়ে ভাত খেয়ে আপালচাঁদ ফরেস্টের ওপর দিয়ে চলে যান ওদলাবাড়ি। ঘুরে আসুন মংপং বা সেবক। তবে ওদলাবাড়ি থেকে জলপাইগুড়ি শহরে ফেরার সেই বাস কিন্তু ঠিক চারটের সময় ছাড়ে।

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:15,000
Full Page, B/W: 9,000
Half Page, Colour: 8,000
Half Page, B/W: 6,000
Back Cover: 30,000
Front Inside Cover: 20,000
Back Inside Cover: 20,000
Double Spread: 30,000

Special Rates for Local Trade only
Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page Bleed {21cm (W) X 28 cm (H)}, Non Bleed {18cm (W) X 25 cm (H)}, Half Page Horizontal {18 cm (W) X 12 cm (H)}, Vertical {8.5 cm (W) X 25 cm (H)}, Strip Ad Vertical {5.6 cm (W) X 25 cm (H)}, Horizontal 18 cm (W) X 6.5 cm (H), 1/4 Page 8.5 cm (W) X 12 cm (H), 1/6 Page {5.75 cm (W) X 12.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2018 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

আর মন যদি ডুয়ার্সের এই অপার সৌন্দর্য দেখে ঘরে ফিরতে না চায় সেদিন আপনি চলতেই পারেন দিকশূন্যপুরে। ধরে নিই সেই বাসটি যেটি ভোরবেলা জলপাইগুড়ি থেকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে ডুয়ার্সের আরও ভেতরে, নাম তার বানারহাট। ধূপগুড়ি-গয়েরকাটা পেরিয়ে সে রাস্তা চা বাগানের পাশ দিয়ে। বানারহাট থেকে সদলবলে হৈ হৈ করে জায়গা করে নিই চামুর্চির ছোটগাড়িগুলোতে। দূরে পাহাড়, রাস্তার দুধারে অনাবিল সবুজ ঢেউ খেলানো চা বাগান, কে যেন গেয়ে ওঠে কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা। চামুর্চি বাজারে নেমে লোকজনকে জিজ্ঞেস করে বাজারের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে যাই সুকৃতি নদীর ধারে। ডলোমাইটের আকরে ভর্তি এ অঞ্চল। নদীতে ব্রিজ নেই। তার ওপর বর্ষাকাল। আগের রাতের ভুটান পাহাড়ের বৃষ্টিতে নদীর ধারাগুলো তখন খরস্রোতা।

জলপাইগুড়ি থেকে দিনে দিনে অল্প দূরত্বেই ঘুরে আসা যায় পানবাড়ি-রামশাই। একদিকে গরুমারা জঙ্গল, অন্যদিকে দুই রঙে বয়ে চলা মূর্তি-জলঢাকা নদী। অথবা তিনবিঘা হয়ে বাংলাদেশ সীমান্ত দেখে ফিরে এসে জল্পেশ-জটিলেশ্বর। আরও দূরে যদি পথ হারাতে চান, কোনও এক সকালে জলপাইগুড়ি থেকে পৌছে যান শিলিগুড়ির মিত্তাল বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায়। সোজা গাড়ি পেলে ভাল, না হলে যে কোনও কালিম্পং বা গ্যাংটকের গাড়ি করে পৌছে যান রম্বি। হাসিমুখের দাজু আপনাকে পথ বলে দেবে মংপুর। ঘুরে দেখুন মৈত্রেয়ী দেবীর বাড়িতে কবিগুরুর কাটানো দিনগুলো।

ভয় পাই পেরুতে। কিন্তু শেষ অব্দি স্থানীয় লোকের সাহসে ভর দিয়ে নদী পেরিয়ে পৌছে যাই চামুর্চি ইকো রিসর্টে। ডুয়ার্স আসলে কী কোথায় গেলে মিলবে তার সবচেয়ে মায়াবী রূপ তা বুঝতে চাইলে একরাত কাটানো চাই এই রিসর্টে। কখন যে ভুটান পাহাড়ে রামধনু উঠছে,আবার মিলিয়ে যাচ্ছে, বৃষ্টি-রোদ সব মিলে এককথায় এ রিসর্ট থেকে যা দেখা যায় তা অনির্বচনীয়। তেমনই অনবদ্য এই রিসর্টের আতিথেয়তা। ভোলার নয় দেবাশীষবাবু বা চামুর্চির অন্য সব যুবকদের হাসি মুখগুলো। তারাই মন প্রাণ দিয়ে চালাচ্ছেন এই রিসর্ট।

রাত কাটিয়ে ফেরার পথে সকালে একচক্কর দিয়ে আসা যায় ভুটানের সামচিতে। ছোট্ট শহর। ফাঁকা-ফাঁকা, রাস্তায় লোকজন তেমন নেই। মনেষ্ট্রি-মন্দির-ডুক ফ্যাক্টরি বা ব্যক্তিগত গাড়ি থাকলে তেল ভরে নেওয়া যায় এখানে অনেক কম দামে। ফিরে চামুর্চি চেকপোস্ট থেকে গাড়ি ধরে আবার বানারহাট। মালঞ্চ হোটেলে চমৎকার ভোজন সেরে আড়াইটে নাগাদ সোজা জলপাইগুড়ি শহরে ফেরার বাস।

কোনওদিন নাগরাকাটা শুলকাপাড়া পেরিয়ে সোজা চলে যাওয়া যেতে পারে লালঝামেলা বস্তিতে। লুকসান ক্যারন ইত্যাদি জায়গাগুলি ছোট ছোট জনপদ, চা বাগান। চালসা থেকে শেয়ার গাড়ি মেলে সরাসরি। বন্ধ হয়ে পড়ে আছে ধরণীপুর রেডব্যাঙ্ক বাগান। তারই মাঝ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার রাস্তা ধরে পৌছে যাওয়া যেতে পারে লালঝামেলা বস্তিতে। এখানেও যথারীতি দূরে ভুটান পাহাড়,নীচ দিয়ে বয়ে চলা খরস্রোতা ডায়না নদী। তার পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সহজেই একচক্কর ঘুরে আসা যায় ভুটানে। টিলা ধরে সামান্য উঠলেই দুদেশের নোম্যান্স ল্যান্ডের পিলার। সকাল সন্ধে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর ডেকে চলেছে অজস্র ময়ূর। আলগোছে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই কখন কেটে যাবে একটা দিন মালুমই হয় না। ইচ্ছে হলে থাকুন, রাতে গা ছমছম করবে। চিতাবাঘ বড় অমিল নয় ডুয়ার্সে। উত্তমবাবুর হোমস্টে আছে,এখন যদিও মালিকানা হাতবদল হয়েছে। এইতো আর কদিন বাদেই শীতকাল। চড়ুইভাতির ভিড়ে ভরে থাকবে ডায়না জলঢাকা বা মূর্তি নদীর চর। কোনও একদিন ব্রিজের উপর বাস থেকে নেমে পড়ে নীচে চলে যাওয়া যেতেই পারে সঙ্গে খাবারদাবার নিয়ে। তারপর গোটা দিন ধরে শুধু বয়ে যাওয়া জলের শব্দ। সবসময় নিজের বা ভাড়া গাড়ি নিতেই হবে তার কোনও মানে নেই। বাসে বা স্থানীয় পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ভরসা করে ঘুরে আসা যায় এসব অসামান্য ডুয়ার্স। সেক্ষেত্রে কেবল সবসময় মনে রাখতে হয়, সন্ধের পর শহরে ফেরার গাড়ি পাওয়ার সমস্যা থাকে।

জলপাইগুড়ি থেকে দিনে দিনে অল্প দূরত্বেই ঘুরে আসা যায় পানবাড়ি-রামশাই। একদিকে গরুমারা জঙ্গল, অন্যদিকে দুই রঙে বয়ে চলা মূর্তি-জলঢাকা নদী। অথবা তিনবিঘা হয়ে বাংলাদেশ সীমান্ত দেখে ফিরে এসে জল্পেশ-জটিলেশ্বর। আরও দুরে যদি পথ হারাতে চান, কোনও এক সকালে জলপাইগুড়ি থেকে পৌছে যান শিলিগুড়ির মিত্তাল বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায়। সোজা গাড়ি পেলে ভাল, না হলে যে কোনও কালিম্পং বা গ্যাংটকের গাড়ি করে পৌছে যান রম্বি। হাসিমুখের দাজু আপনাকে পথ বলে দেবে মংপুর। ঘুরে দেখুন মৈত্রেয়ী দেবীর বাড়িতে কবিগুরুর কাটানো দিনগুলো। শিশিরবাবুর বর্ণনা আপনাকে মুগ্ধ করবেই। সেখান থেকে চলে যেতে পারেন সিটিং-এর কমলাবাগানে। কাটাতে পারেন একটা রাত। তবে শীতকালে না গেলে কমলালেবুর মজা মিলবে না। সে গল্প শুনবেন আরেকদিন!

ছবি ও প্রতিবেদন **সত্যম ভট্টাচার্য**

কয়েকটি প্রয়োজনীয় ফোন নম্বর শেয়ার করলাম।

চামুর্চি ইকো রিসর্ট
দেবাশীষ চ্যাটার্জী
৯৪৩২৮৯১৪৪২।

ডায়না রিভারক্যাম্প হোমস্টে
লাল ঝামেলা বস্তি
৯৭৭৫৮০১২৪৫

মংপু-শিশিরবাবু
৬২৯৫০০১৪৬০

ইভটিজিং রুখতে আইন যথেষ্ট নয়!

আসন্ন উৎসবের আতিশয্যে পথেঘাটে যুব সম্প্রদায় কিঞ্চিৎ বেসামাল হবেন বলাই বাহুল্য। পুলিশ এসময় সজাগ থাকলেও কোথাও কোথাও তা মাত্রা ছাড়ায়। অনেক ক্ষেত্রে যার ফল অকারণে ভোগ করেন পথচারি নারী, আমার আপনার ঘরের মেয়েরা! রাস্তার অন্যান্যরা যখন নিছক দর্শক হয়ে তামাশা দেখেন কিংবা কেটে পড়েন তখন আত্মরক্ষার দায় বর্তায় সেই মেয়েদেরই।

১৯৯৮ সালের জুলাই মাসের দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে ভারতের প্রথম সারির সব খবরের কাগজে একটি বেদনাদায়ক খবর প্রকাশিত হয় — চেন্নাইয়ের এথিরাজ কলেজের স্নাতক স্তরের ম্যানেজমেন্ট বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী শ্রীমতী সরিকা শাহ ১৯৯৮ সালের ১৬ জুলাই অটো-রিক্সায় সওয়ার একদল ইভ-টিজার্সদের হাতে আক্রান্ত হন। তিনি কলেজ থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই ইভ-টিজার্সদের উন্মত্ত দলটি তাঁকে অটো-রিক্সায় চেপে তাড়া করে এবং তাঁকে পেছন থেকে ধরবার চেষ্টা করে। এতে সরিকা ভারসাম্য হারিয়ে রাস্তায় পড়ে যান। তাঁর মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। সেই আঘাতের ফলে তাঁর মৃত্যু ঘটে।'

ইভটিজিংয়ের ফলে চেন্নাইয়ের রাস্তায় একটি সম্ভাবনাময় তরতাজা তরুণীর মর্মান্তিক মৃত্যু সেদিন আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল ইভটিজিংয়ের মত অপরাধ ঠিক কতদূর পর্যন্ত বিধ্বংসী হয়ে উঠতে পারে। আমরা যতই না দেখা না বোঝার ভান করে থাকি না কেন, প্রকৃতপক্ষে ইভটিজিং আমাদের সমাজের একটি বারমেসে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইভটিজিং বলতে বোঝায় মৌখিকভাবে বা অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি দ্বারা কিংবা চোখ টিপে, শিস দিয়ে বা অভদ্রভাবে মহিলাদের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করার মাধ্যমে জনবহুল স্থানে মহিলাদের ওপর যৌন আক্রমণ বা যৌন হয়রানি করা। আমরা সাধারণত দেখি মহিলারা, বিশেষভাবে অল্প বয়সী মেয়েরা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মেট্রো স্টেশন, বাস স্ট্যান্ড, সিনেমা হল, রেলওয়ে স্টেশন, বাজার, জন-পরিবহন ও অন্যান্য জনবহুল স্থানে ইভটিজিংয়ের শিকার হচ্ছেন নিত্যদিন। প্রায়শই প্রকাশ্য দিবালোকে লোকচক্ষুর সামনেই যুবতীদের ভীষণভাবে হেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে, যার ফলস্বরূপ অনেক যুবতীরাই বিভিন্ন ধরনের মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছেন, এবং কখনও কখনও সেই যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে তাঁরা আত্মহত্যার পথও বেছে নিচ্ছেন।

ভারতীয় সংবিধানের ২১ নং অনুচ্ছেদে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের মর্যাদা ও সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকারের কথা পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে। ৫১-ক(ঙ) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, নারীদের মর্যাদাহানিকারক কাজকর্ম বর্জন করা প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য। অর্থাৎ যারা আমাদের সমাজে ইভটিজিংয়ের মত ঘৃণ্য অপরাধ করে চলেছেন তারা প্রত্যেকেই মহিলাদের সাংবিধানিক অধিকার হরণ করছেন এবং নিজেদের মৌলিক কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হচ্ছেন।

আমাদের দেশে ইভটিজিং প্রতিরোধের জন্য নির্দিষ্ট কোন আইন প্রণয়ন করা হয়নি। এমনকি ভারতীয় দণ্ডবিধিতেও 'ইভটিজিং' শব্দের উল্লেখ বা ব্যখ্যা পাওয়া যায় না। তবে এই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন মহিলারা

পুলিশের কাছে যে অভিযোগ দায়ের করে থাকেন, সেটা নথিভুক্ত করা হয় ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯৪ নং ধারা এবং ৫০৯ নং ধারার অধীনে।

- ভারতীয় দন্ডবিধির ২৯৪ নং ধারায় বলা হয়েছে, যদি কেউ কোনও প্রকাশ্য স্থানে অশ্লীল কাজ করেন, অশ্লীল গান করেন, অশ্লীল কবিতা আবৃত্তি করেন, অথবা অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করেন, যা অন্যের বিরক্তির কারণ হয়ে উঠতে পারে, সেক্ষেত্রে যে বা যারা এই কাজগুলি করবেন তাদের অনধিক তিন মাসের (বিনাশ্রম বা সশ্রম) কারাদণ্ডে অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।
- ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০৯ ধারায় বলা হয়েছে, যদি কেউ কোনও মহিলার শ্লীলতাহানি বা অসম্মান করবার অভিপ্রায়ে কোনও কথা বলেন, কোনও শব্দ বা অঙ্গভঙ্গি করেন, অথবা কোনও বস্তু প্রদর্শন করেন, আর তার মূল উদ্দেশ্য যদি হয় সেই কথা বা শব্দ সেই মহিলাকে শোনানো কিংবা সেই অঙ্গভঙ্গি বা বস্তু সেই মহিলাকে প্রদর্শন করা, অথবা যদি সেই মহিলার গোপনীয়তায় কেউ অনধিকার প্রবেশ করেন, অপরাধীকে অনধিক তিন বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

রাজধানী দিল্লিতে নির্ভয়া গণ-ধর্ষণ কাণ্ডের পর ভারতে যৌন অপরাধ বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে ওঠে। ফলস্বরূপ ভারতীয় সংসদ ফৌজদারি (সংশোধন) আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করেন, যা ইভটিজিংয়ের বিরুদ্ধে আরও কিছু সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিয়ে আসে। যেমন, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪ক ধারায় মহিলাদের যৌন হয়রানি রুখতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, কোন পুরুষ যদি (১) অপ্রত্যাশিত ও স্পষ্ট যৌন প্রস্তাব দিতে নারী দেহকে স্পর্শ করেন ও ঘনিষ্ঠ হন, অথবা (২) যৌন অনুগ্রহের জন্য দাবি বা অনুরোধ করেন, অথবা (৩) মহিলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অশ্লীল ছবি প্রদর্শন করেন, অথবা (৪) মহিলাকে উদ্দেশ্য করে যৌনগন্ধী মন্তব্য করেন, সেই পুরুষটি যৌন হেনস্থার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবেন। (১), (২) এবং (৩) নং অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীকে অনধিক তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। (৪) নং অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীকে অনধিক এক বছরের (সশ্রম বা বিনাশ্রম) কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

ভারতের বর্তমান আইন পরিকাঠামো যে ইভটিজিং দমন করবার জন্য যথেষ্ট নয় তা সহজেই অনুমেয়। তাই ইভটিজিং রুখতে বিশেষ আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। জাতীয় মহিলা কমিশন No. 9 Eve Teasing (New Legislation) ১৯৮৮ শীর্ষক ইভটিজিং সংক্রান্ত বিশেষ আইন প্রণয়নের প্রস্তাব রেখেছেন। তবে ইভটিজিং রুখতে উপযুক্ত আইন প্রণয়নের আগে, অন্তত কিছু জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন যাতে এটি কিছুটা কমানো যায়। আমরা জানি ইভটিজিং সাধারণত জনবহুল স্থানেই ঘটে, তাই সামান্য চেষ্টা করলেই এই অপরাধকে দমন করা সম্ভব। যেমন, সহযাত্রী বা পথচারীদের ওপরও নৈতিক দায়িত্ব অর্পণ করা উচিৎ। এই ধরনের অপরাধ হতে দেখলে সত্বর নিকটবর্তী পুলিশ স্টেশনে অথবা উম্যান হেল্পলাইনে রিপোর্ট করা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। পরের ঝামেলা মনে করে এড়িয়ে না গিয়ে, সকলের এগিয়ে এসে প্রতিবাদ করা উচিৎ। মনে রাখতে হবে, এ ধরনের অপরাধের প্রভাব সর্বত্রগামী। সেইসাথে, সকল মহিলাদের আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ নেওয়া বাধ্যতামূলক করা জরুরি।

দুঃখের বিষয়, পুরুষেরা কিন্তু নারীর প্রতি এই কদর্য আচরণ করার মানসিকতা সঙ্গে নিয়ে জন্মান না। তারা এই অপরাধ করতে শেখেন পরিবেশ থেকে। দীর্ঘকাল ব্যাপী সমাজে চলতে থাকা এই ধরনের অপরাধ দমন না করার ফল যে কী ভয়াবহ হতে পারে তা আজ আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বর্তমান সময়ে আরও বেশি সংখ্যক ছাত্রীরা বা কর্মরতা মহিলারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মস্থল ইত্যাদি স্থানে যাচ্ছেন। একটি সভ্য এবং সুসংস্কৃত সমাজে তাদের সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অথচ অত্যধিক ভিড়ে ঠাসা বাস, মেট্রো, ট্রেন ইত্যাদিতে নারী ও শিশু কন্যাদের অভিজ্ঞতাগুলি যে কী ভয়াবহ তা কহতব্য নয়। এ যেন বহির্জগতে নিজের যোগ্যতা প্রমাণের লক্ষ্যে প্রতিটি মেয়ের জন্য এক অতি বেদনাদায়ক অগ্নিপরীক্ষা। আসলে এই পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোয় কেবলমাত্র নারী হয়ে জন্মাবার কারণেই নারীদের কিছু বিশেষ প্রকারের অত্যাচার, নিপীড়ন ও বঞ্চনা সহ্য করতে হয়। চলুন, যুগযুগান্ত ধরে নারীদের ওপর চলতে থাকা এই লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতন ও বঞ্চনা নিরসনের উদ্দেশ্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে আইনি সচেতন করে, সকলের মধ্যে মানবিক বোধ জাগ্রত করবার কাজে ব্রতী হই।

রাখি পুরকায়স্থ (আইন বিশেষজ্ঞ)
rakhe.pur@gmail.com

শক্তিরূপেণ সোনম

যেন ফিল্মের পর্দা থেকে উঠে আসা দেবী!

ঘড়ির কাঁটায় তখন মধ্যরাত। বাড়িতে সবাই যে যার মত ঘুমের জগতে। শীতের রাত। সামনেই মাধ্যমিক পরীক্ষা। তাই রাত জেগে পরীক্ষার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত মেয়েটা। হঠাৎই একটা অদ্ভুত শব্দে চমকে ওঠে। মনে হচ্ছে নীচে কে বা কারা গেট ভাঙছে! বরাবরই ভয়ডর একটু কম মেয়েটার। তাই সময় নষ্ট না করে খুব সন্তর্পণে দরজা খুলে ব্যালকনি দিয়ে উঁকি মারে নীচে। যা আশঙ্কা করছিল ঠিক তাই। বাড়ির সামনে জনা চল্লিশেক লোক তাদের বাড়ির নীচের গেটের তালা ভাঙছে। বাড়িতে যে ডাকাত পড়েছে তা বুঝতে আর বাকী থাকে না। ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত বোনকে ডেকে তোলে। বাকিদের খবর দেবার আগেই ডাকাতরা ঘরে ঢুকে যায়। তার কদিন পর সরস্বতী পুজো। সেজন্য ব্যাংকের লকার থেকে গয়না বাড়িতে এনে রাখা হয়েছিল। সে রাতে ডাকাতিতে বাধা দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করে মেয়েটি। একজন ডাকাতকে ঘুসিও মেরেছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় নি। ডাকাতেরা সে রাতে যা পেরেছে সোনাগয়না টাকাপয়সা সব নিয়ে চলে গেল। ওইসময় একটা বন্দুকের ভীষণ অভাব বোধ করেছিল কিশোরী মেয়েটা। বারবার শুধু একটা কথাই মনে আসছিল যদি একটা বন্দুক থাকত! তবে সবাইকে কাবু করে ফেলতে পারতাম।

সেই রাতের ডাকাতিটাই তার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট হয়ে দাঁড়াল। এসব চোর ডাকাতকে শায়েস্তা করতে হলে হাতে একটা বন্দুক লাগবেই। আর একমাত্র পুলিশে চাকরি করতে পারলেই সেটা সম্ভব। তারপর কেমন যেন একটা জেদ চেপে গিয়েছিল মেয়েটার। অবশেষে ইচ্ছাশক্তিরই জয় হল। সেদিনের সেই ছোট্ট মেয়েটাই তার বছর দশেক পর থেকে কোমরে রিভলবার নিয়ে দাপিয়ে বেড়ায়। ঘুম উড়ে যায় অপরাধি সমাজবিরোধিদের। সেদিনের সেই মেয়েটাই আজকের দোর্দণ্ডপ্রতাপ পুলিশ অফিসার সোনম মাহেশ্বরী। গোটা কোচবিহার জেলা তো বটেই, রাজ্যের পুলিশ মহলের কাছে সোনম আজ পরিচিত নাম।

সেদিনের ডাকাতির ঘটনার পর খুব কাছের থেকে পুলিশ দেখার সুযোগ ঘটেছিল কিশোরি সোনমের। পুলিশ সেবার ডাকাতদের ৮-৯ জনকে পরে অ্যারেষ্ট করে, কিছু সোনা উদ্ধারেও তাদের সহযোগিতা করে। সেই ছোট্ট মনে পুলিশের সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার দাগ কেটেছিল। স্বপ্ন দেখার শুরুটা হয় সেদিন থেকেই। মাধ্যমিকের পর কমার্স নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক। সেই পরীক্ষায় ডিস্ট্রিক্ট ফার্স্ট। এরপর কমার্স গ্রাজুয়েশন কোচবিহার কলেজ থেকে। স্কুল কলেজ সর্বত্রই বন্ধুমহলে

শহরে জুয়া সাট্টার ঠেক বন্ধ হওয়ার যোগাড়, ধরা পড়ল কয়েকটি হোটেলে চলা মধুচক্র, রাতে মদ্যপান করে গাড়ি চালানো শিকেয় উঠল শহরের বহু নামী লোকেরও। কলেজ ছাত্রীদের কাছে হয়ে সোনম হয়ে উঠলেন প্রিয় দিদি। আর সদাতৎপর এই তরুণী অফিসারকে দেখে শহরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যে আশংকা করতে শুরু করলেন বাস্তবে তাই ঘটল। সোনম বদলি হয়ে গেলেন।

যেমন জনপ্রিয় ছিল, তেমনি শিক্ষকদেরও প্রিয় পাত্রী। ছোট থেকেই খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ, স্কুল কলেজে লং জাম্প থেকে শুরু করে ক্রিকেট সবেতেই স্বচ্ছন্দ। অন্যায় দেখলেই প্রতিবাদ করার অভ্যেস ছোট থেকেই। আর বন্ধুদের হয়ে অন্য কারুর সঙ্গে মারপিট করা তো ছিল রুটিন ব্যাপার।

মাস্টার্স করার পর বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষা দিতে শুরু করেন সোনম। রেলে একটা চাকরি হয়েও যায়। কিন্তু সেই চাকরিতে জয়েন করেন নি। হঠাৎই সুযোগ এল পুলিশের চাকরির। সেদিন আর ইতস্তত করার প্রশ্নই ছিল না। বাড়ির লোকের পুরোপুরি সমর্থন ছিল তাঁর প্রতিটি কাজে। বিশেষ করে ঠাকুমা-র সমর্থন সবসময়ই পেয়েছেন। তাই মাড়োয়ারি রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও এই পদক্ষেপ নিতে কোনও অসুবিধে হয়নি সোনমের। ২০১৪তে পুলিশের চাকরিতে যোগদান, ১৩ মাসের ট্রেনিং ব্যারাকপুরে। ট্রেনিং চলাকালীন যেদিন প্রথম পিস্তল চালানো শেখানো হল, সেটা ছিল সোনমের জীবনের সবচেয়ে আনন্দ আর উত্তেজনার দিন, কিশোরী বেলার ইচ্ছেপূরণের দিন।

ট্রেনিং শেষ করে প্রথম পোস্টিং নিজের জেলায়। প্রভিশনাল হিসেবে মাথাভাঙ্গা থানায় কাজ শুরু। প্রথমেই তার নজরে এল ইভটিজিং। ব্যস রোড রোমিওদের দৌরাত্ম্য বন্ধ হয়ে গেল মাথাভাঙ্গায়। কাগজে সে খবর ছাপা হতেই সকলের নজরে এল সোনম। সে সময়েরই একটা ঘটনা। রাত প্রায় আড়াইটা, দুজন কনস্টেবল নিয়ে সিতাই মোড়ে পেট্রলিং-এ ছিলেন সোনম। একটা মারুতি গাড়ি দেখে সন্দেহ হল। থামতে বললেও গাড়িটি দাঁড়াল না। এরপর ফিল্মি কায়দায় নিজেদের টাটা সুমো নিয়ে গাড়িটিকে তাড়া করে ধরে ফেললেন সোনম। গাড়িটির সিটের নীচ থেকে উদ্ধার হল প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র। জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, ওরা ডাকাতির কোনও উদ্দেশ্যেই যাচ্ছিল।

সোনম মাহেশ্বরীর নাম জানতে শুরু করেছে কোচবিহারের মানুষ। এরপর কোচবিহার কোতোয়ালি থানা। যোগদানের মাত্র আট দিনের মাথায় বানেশ্বরের একটি ধর্ষণ মামলায় চার্জশিট দিলেন। কাজের প্রতি তাঁর উৎসাহ আগ্রহ দেখে এবার তাঁকে দেওয়া হল কোচবিহারের টাউন সাব ইন্সপেক্টরের দায়িত্ব। পোষাকি নাম টাউন বাবু। রাজনগরের ইতিহাসে এই প্রথম কোনও মহিলা টাউনবাবু।

কিন্তু মাত্র পাঁচ মাস টিকে থাকতে পেরেছিলেন সোনম। এই পাঁচটা মাস কলেজের রাজনৈতিক গণ্ডগোলই হোক বা অন্য কোথাও কোনও অপরাধ, খবর পাওয়া মাত্র সোনম সেখানে হাজির। শহরে জুয়া সাট্টার ঠেক বন্ধ হওয়ার যোগাড়, ধরা পড়ল কয়েকটি হোটেলে চলা মধুচক্র, রাতে মদ্যপান করে গাড়ি চালানো শিকেয় উঠল শহরের বহু নামী লোকেরও। কলেজ ছাত্রীদের কাছে হয়ে সোনম হয়ে উঠলেন প্রিয় দিদি। আর সদাতৎপর এই তরুণী অফিসারকে দেখে শহরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যে আশংকা করতে শুরু করলেন বাস্তবে তাই ঘটল। সোনম বদলি হয়ে গেলেন, দিনহাটা মহিলা থানার ওসি হিসেবে।

মহিলা থানার দায়িত্ব পেয়ে কিন্তু থেমে থাকেন নি সোনম। অপরাধের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান চলতে থাকে। অবৈধ গাঁজা চাষ রুখতে কড়া পদক্ষেপ নিতে শুরু করলেন, মহিলা থানার পুলিশদের নিয়ে গাঁজা খেত পুড়িয়ে নষ্ট করে দিলেন, স্মাগলিংয়ের বাজারে যার দাম বেশ কয়েক লক্ষ টাকা। তাঁর এই অভিযান ঘিরে ব্যাপক আলোড়ন ছড়াল। সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ নিয়েও প্রচুর কাজ করছেন সোনম। দিনহাটার সাধারণ মানুষ খুশি।

মহিলা থানাটিকে বেশ সুন্দর করে গুছিয়ে নিয়েছেন সোনম। অনেক সময় অপরাধী মহিলাদের সাথে তাদের শিশুসন্তানরাও থানায় আসে। সেই বাচ্চাগুলোর যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, তার জন্য একটা আলাদা ঘরের ব্যবস্থা আছে। যার দেওয়াল জুড়ে টম এন্ড জেরি, ছোটা ভীম হাজির তাদের মনোরঞ্জনের জন্য। কাজ পাগল এই তরুণী পুলিশ অফিসার দারুণভাবে সামলাচ্ছেন দিনহাটা মহিলা থানা। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এখানে মহিলাদের নানা ধরনের অভাব অভিযোগ জমা পড়তে থাকে। তার মধ্যে বেশিরভাগই হল শ্লীলতাহানি। কিন্তু সোনমের মতে, ২০০টা অভিযোগের মধ্যে তদন্ত করে দেখা যায় মাত্র ৫টা আসল, বাকি সব ভুয়ো। ঘরের বা পাশের বাড়ির কারোর সাথে কোনও ঝামেলা হল, সাথে সাথে তাদের নামে ধর্ষণের অভিযোগ করতে থানায় চলে আসে। পরে তদন্তে দেখা যায়, আদপে তেমন কোনও ঘটনাই ঘটেনি। "এতে তো মেয়েরাই ছোট হয়ে যায়, তাই না? অন্যের চোখে তো বটেই, নিজের চোখেও"—এই ব্যাপারটা তাঁকে বড্ড পীড়া দেয় —"মেয়েরাই নিজেদের সম্মান রাখতে পারে না"। শহরের চেয়ে গ্রামের দিকে এই ধরনের ঘটনা আকছার ঘটছে বলে জানায় সোনম। তবে মেয়েপাচার অনেকটা কমেছে বলেই অভিমত তাঁর।

ব্যক্তি জীবনে ঠিক কেমন সোনম? মিষ্টি ছটফটে এই মেয়েটা বেড়ে উঠেছে যৌথ পরিবারে, কোচবিহারের টাপুরহাটে নিজের বাড়িতে। এক সাথে বারোজন ভাইবোনের সঙ্গে ভীষণ আনন্দে কেটেছে তার মেয়েবেলা। তবে একটা আঘাত, যা তার জীবনকে নাড়িয়ে দিয়ে গেছে —তোর্ষা নদীতে তাদের চোখের সামনে সবচেয়ে প্রিয় ভাইয়ের তলিয়ে যাওয়া। দেহ পাওয়া যায় নি। ডুবুরি নেমেছিল, তারাও ফিরে এসেছে খালি হাতে। আজও সোনম তার ভাই, তার প্রিয় বন্ধুর ফিরে আসার অপেক্ষা করে।পুলিশি উর্দির কাঠিন্য ভেদ করে দেখা মেলে এক কোমল মনের।

পড়াশুনায় বরাবরই ভাল, ক্যারাটেতে ব্ল্যাকবেল্ট, পাশাপাশি চলত ক্লাসিকাল ও রবীন্দ্রসংগীতচর্চা। কোচবিহার শহরের উপকণ্ঠে টাপুরহাটে বাঙালি পরিবেশে বেড়ে ওঠার কারণে বাংলায় সাবলীল লেখা ও পড়া। বই পড়তে ভালোবাসেন সোনম। বিশেষ করে আটোবায়োগ্রাফি। তবে পুলিশের চাকরিতে খুব একটা সময় পাওয়া যায় না এসব শখ পূরণের। কিন্তু একটা 'বদভ্যেস' এখনও ছাড়তে পারে নি এই পুলিশ অফিসার,

তা হ'ল চকলেটপ্রীতি। রান্নাঘরে যাওয়া হয়ে ওঠে নি, চা ছাড়া আর তেমন কিছু করতে পারেন না। তবে তা নিয়ে আদপেই ভাবতে রাজি নন, ও কী আর এমন কঠিন! ঠিক শিখে যাব। যদিও প্রেম-বিয়ের কথা উঠতে বোধহয় কিঞ্চিৎ ব্লাশ করে তরুণী অফিসারের গাল—পুলিশের ওসব ভাববার সময় কই?

ব্যাক বাইটিং একদম না-পসন্দ সোনমের। সোনম চান মেয়েদের সার্বিক উন্নতি। স্বাবলম্বী হতে হবে, মানসিক ভাবে দৃঢ় হতে হবে, আত্মসম্মান নিয়ে প্রতিটি মেয়েকে বাঁচতে হবে। পুলিশে আরও বেশি করে আসুক মেয়েরা, সোনম বলেন, মনের জোর থাকলেই হবে, বাকি তো তৈরি করে দেয় পুলিশের ট্রেনিং! সোনমের সঙ্গে কাজ করে অখুশি নয় তাঁর কোনও সহকর্মীই। মাথাভাঙ্গা কোচবিহার দিনহাটা সর্বত্রই অধস্তনদের বক্তব্য, ম্যাডামের সঙ্গে কাজ করে আলাদা আনন্দ পাওয়া যায়। কোচবিহারের পুলিশ সুপার ভোলানাথ পান্ডের কথায়, সোনম একজন ভাল অফিসার। আমরা চাই এই পেশায় আরও মেয়েরা যেন এগিয়ে আসে। সোনম এক্ষেত্রে মেয়েদের কাছে প্রেরণা হতে পারে। কোচবিহার কোতোয়ালি থানার আইসি সমীর পাল বলেন, সাব ইন্সপেক্টরের যে সব কোয়ালিটি থাকা দরকার, পুলিশ ট্রেনিং কলেজে যেগুলি শেখানো হয়, যেমন তাকে নম্র হতে হবে, বিনয়ী হতে হবে, ভদ্র হতে হবে, আবার একই সাথে রাফ এন্ড টাফ হতে হবে, দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকতে হবে— সোনমের মধ্যে এর সব কটি গুণই রয়েছে। আশপাশের চার পাঁচটা জেলার মধ্যে ওর মত একজনও লেডি অফিসার নেই। অনেকেই ভাল, কিন্তু সোনম ইজ দ্য বেস্ট।

গান পাগল সোনমের হিন্দি সিনেমায় প্রিয় হিরো সিংহম অজয় দেবগন। আর হিরোইন? সে তো নিজেই রিয়েল লাইফ হিরোইন, যেন ফিল্মের পর্দা থেকে উঠে আসা! এ মন্তব্য সাধারণ মানুষেরই। সত্যিই ভগবানে অসম্ভব ভরসা সোনমের, তাই ভয় শব্দটা তাঁর অভিধানে নেই। সবে চার বছর হয়েছে চাকুরির, যখন তখন বদলি নিয়েও মাথা ঘামাতে নারাজ। তেজি এই সিংহ বালিকাই পারে বাড়ির মা-মেয়ে-বউ-বোনদের সম্মান রক্ষা করতে— সোনম দৃপ্ত হেঁটে গেলে সেই বিশ্বাস নিয়েই বোধহয় সম্ভ্রমে মাথা নীচু করে কোচবিহারের নাগরিক। নেতা ও পুলিশের মানুষ থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার এই যুগে তাঁকে নিঃশব্দে অকুণ্ঠ আশির্বাদ করে কোচবিহারের পুরনো দিনের মানুষ —ও তো আমাদের ঘরের মেয়ে!

আর জীবনে নানান ঘা খেয়ে বড় হওয়া সচেতন নারীকুল মনে মনে সম্ভবত শঙ্কিত হয় —পারবে তো মেয়েটা বিশাল এই পুরুষতন্ত্রে লড়াই করে টিকে থাকতে? পারবে তো সোনম?

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

Hotel Yubraj & Restaurant Monarch (Air Conditioned)

Room	Single	Double
Super Deluxe (Non AC	Rs. 650	900
Deluxe AC	Rs. 990	1200
Super Deluxe AC	Rs. 1100	1300
VIP Deluxe AC	Rs. 2000	2000
Suite	Rs. 3000	3000
VIP Suite	Rs. 3500	3500
Extra Occupancy (N-AC)	Rs. 100	--
Extra Occupancy (SC)	Rs. 200	--

N.B. *Tax as per applicable*

Charu Arcade, B. S. Road, Cooch Behar
Tel. No. +91 9735526252, (03582) 227885/231710
Email: hotelyubrajcoochbehar@gmail.com
www.hotelyubrajcoochbehar.com

ধারাবাহিক কাহিনি। ৪

মহারাণী কথা

মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস

কতগুলো চরিত্র, ঘটনা সময়ের মিছিলে ঢুকে যায় সোহাগিনী তার শ্বশুরবাড়ি। অসবর্ণ বিয়ের উদাহরণ হয়ে পঞ্চাশের শেষ দশকে। ওদের উঠোনে শাশুড়িমায়ের ভালোবাসা উপরি পাওনা। রাজীব সোহাগিনীর সংসারে বড় হচ্ছে মহারাণী। পোষাকি নাম সম্রাজ্ঞী। রাজনগরের স্বপ্ন তৈরির রূপকার সুনীতি দেবীর ছায়া কি ওর চোখে! অজস্র টুপটুপ জটিলতা আর স্নেহ ভরা অন্যরকমে বাড়ছে মহারাণী। চোখে বাঁশের জালিকার স্বপ্ন তার স্কুল, প্রিয় কলেজ, কলেজের অরুণ নামের ছেলেটা। অরুণের সংগ্রামী জীবনে কখনও জায়গা করে নিতে পারবে সেই মেয়ে? নাকি নৃপেন্দ্র সুনীতির ইতিহাস বিবাহ কিংবা ভালবাসা বিবর্তন ঘটাবে? ক্রমপরিণতি আর টুকরো ইতিহাসে সময় বদলের কথা মহারাণীকেও কি বদলে দিচ্ছে?

ইংরেজ আর ব্রিটিশের পদলেহনকারী রাজবাড়ির ইতিবৃত্ত? মনের ভিতর কেবল জিজ্ঞাসা, কেবলই টানাপোড়েনের কাহিনি। চলতি পাঠক্রমে ঠিক মন লাগে না অরুণের। প্রাণের কথা প্রাণের ভাষায় লিখতে চায়, ওকে বলতে হয় কত কথা, সে কখনও সাগরদিঘির কাছে শহীদ বেদীর সামনে গড়ে তোলা মঞ্চে অথবা খাগড়াবাড়ির কাছাকাছি নাট্যসংঘের মঞ্চে সেই সদ্য যুবক কিংবা কৈশোরের গণ্ডী পেরোনো ছেলেটার কথা বাষ্পবেগে আকুল হয়ে ওঠে। নবীন ভট্টাচার্যের বক্তব্য শুনে প্রাণের আবেগ বুকের রক্ত টগবগ করে। মা টের পান। উনি তো সবসময়ের সঙ্গী। চাকরি করেন স্কুলে পড়ান, তাতে কী! অরুণের গতিবিধি লেখাপড়ার সন্ধান কি তিনি পান না। নিশ্চয়ই পান। স্কুলে যাওয়ার সময় অরুণও রেডি, স্নান সেরে মা'র সঙ্গে খেয়ে নেওয়া ওর স্বভাব। খুব কাছের বন্ধুরা ছাড়া মা-ছেলের ক্ষুদ্র গৃহকোণটুকুর খবর কে বা জানে। মা'র সঙ্গে খেতে বসেই যত মত বিনিময়। কী অদ্ভুত বিচরণ। কী পরিচিত ভঙ্গীতে মানুষ গড়ে তোলা। অরুণের গ্রুপ থিয়েটারে যোগ দেওয়া, রিহার্সাল, খুব উৎসাহে মত দিয়েছিলেন অনুভা মুখার্জি।

কিন্তু এই যে বিভিন্ন সভাসমিতির বক্তা হিসেবে প্রশংসার ছটা, এতে মুখ গম্ভীর হত অনুভার। ওই খেতে বসেই বুঝিয়ে বলতেন, বাবু, শিল্পই কিন্তু মানুষকে টেনে আনে কাছে। তার জন্য মিটিং মিছিলের কী দরকার! জানো না, পড়াশোনাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। আমি তো বেশিদিন বা চিরদিন চাকরি করব না! তোমার বাবার সেই আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাওয়ার ইতিহাস তোমাকে কতবার বলেছি অরু। আমি ভালবাসি মুক্ত মনের এক মানুষকে। কখনও হিংসা, ঈর্ষাকে নয়। অরুণ বোঝে মা রেগে গেছেন। ওকে 'তুমি' সম্বোধন করা মানেই ভিতরে ভিতরে অস্থিরতা। তবু কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে ড্রপ দিয়ে দিল নবীনদা পরাগদার আলোচনা আর তাদের উজ্জীবিত কথাবার্তায়। শুধু এই একটিই কারণ সে বলবে কী করে। পরীক্ষা আজ বাদে কাল। সে সকাল থেকে রাত ছাত্র রাজনীতি, লোকাল কমিটি সামলে বেরাল, কত সুকান্ত, কত মার্ক্স, কত ব্রেখট কত চে গে ভারা আওড়াল নিজেই জানে না। কোনও প্রস্তুতি ছাড়াই বলে যেতে পারে সে অসংখ্য লাইন। ক্রমেই কি জড়িয়ে যাচ্ছে! এক ঝাঁক মুগ্ধ আনকোরা চোখের সামনে হিরোর মত দাঁড়িয়ে কথাগুলো বলে যেতে কেমন রোমাঞ্চ জাগে, মা'র বোঝানো কথাগুলো কেমন বাতাসে ভেসে আসা মনে হয়। ছাত্র রাজনীতির সফল নেতার তো পড়াশোনার প্রথম দিকে থাকায় মন দিলে চলবে না, নিজের নোটস, নিজের সুন্দর কথাবার্তা বিতরণ করে দাও জনগণের মধ্যে, তুমি কী, তুমি কে ভুলে যাও। পাঁচজনকে নিয়ে বাঁচতে শেখ। ...মা'র সাবধানবাণীগুলো তীরের ফলার মত কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। '... অভিজ্ঞতা থেকে বলছি বাবু, হয় না, কিচ্ছু বদলানো যায় না। তোর বাবাও ফিরে আসেনি আর। নিজেকেই নিজে দাঁড় করাতে হবে, নক্ষত্রের মত একক, ধ্রুবতারার মত।...'

খুব ক্লিশে মনে হয় অরুণের এসব কথা। ক'দিন থেকেই। কিন্তু মা'র মত বন্ধু আর কে আছে! কলেজে এখন সেকেন্ড ইয়ার। যতক্ষণ কলেজের সবুজ মাঠ আর লাল বিল্ডিং রাজকীয়তা নিয়ে ওদের ঘিরে থাকে, নিজেকে রাজা মনে হয়।

ক'দিন থেকেই বিশেষ উৎপাত করছে দুটো চোখ আর লম্বা একখানা বেণী। কখনও বা একরাশ খোলা চুল, অথবা এক টুকরো আঁচলের হাওয়া, প্রতিযোগিতার রবীন্দ্র গান অথবা কবিতা। ...টুকরো বাতাসের মত ওকে ঘিরে ঘিরে ছুঁয়ে যায়। এমন বিকলন তো ওর বন্ধুদের হয়েছে এতকাল, সে প্রেমপত্রের টুকরো কাগজের ছড়াছড়ি কথা। ...এ ব্যাপারে ও তো চ্যাম্পিয়ন! অরুণের ধারপাশ দিয়ে কেউ গেছে কি না ও আমলই দেয়নি কখনও।

বিশেষ কারও মুগ্ধতা। এ আবার কমরেডদের ছোঁয় নাকি, সে তো নিষিদ্ধ জীবনের মত। ওর নিজস্ব মতবাদী গ্রুপ থিয়েটারেও ওই এক নিয়ম; আমরা এমন কিছু আচরণ পারস্পরিক সতীর্থদের সঙ্গে করব না যাতে গ্রুপ থিয়েটার ভেঙে যায়, অন্যান্যরা কাদা ছেটাতে পারে। সে ব্যাপারে উদ্যোগী আর সচেতন করার হোতা অরুণ, অরুণ মুখার্জি। তাহলে! বুকের ভেতর একবার নড়াচড়া সে অদ্ভুত রকম। কলেজে ওই নীলচে, কটা চোখের মেয়েটা ভর্তি হওয়ার মাসখানেক পর থেকে... কী যেন নাম বলল... সম্রাজ্ঞী। বাব্বা! রাজনগরের উপযুক্ত নামই বটে। মনে মনে সামলে নিয়েছে অরুণ অনেকটাই। ছাত্রনেতাই তো শুধু নয়, এখন জেলান্তর পেরিয়ে রাজ্যেও বিশেষ গোপন বৈঠকে তার নাম মহানগরীর সভাসমিতিতে পৌঁছে গেছে স্থানীয় নেতা-কর্মী মারফৎ। এই তো, মাস খানেক হল কলকাতায় শহীদ নাট্য সংস্থার ডাকে ওদের গ্রুপ থিয়েটার 'দামামা' নাটক করে এল। সেই তো যোগ প্রাণের যোগ। মা'র সেই শিল্প মানুষের টানের কথা।

বেশ ছিল অরুণ। কী যে হল! প্রবীরের তাড়নায় আর মল্লিকা, রুমেলা ওরাও পিছনে লেগেছিল। স্পোর্টস প্রায় শেষের দিকে। হুজুগ ওদের সকলের... চল চল সবাইকে আজ তাপসের দোকানে চা খেতে খেতে যেতে হবে। প্রবীর খাওয়াচ্ছে। ট্যাঁকের পয়সা তো খসবে না! চল— দেখি। অরুণকেও পকেটস্থ করতে পারে এরা। একবার শুধু আড়চোখে দেখে নেয়— হুঁ। সেই পরিচিত গন্ধ আর লম্বা বিনুনিও সঙ্গে চলেছে। একটু যেন গম্ভীর! কেন রে বাবা! কিছুতে পুরস্কার না পেলি— 'গো অ্যাজ ইউ লাইক'-এ তো বাধা পুরস্কার এ মেয়ের। মুহূর্তে বানিয়ে তোলে সংলাপ। কোনও বার উদ্বাস্তু মহিলা, এবার সেজেছিল পরচুলো পড়ে বৈষ্ণবী ঠাকুরণ, ভারী মানিয়েছিল; কে বলবে বয়স কত, ধরাই যায়নি। এক্কেবারে ফার্স্ট।

সেই থেকে আগ্রহ বেড়েছে। নাট্যকর্মী বলে কথা, গ্রুপ থিয়েটার ধাপে ধাপে উচ্চমানে চলে যায় কুশীলব যদি দক্ষ হয়। অনেকবার ভেবেছে প্রস্তাব দেবে ওদের 'দামামা'য় যোগ দিতে, দ্বিধায় পড়েছে। যদি না বলে মুখের উপর, সে অপমান অরুণের অসহ্য হবে। এসব সাত পাঁচ ভাবছিল, আর আস্তে আস্তে সূর্যের পশ্চিমে ঢলে পড়া লাল রং ছড়িয়ে পড়ছিল আকাশে, আকাশ থেকে ক্রমশ নামছিল সে রং আর কলেজের লাল ইটের রং একাকার হয়ে। ক্রমশ বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছিল। নিস্তব্ধ সবুজ মাঠ, ক্লাস ঘর, কলেজের শূন্য সিঁড়িগুলো, ইউনিয়ন রুম, আর খাঁ খাঁ টানা বারান্দা...

মাঝ দুপুরে সম্রাজ্ঞীই বাড়িয়ে দিয়েছিল টিফিন প্যাকেট। —'নিন, অরুণদা, টিফিন বিতরণের ভার আমার'। সকলকে খাকি রঙের প্যাকেট ধরিয়ে দিচ্ছিল

সে। একটু একটু ভিজে উঠেছে ততক্ষণে প্যাকেটগুলো। নির্ঘাৎ ভিতরে লাড্ডু আর নিমকি... তারই তেল চুঁইয়ে নামছে খাকি প্যাকেটের শক্ত কাগজ ভেদ করে। সকলে চটপট টিফিন শেষ করেছিল। অরুণ ওই কচি কলকে রঙা মুখের দিকে কেন যেন বার কয়েক তাকিয়ে নিল ওর স্বভাবের বাইরে গিয়েই। বোঝা গেল নিজেকে শাসন করে নিচ্ছে ও। সম্রাজ্ঞীর এত রাখঢাক, বাধো বাধো দ্বিধায় কম্পমান বক্ষ টক্ষ নয় কোনওদিনই। যৌথ বাড়ির লকলকে পুঁই ডগা কিংবা কুমড়ো লতার ফুলের মত বেড়ে ওঠা মেয়ে অত সহজে নিজের ভিতর প্রাচীর টেনে পাথর হতে পারে না। শেখেইনি কোনও দিন। বড় সহজ। কিন্তু কেন যেন অকাতর বন্ধুত্বের জায়গায় এক দীর্ঘ ফাঁক রেখে দেয় সম্রাজ্ঞী, ওর ক্লাসের সমীরণ-রাও একই কথা বলেছিল, ...ওই যতই সহজ সরল দেখে মনে হোক না কেন, ভিতরে ঋজু দারুণ। ওই ভোট সংক্রান্ত ব্যাপারে কোনও কথা ওঠায় বলেছিল, আসলে সম্রাজ্ঞীকে নির্বাচনে সি. আর. দাঁড় করানোতে সকলেই বেশ উঠে পড়ে লেগেছিল; কিছুতেই রাজি করানো যায় নি। বাড়ির বাধা নিশ্চয়ই আছে। অরুণের ওসব নিয়ে তোষামোদ করতে ভাল লাগেনি। মনে হয়েছে ওর ইচ্ছে হলে নিজেই আসবে। বলতে হবে কেন! তবে একথাও সকলে আলোচনা করেছে ও রাজি হলে এটা অবধারিত জেতা সিট। কিন্তু কারোরই সম্রাজ্ঞীকে ঘেঁটে তুলতে সাহস হয়নি।

***

একটু পরেই হই হই তাপসের চায়ের দোকানে। দোকানের আশপাশ ঘেরা পানায় ভরা দিঘি। প্রায় বুঁজে যাওয়া। সাধারণ মানুষ সাধ করে এ দোকানে চা খেতে ঢুকবে না। ওই দোকানেই বেছে বেছে কলেজের কিছু কিছু দলের জমজমাট আড্ডা। কখনও সদ্য বন্ধু দলচ্যুত ফেঁসে যাওয়া দু'জন তরুণ তরুণী প্রেম করে ছেঁড়া ছেঁড়া পর্দার ওপাশে, তাতে আবার তাপসের পূর্ণ সমর্থন। ওরা এক কাপ চা নিল না দু' কাপ সে ওসব দেখে না, গল্পের পুরো সুযোগ দেয়। এ দোকানের কী যে টান!

সম্রাজ্ঞী আজকাল নাকি স্বপ্নে দেখছে এ অন্ধগহ্বরের মত দোকানটিকে। দোকানের কেবিন কিংবা ছেঁড়া পর্দার ওপারে নিজেই বসে আছে। কার পাশে! সে মুখ অস্পষ্ট। সকলে চেপে ধরে বলিয়ে নিতে না পারলেও আন্দাজে কিছু ওরা নিজেরা নিজেদের মত বুঝে নেয় আর তা নিয়ে আড়ালে তোলপাড়ও করে। অরুণ কখনও অস্বস্তিতে পড়ে তো বটেই। সম্রাজ্ঞীর সামনেই ওকে জড়িয়ে কিছু বলে ফেলা প্রবীরের পক্ষে এত সহজ যে সহজ স্বচ্ছন্দে চলা সম্রাজ্ঞীও অস্বস্তিতে পড়ে বৈকি! আজও এই চায়ের দোকানে সকলে মিলে আসার পিছনে ওদের কী মতলব কে জানে! যা ভেবেছে ঠিক তাই। ছোট্ট খুপরি ঘরগুলো। নামেই কেবিন। ছোট বেঞ্চ টেবিল... সেরকম এক ঘরে ঠেলে অরুণকে ঢুকিয়ে দিয়ে আর কেউ এল না। সেখানে সম্রাজ্ঞীকে কখন বসিয়ে রেখেছে রুমেলারা প্রি-প্ল্যানড সব। ওরা সব বাইরে... চায়ের অর্ডার চপের অর্ডার যেন কত ব্যস্ত। অরুণ তড়িঘড়ি বাইরে চলে আসতে গিয়েই দেখে দরজায় প্রবীর। —আরে! ছুপা রুস্তম, যা কথা বলার বলে নাও তো বাপু। দু'জনকেই আমরা জানি, বুঝে গেছি, এত লুকিয়ো না তো। যাও পরিষ্কার করে কথা বলে হালকা হয়ে নাও।

ওদিকে মেঘ আসছে। অন্ধকার ঘন হওয়ার আগেই মেয়েদের ছেড়ে দিতে হবে যার যার বাড়ি। কী মুশকিল! সম্রাজ্ঞী তো চুপ করে বসে। ও কী কিছু শুনতে চায় অরুণের কাছে। ধীরে উল্টো দিকের বেঞ্চে বসে অরুণ। খুব হালকা ভঙ্গীতে পরিবেশকে স্বাভাবিক করে। সম্রাজ্ঞীও হালকা হওয়ার খুব চেষ্টা করছে বোঝা যায়। ...আচ্ছা, কী ব্যাপার বলতো— তোমাকে একা বসিয়ে আমাকে এখানে... ওরা কী করতে চায়। সম্রাজ্ঞী শুধু বলে 'জানি না'।

একটু ঝেড়ে কেশে অরুণের স্বভাবসিদ্ধ সাবলীলতায় সরাসরি সম্রাজ্ঞীকে জিজ্ঞেস— 'আচ্ছা, তুমি কেমন ছেলে পছন্দ কর? এই আমার মত পথেঘাটে ভাষণ দিয়ে বেড়ানো, বড় জোর কপালে জুটবে মাস্টারি ...এরকম, না কি বিরাট সম্পত্তি অলা বিরাট চাকুরে কেউ... '। উত্তর নেই। অরুণ নিজেই বলে, —না না ওই মিত্রদের বনেদী বাড়ির কন্যে নিশ্চয়ই ওই রকম ছাপোষা যার বিরাট কোনও স্বপ্ন অন্তত এখন নিজের জন্য নেই, তাকে পছন্দ করবে না!

সম্রাজ্ঞী আজকাল নাকি স্বপ্নে দেখছে এ অন্ধগহ্বরের মত দোকানটিকে। দোকানের কেবিন কিংবা ছেঁড়া পর্দার ওপারে নিজেই বসে আছে। কার পাশে! সে মুখ অস্পষ্ট। সকলে চেপে ধরে বলিয়ে নিতে না পারলেও আন্দাজে কিছু ওরা নিজেরা নিজেদের মত বুঝে নেয় আর তা নিয়ে আড়ালে তোলপাড়ও করে। অরুণ কখনও অস্বস্তিতে পড়ে তো বটেই। সম্রাজ্ঞীর সামনেই ওকে জড়িয়ে কিছু বলে ফেলা প্রবীরের পক্ষে এত সহজ যে সহজ স্বচ্ছন্দে চলা সম্রাজ্ঞীও অস্বস্তিতে পড়ে বৈকি!

সম্রাজ্ঞী এবার মুখ খোলে— হুঁ। ঠিকই বলেছেন। আমার পরিবার, জানেনই তো তাদের মহারাণীকে কোনও বিপুল সম্পদশালী মহারাজার ঘরেই দিতে চায়, তবে সে মহারাণীর 'ইচ্ছে'টাও তো নিছক ফেলনা নয়।...

অরুণের ইচ্ছে করছিল জিজ্ঞেস করে যে, মহারাণীর 'ইচ্ছে'টা কী! —সেটা আর বলা হয়ে ওঠে না। হই হই করে ওরা সব চপ আর চায়ের কাপে মাতোয়ারা হতে হতে ঢুকে পড়ে, বসে যায় ওদের পাশেই। যেন কোনও উৎসবে জিতে গেছে ওরা। ওদের পরখ করে নিতে চায়। ধরেই নেয় অরুণ নিশ্চয়ই কোনও পজিটিভ সাইন দিয়েছে... সম্রাজ্ঞী অ্যাকসেপ্ট করেছে।

কিন্তু ততক্ষণে সম্রাজ্ঞী তোলপাড়। রুমেলার হাত থেকে চপ ভেঙে মুখে তুলেই দৌড়ে বাইরে আসে। —এ মা! একেবারে অন্ধকার। ধান কপালে ধান দুবো। কত যে গল্প বানাতে হবে!

চললুম রে।

ওরা ডাকতে থাকে। আটকায়। আর পিছনে তাকায় না সম্রাজ্ঞী।

৯

আমাদের চেনা শতকের সে সম্রাজ্ঞী, যৌথ বাড়ির মহারাণীর বিনিদ্র রাতে আজ আকাশে মেঘের খেলায় ১৮৬৪ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর। হাতে ব্রাউন রঙের মলাটে ইংরেজি বই।

****

সুনীতি আঁতুড় ঘরে তখন। উঠেছিল প্রবল ঝড়। এই ঝড়ই কি ভবিষ্যৎ রাজ-অন্দর এমনকি বহির্জগতেও আলোড়ন তুলেছিল! সম্রাজ্ঞীর মনের ঝড়, ওর বেড়ে ওঠা সব কিছুর সঙ্গেই কি সুনীতির শৈশব-কৈশোর... যৌবনকালীন ঝড় অন্তর্লীন সৃষ্টি সম্ভাবনা, পরিশ্রম, কাজ আর কাজ! তারপর পরিণত জীবনের একাকীত্ব সবই কি ঘনিয়ে আসছে মিত্র বাড়ির যৌথ সংসারের একাকিনী দর্শক কন্যা মহারাণীর! পর্বে পর্বে ঘটে যাচ্ছে ওর জীবনের পালা বদল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন আর জগন্মোহিনী দেবীর বড় কন্যা। বাবা-মায়ের স্নেহের বেশিরভাগই পেয়েছিলেন সুনীতি। না, মহারাণীর মত শিবরাত্রির একমাত্র সলতে তিনি ছিলেন না। দশ ভাইবোনের মধ্যে তৃতীয় সন্তান হলেও বড় কন্যা হিসেবে প্রথম থেকেই আলাদা নজর সকলেরই ছিল সুনীতির প্রতি। সুনীতিরও প্রাণের বন্ধু ছিলেন তাঁর ঠাকুমা সারদা সুন্দরী দেবী। পৌত্রী সম্পর্কে অত্যন্ত আদরে তাঁর আত্মকথায় তিনি জানিয়েছিলেন, সুনীতি ছেলেবেলা থেকে বেশ ভাল মানে লক্ষ্মী মেয়ে ছিলেন। পড়াশোনা করতে ভাল বাসতেন। কারও সঙ্গে ঝগড়া তো দূর, ভাব, বন্ধুত্ব রেখেই চলতেন। আর ছোট থেকেই তাঁর মধ্যে দয়ার ভাব অত্যন্ত বেশি। গরীব দেখলেই দান করতেন। ধর্মকর্মেও মন ছিল। তাঁর বাবা কেশবচন্দ্র যখন রান্না করতে করতেও পড়তেন সুনীতি কাছে বসে সে পড়া শুনতেন। কেশবের খাওয়া হয়ে গেল সুনীতি তার প্রসাদ খেতেন। এসব কথাগুলো এ দশকের একার বিছানায় মাত্র উনিশ বছরের এক তরুণীর দু' চোখ ঝাপসা করে দিচ্ছিল, মনে পড়ছিল ছোটবেলার কথা, তখনকার রাজীব মিত্রকে। মনে হচ্ছিল এখনই উঠে গিয়ে সমস্ত যন্ত্রণার ভার যদি বাবাকে সে জানাতে পারত তাহলে নিশ্চিন্ত হতে পারত সে মেয়ে। এ গল্পগুলো তো বাবার কাছেই একটু একটু শুনেছে, এখন পড়ছে শুধু পড়ছে নিজস্ব তাগিদেই।

ঠিক একইভাবে সুনীতিও তো বাবার কাছে শিখেছিলেন প্রার্থনা, ব্রহ্ম উপাসনা, মায়ের কাছে শুনেছেন পুরাণের গল্প আর ধর্মকথা। সে-ও তো নারী শিক্ষার একেবারে গোড়ার কথা। কেশব তাঁর বড় কন্যাকে প্রথমেই ভর্তি করেন বেথুন স্কুলে। পরে ১৮৭১ সালে নিজের প্রতিষ্ঠিত, 'নেটিভ লেডিজ নর্মাল অ্যান্ড অ্যাডাল্ট স্কুল অ্যান্ড গার্লস স্কুল'-এ ভর্তি করেন। সেখানে সুনীতি সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম ও সমাজ আরও না জানি কী শিখেছেন! সমস্ত মানুষকে মুহূর্তে আপন করে নেওয়ার নিজস্ব গুণ ছিল তাঁর। আর এই কারণেই সামান্য গ্রাম্য রমণী থেকে শুরু করে বহু গুণী মানুষের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন তিনি। যেমন সুদক্ষিণা গঙ্গোপাধ্যায় সুনীতি ও সাবিত্রী দুই বোনের কথা তাঁর আত্মস্মৃতিতে বলে গেছেন। তাঁরা দু'জনেই সুদক্ষিণাকে দিদির মত ভালবাসতেন। সুনীতি তাঁর রাজকীয় সুখ সমস্ত মুহূর্তে ছেড়ে সাধারণের সঙ্গে সাধারণের মত কাটাতে পারতেন।

কেশবচন্দ্রের পৈতৃক ভিটেয় সুনীতির জন্ম হলেও কিশোরী হয়ে ওঠার সময়ই কমল-কুটীরে চলে আসেন, এ কুটীরও কেশবচন্দ্রেরই তৈরি।

এসব স্মৃতিকথার বই, কিংবা সারদা সুন্দরীর স্মৃতি যে বই যোগেন্দ্রলাল খাস্তগীরের অনুলিখন। এ বইগুলো মহারাণীর পড়তে ভারি ভাল লাগে। বাবা

এরপর ৪১ পৃষ্ঠায়

ডুয়ার্সের মেয়েগুলি

প্রশ্নের ছেলে উত্তরের মেয়ে

পাত্র হিসেবে কখনই আমি প্রশ্নাতীত ছিলাম না। অতীতেও ছিলাম না। এখনও নই। ছেলেবেলা থেকেই কবিতা আমার ঘাড়ে চেপে বসেছিল। আজ্ঞে না, কবিতা কোনও বঙ্গ ললনার নাম নয়। এখানে কবিতা হল সেই লতা; নিরাশ্রয়ে যার শোভা থাকে না। রঙ মিলান্তি, বং মিলান্তি, ছন্দ মিলান্তি কবিতা আমার মাথাটা চিবিয়ে খেয়েছিল বলে শৈশবের আঁতুড়েই দিস্তা দিস্তা কবিতার সঙ্গে আমি রিস্তা পাতিয়েছিলাম। যখন সাইকেল চালাতেও শিখিনি তখনই মাইকেল পড়েছি। পড়ার শুরুতে তিনি সম্ভবত আমাকেই স্পেশালি সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন - দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল।

আমার শুভ আবির্ভাব শৈলশহর দার্জিলিঙের ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে। সেখানেই বাপের বাড়ি, সেখানেই মামাবাড়ি। আমি যখন মধ্য কৈশোরে সে সময় আমার বাবা বদলি হয়ে চলে যান জলপাইগুড়ি। আমার পড়াশুনো চালিয়ে যাওয়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় আমি থেকে যাই মামাবাড়িতে। আর আপনারা সকলেই জানেন — মামাবাড়ি ভারি মজা কিল চড় নাই। তাই জীবনের সাতসকাল থেকেই আমার অ্যাটিটিউডের মধ্যে 'মামাবাড়ির আবদারবসুলভ' প্রচুর কল্পনাশ্রয়ী ইচ্ছে অনিচ্ছে বেড়ে উঠতে থাকে। অনেকটা হরেক মালের দোকানদারের মত। আমার সব কল্পনার দামই তখন চার আনা। যা বিলিয়ে দিচ্ছি, যা সংগ্রহ করছি সবকিছুরই মূল্য একতারে বাঁধা। চার আনা।

চার আনার ছেলে হলেও আট আনার ললিত লবঙ্গলতা যে তাকে আকর্ষণ করবে না তার তো কোনও বিধিবদ্ধ নিয়ম নেই , তাই 'সিম্পল সিম্পল কাঞ্চি কো ডিম্পল পরনে গালা'-য় মন মজে গিয়েছিল সেই থেকেই। পাহাড়ি কিশোরিদের সারল্যমাখা আমূল বাটারের মতো গালে চাঁদের গর্তের মত টোল ... আহা সেই ফ্যান্টাসি যেন মগজে গেঁথে গেল সেই থেকেই। গুরু মানলাম সেই মাইকেলকেই। দাঁড়াও পথিকবর। যেও না এই উত্তরবঙ্গের কৌমার্য ভরা জমিজিরেত ছেড়ে। তিষ্ঠ এখানেই। তাতে যদি অন্য কেউ তিষ্ঠতে না পারে তাতেও কুছ পরোয়া নেই। পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণে যেও না বাছা। উত্তরেই থাকো অজানা প্রশ্নের উত্তরপত্র হাতে নিয়ে।

সমস্যা বেঁধে গেল অন্য জায়গায়। আমার বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে অসামঞ্জিক হারে দার্জিলিঙের সোহাগ চাঁদ বদনী বঙ্গ ললনাদের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকল। অনেকটা ডুয়ার্সের গন্ডারের মত। যারা রইল তারাও এই অধমের দিকে কৃপাদৃষ্টি দিল না। শেষে ব্যাপারটা দাঁড়াল এই রকম - আমি যাকে চাই, সে আমাকে চায় না। আর যে আমাকে চায় , তার দিকে চাওয়া যায় না। ফলে মাইকেল যেন আমার জীবনে জ্যোতিষরূপী হয়ে এলেন। ফলে গেল তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী। ওই যে তিনি বলেছিলেন -তিষ্ঠ ক্ষণকাল ! তাই কৈশোর পেরিয়ে যৌবণে ক্ষণকালের বেশি আর থাকা হল না পাহাড়ের নীল নীল স্বপ্নে। উচ্চশিক্ষার তুচ্ছ অভিপ্রায়ে চলে আসতেই হল শিলিগুড়ি।

তুলনায় অত্যন্ত নবীন শহর শিলিগুড়িতে ঘাঁটি গাড়তেই ধক করে একটা কসমোপলিটান গন্ধ এসে লাগল নাকে। আমার শরীরে পাহাড়ের ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল কুয়াশার আস্তরণ এই নিমেষেই বাষ্প হয়ে উড়ে গেল মাইকেলের সমাধির দিকে। শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকাতেই হঠাৎ একটা মরুদ্যান চোখে পড়ল। ডুয়ার্স। মোহময়ী ডুয়ার্সের অপরূপা বনানী। নাহ্ , এখানেও কোথাও একটা ভুল হচ্ছে। বনানী মানে কলাবিনুনি বাঁধা কোনও প্রগলভা রমণীর কথা কিন্তু বলতে চাইনি। আসলে 'যার মনে যা, ফাল দিয়া ওঠে তা'। আমি কিন্তু বনানী বলতে ডুয়ার্সের ওই ইয়ের কথাই বলতে চেয়েছিলাম শুধু।

ডুয়ার্সে আর্কিমিডিস কখনও আসেননি। এলে আরও অনেক আগেই উনি দিগম্বর হয়ে ডুয়ার্সের পথে ঘাটে ইউরেকা ইউরেকা বলে উদভ্রান্তের মত ছোটাছুটি করতেন। আর্কিমিডিস কখনও এদিকে আসেন নি বলে আমারও অনেক সুবিধে হয়ে গেল। ইউরেকা ইউরেকা বলে আমি তাঁর হয়ে প্রক্সি দিলাম কিছুদিন। যা দেখছি তাতেই আমার 'ওরে ওরে ওরে, আমার মন মেতেছে' - এই রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধাঁচে একটা ফিলিংস হতে শুরু করল। জানি, ধারেকাছে কেউ নেই। তবুও চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করে - ওরে কে আছিস , আমাকে একগ্লাস বাদাম-সরবত দিয়ে যা। কোচ, রাভা, মেচ, রাজবংশী, বোড়ো, সাঁওতাল, মুন্ডা, ওঁরাও, নেপালি আর বাঙালি মেয়েরা আমাকে কাঙালি বানিয়ে চলে গেল একে একে। যাকে মনে ধরে তাকে ঘরে ধরতে পারি না। আবার, যে অনায়াসেই ঘরে ধরার জন্য সুলভ হয়ে ওঠে তাকে মনে ধরে না।

ডুয়ার্সে আর্কিমিডিস কখনও আসেননি। এলে আরও অনেক আগেই উনি দিগম্বর হয়ে ডুয়ার্সের পথে ঘাটে ইউরেকা ইউরেকা বলে উদভ্রান্তের মত ছোটাছুটি করতেন। আর্কিমিডিস কখনও এদিকে আসেন নি বলে আমারও অনেক সুবিধে হয়ে গেল। ইউরেকা ইউরেকা বলে আমি তাঁর হয়ে প্রক্সি দিলাম কিছুদিন। যা দেখছি তাতেই আমার 'ওরে ওরে ওরে, আমার মন মেতেছে'।

আমার সেই চরম ক্রাইসিসের মুহূর্তেই ডুয়ার্সের পেটেন্ট একটি আপ্তবাক্য আমার হৃদয়ে বাহিরে অন্তরে অন্তরে সর্বক্ষণ হুটারের মত পোঁ পোঁ করে বেজেই চলল। ' কাম সারছে'। নাহ্, কামদেবের পঞ্চশরের একটিতেও এই ক্ষেদোক্তিটা নেই। তবু 'কাম সারছে' এই শব্দবন্ধের যে কী অপার মহিমা তা হাড়ে হাড়ে টের পেলাম। তবে শেষ পর্যন্ত 'কামের কাম'টা করেই ফেললাম। লিও তলস্তয়ের 'পরিশ্রমই মানুষের জীবন গড়ে দেয়' এই দেওয়াল লিখন পড়ে ফেলেছিলাম হয়ত কখনও। অনেক অধ্যাবসয়ের পর বিয়ে করে ফেললাম ডুয়ার্সেরই একটি মেয়েকে। প্রশ্নচিহ্নযুক্ত এই আমি-র সঙ্গে উত্তরের সেই মেয়েটি আজও সংসারের ঢেউ গুণেই চলেছে।

ছবিসহ প্রতিবেদন **গৌতমেন্দু রায়**

রাজীবই স্থানীয় পাঠাগার থেকে রাজবাড়ির ইতিহাস পড়িয়েছেন। পড়িয়েছেন রাজনগরের ইতিহাস আর অমিয়ভূষণ।

মহারাণীর আজকের অস্থিরতা একটু অন্যরকম। বার বার সে অস্থিরতায় ঘুরে ফিরে আসে সুনীতি, নৃপেন্দ্রের অসবর্ণ বিয়ের কথার, সে আসরের নানা ঘনঘটার ছবিগুলো। যেগুলো ঘুরে ঘুরে মাথার ভিতর কল্প ছবি তৈরি করে দিচ্ছিল।

****

এক বিরাট আলোড়ন উঠেছিল রাজনগর জুড়ে। রাজনগর, রাজবাড়ি ছাড়িয়ে সে আলোড়ন ছড়িয়ে পরেছিল ঐতিহাসিকতায়, রাজনৈতিকতায় বহির্জগতে সুদূর প্রসারী বিস্তৃতি ঘটেছিল।

কেন এমন হল? মাঝে মাঝেই মাথার ভিতর প্রশ্নের জর্জরিত বাণে বিদ্ধ হয় সম্রাজ্ঞী। বাল্যবিবাহ রদ নিয়ে যখন চারিদিক আলোড়িত, ব্রাহ্মসমাজ যখন সেক্ষেত্রে উদ্যমী ভূমিকায় সেখানে ১৮৭৮ সালে কোচবিহারের মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণের পুত্র নৃপেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে সুনীতিদেবীর বিয়ে ঠিক হল। তখনও সুনীতির বয়স চোদ্দোয় পৌঁছায়নি।

ব্রাহ্ম মতে বিয়ে হিন্দু বা মুসলমান বিয়ের মত বৈধ নয় সেসময়। কেশবচন্দ্র সেনের দীর্ঘ লড়াই-প্রতিবাদে ১৮৭২ সালে তিন আইনের মধ্য দিয়ে (Act iii of 1872- Special Marriage Act) ব্রাহ্ম বিবাহ বিধিসম্মত করা হয়। এই আইনে পাত্রের বয়স অন্যূন ১৮ ও পাত্রীর বয়স অন্যূন ১৪ ধার্য করা হয়। ১৮৭৮ সালে নৃপেন্দ্রনারায়ণেরও বয়স মাত্র পনের-ষোলো। স্বাভাবিকভাবে এই বিয়ে তিনটি আইনই লঙ্ঘন করেছিল। উঠেছিল প্রবল প্রশ্ন, আলোড়ন।

মহারাণীর অজস্র প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে রাজীব এ বিবাহ নিয়ে। তারপর জেলা গ্রন্থাগার থেকে একখানা বই এনে দিয়েছিলেন মহারাণীকে। আজ ফিরে ফিরে শুধু ভাবছে সে, ওই দুই সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ কোনও ছেলে আর চোদ্দোয় না পৌঁছানো এক বালিকা সে সময় কি কিছু ভেবেছিল, ভাবতে পেরেছিল! আসলে কেশবচন্দ্রেরও মনের ইচ্ছে কিন্তু অন্যরকম ছিল। অমতই ছিল তাঁর। কিন্তু ঘটনাচক্রে এই অপরিণত বয়স্ক বিয়ে তিনি মেনে নিয়েছিলেন।

নরেন্দ্র নারায়ণের অকাল মৃত্যুতে তার পুত্র নৃপেন্দ্রনারায়ণ মাত্র দশমাস বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করলেও রাজকার্য পরিচালনা করতেন রাজমাতা নিশিময়ী। ইতিহাসে এইরকম শিশু রাজাদের কথা পড়তে গিয়ে, সে সম্পর্কে কাহিনিগুলো পড়তে পড়তে মহারাণীর চোখের সামনে রাজসজ্জায় সজ্জিত যে অবোধ শিশুর ছবি ফুটে ওঠে, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। দৃষ্টিনন্দন তো বটেই। রাজমাতা নিশিময়ীর ছবি দেখতে পায় সে আজও। কোলে রাজসজ্জায় নৃপেন্দ্রনাথ। সত্যি ধন্য রাজ ইতিহাস আর রাজনীতি। আর ঠিক সে সময়ই ব্রিটিশ সরকার কোচবিহার রাজ্যে ইংরেজ কমিশনার ও ডেপুটি কমিশনার নিয়োগ করেন। রাজবাড়িতে তখন কত ঘটনা সামাজিক ব্যাধির আকার নিয়েছে। বহু বিবাহ, নানারকম কুসংস্কার মারাত্মক আকার নিয়েছে। রাজবাড়ির এইরকম অবস্থায় প্রজাদের অবস্থা আরও সঙ্গীন। কোচবিহারের এই দুর্দশা এবং পঙ্কিল জীবন থেকে মুক্তি আনার জন্য ইংরেজ সরকার নৃপেন্দ্রনারায়ণকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে চেয়েছেন।

(ক্রমশ)

আমাকে খুঁজে দে জলফড়িং

আমার কোনও নদী নেই, কোনও হারিয়ে যাওয়া যৌথ পরিবার নেই, বাগান নেই এমনকি কোনও গ্রামও নেই। আমার ছোটবেলা জুড়ে, মেয়েবেলা জুড়ে আমার মফস্বল শহর। কোনও কোনও দুপুরে এক বাউল আসত। মা বলত, ওই শচীমাতা... গানটা করো না গো। বাউল গান ধরত— বিদায় দাও গো শচীমাতা। মায়ের চোখে তখন জল, কোলে বসে আমিও শুনতাম সে গান। বাবা চাকুরি সূত্রে এসেছিলেন এখানে। আমরা ভাড়া থাকতাম দত্তবাবুর বাড়িতে। সেপারেট বাড়ি। উনি থাকতেন অন্য শহরে। আমাদের পাঁচ ইঞ্চি দেওয়ালের পুরনো বাড়িটার ছাদের উপর ছিল কালো রঙের চট আর পিচের মিশ্রণে জল পড়া আটকানোর ব্যবস্থা। বহুদিন আগে করা এই ব্যবস্থার চামড়া উঠতে শুরু করেছিল। আমার অভ্যাস ছিল সেই ছাদের কালো চামড়াগুলো খুটে খুটে তোলা। বিশেষ করে শীতের দুপুরে অঙ্ক করতে বসে।

বাড়ির লাগোয়া পুকুরের চারপাশে যে আকাশ ছোঁয়া সুপুরি গাছ, নারকেল গাছ ছিল তার ঠিক পিছনে বিশাল সূর্যটা বেলা পড়ে এলে যখন লাল রং ধারণ করে ডুবু ডুবু তখন তার দিকে তাকাবে না, কার সাধ্য! ফড়িংগুলোও সুযোগ বুঝে সকলে ঝাঁক বেঁধে মেলে দিত ডানা। আমার তখন হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা। সবে একটা ফড়িংয়ের পাখা ধরেছি এদিকে মা নিচ থেকে ডাকা শুরু করেছে। গড়াগড়ি খাওয়া অঙ্ক খাতা বই তুলে ধুপ করে নেমে পড়তাম ঘরের উঁচু ছাদ থেকে বারান্দার নিচু ছাদে। তারপর গেটের লিনটনের উপর একটু হেঁটে এসে বাথরুমের ছাদ। সেখানে লাগানো কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নিচে। মা তখন দুধ-মুড়ির বাটি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। মুড়ির উপর শুয়ে থাকা দুধের সর। আহা! চিনির মৌতাতে পৃথিবীর সবচেয়ে সুস্বাদু বস্তু। এই খাবার পাড়ার সবাই পেত না। ওরা খেত তেল দিয়ে মুড়ি। শ্যামলিদের বাড়ির কুরথির ডাল সেদ্ধ আর মুড়ির গন্ধ কখনও ভুলিনি, স্বাদও ছিল দারুণ। তবে তার চেয়েও বেশি ভাল লাগত আমাদের পাশের রূপাদের বাড়ির সকালের জলখাবার। দুই কামরার ভাড়া বাড়িতে ওরা থাকত ষোল জন। এখন আর কিছুতেই মনে করতে পারি না ওরা কোথায় কীভাবে ঘুমতো। যাই হোক, ওরা সকাল বেলা একসঙ্গে সবাই খেতে বসত লাইন দিয়ে মাটিতে। রেশনের মোটা চাল, লবণ আর ভাতের মাথায় একটু করে মহার্ঘ হলুদ। আহা এমন অমৃত খাবার আমার দেখা আর দ্বিতীয় ছিল না। আমিও প্রায়ই গিয়ে বসে পড়তাম ওদের দলে। মা-ও নিশ্চিন্ত হত। কারণ তখন আমাকে খাওয়ানোর জন্য মাকে আর এক ঘণ্টাব্যাপী গল্পের জাল বুনতে হত না।

খাওয়ার গল্প কখনওই শেষ হবে না যদি না বলি সেই দুপরবেলা বন্ধুরা মিলে বাড়ি থেকে আটা চুরি করে ইটের উনুন বানিয়ে কাগজ পুড়িয়ে চিনি দিয়ে আটা ভাজা খাওয়ার গল্প। ভাগে বোধহয় দু' চামচ করে পড়ত। কিন্তু ওই আটা ভেজে খাওয়াটা ছিল উৎসব। আমাদের বন্ধুদের এই রান্নাঘর ছিল পাড়ারই একটা পরিত্যক্ত বাড়িতে। ওখানে বাতাবি লেবুর গাছ ছিল, কুলের গাছ ছিল। একদিন ওই বাড়ি বিক্রি হয়ে গেল। মিস্ত্রি লেবার এসে ছেনি হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে ফেলল ওই নোনা ধরা দেওয়াল। আমি স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলাম ওদের কান্না। বড় একটা বাড়ির ভিত গাঁথা হয়ে গেল। আমিও তখন প্রাইমারি থেকে হাইস্কুল। আমাদের বাড়ির লাগোয়া যে পুকুরটার কথা আগে বললাম সেটা ছিল

পাড়ার সবাই তখন ওদের বাড়িতে দেখতে যেত 'রামায়ণ'। তিরে তিরে সেই আগুন ঝরানো যুদ্ধ। রামায়ণ থেকে মহাভারত। রাস্তা জনশূন্য হয়ে যেত। আমার বন্ধুরা সবাই ভুলেই গেল ওখানে একটা বাতাবি লেবুর গাছ ছিল, আমাদের নিজস্ব একটা রান্নাঘর ছিল। আগাছায় ভরা একটা রূপকথার দেশ ছিল।

প্রাচীর দিয়ে ঘেরা আর ঘেরাটোপের ভেতরে ছিল নারকেল, সুপারি, কলা,জাম, অশোক আরও কত যে গাছ। জাম গাছে ভূত থাকত। কেউ কখনও গাছে উঠতে পারত না। যারাই চেষ্টা করেছে, তেনারা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতেন।

অশোক গাছটা ছিল আমাদের বাড়ির ঠিক পেছনের দিকে। ওটার কাছে পাঁচিলে বসে ভর দুপুরে তেঁতুল খাওয়া ছিল ডেইলি রুটিন। মা বলেছিল অশোক গাছে নাকি সুন্দরী মেয়েরা রোজ জল দিলে তবে ফুল ফোটে। সুন্দরী বলে আমারও অল্পস্বল্প নাম লোকের মুখে শুনেছি। সুতরাং রোজ একটা গ্লাসে করে জল নিয়ে গাছটাতে ছিটিয়ে আসতাম। একদিন সত্যি সত্যি গাছ আলো করে ফুটে উঠল আগুন রঙের অশোক। গাছ ভরা তার রূপ। আমার বোন তখন নার্সারি। আমি সিক্স। দুজন মিলে প্রচুর ফুল তুলে এনে ঘর সাজালাম। জানালার বাইরে ফুল, ঘরের ভিতরে ফুল। খুব আমোদ হয়েছিল মনে। কারণ কেউ জানল না দুপুরে চুপিচুপি গিয়ে আমি সেই গাছে জল দিয়ে আসাতে ফুল ফুটেছে! আমাদের উঠোনে ছিল একটা শিউলি ফুলের গাছ। শরতের সকালে শিউলি ফুল কুড়ানোও ছিল আমার মেয়েবেলা। আবার বন্ধুরা মিলে সেই ভোরের ফুল চুরি করতে যাওয়া ছিল আমার মেয়েবেলা। ঝুড়ি ভরে উঠত স্থল পদ্ম, গোবিন্দ জবা, ঝুমকো জবা, টগর, গন্ধরাজে।

পাড়ার ক্লাবে গড়ে উঠতে দেখতাম একটু একটু করে মাতৃ দুর্গা প্রতিমা, পুজোর প্যান্ডেলের জন্য বাঁশ বাঁধা। যদিও আমাদের সবচেয়ে প্রিয় উৎসব ছিল ঝুলন। বড় রাস্তার ধারে কাঠের মিল থেকে কাঠের গুঁড়ো এনে লাল নীল সবুজ রং করে এক মাস আগে থেকে শুরু হয়ে যেত প্রস্তুতি। সাদা কাপড়ে কাদা মাখিয়ে পাহাড় হবে। জোগাড় করতাম সবুজ পুরু শেওলা। প্লাস্টিকের পুতুল। বরফ হত টেলকম পাউডার দিয়ে, কাঠের গুঁড়ো দিয়ে রাস্তা। সেখানে শহর থেকে ধানখেত, পুকুর থেকে যুদ্ধক্ষেত্র। কী থাকত না! বিকেলে ধুপকাঠি দেখিয়ে বাতাসা ভোগ দিয়ে আমরা তখন সম্পূর্ণ ধার্মিক মেয়ের দল। একবার আমি সকলকে চমকে দিয়েছিলাম। মা খিচুড়ি করে দেওয়াতে। সবাইকে খাওয়ালাম। কবে থেকে যেন যে যার বাড়িতে ঝুলন সাজাতে শুরু করল আলাদা করে। সে কবেকার কথা। তখন আমরা অন্যের ঝুলন দেখতে যেতাম, তখন আমরা প্রতিযোগী।

ওদিকে সেই নতুন বাড়িটা হয়ে গেছে প্রায়। কিন্তু তারপর কাজ বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। আমরা বিকেলে ওখানে লুকোচুরি খেলি। একদিন বিকেলে আমি আর মা তখন রবো কাকিমার বাড়ি গিয়েছিলাম। ওদের বাড়ি থেকে দেখা যেত রায়গঞ্জের একমাত্র ট্রেনের কু ঝিক ঝিক যাওয়া আসা। সে এক রূপকথা যেন। তখনও আমি পথের পাঁচালি দেখি নি। সেদিন সেই ট্রেনে আমার বাবার আসবার কথা, মামা বাড়ি থেকে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে দেখলাম বাবা মাথা নিচু করে বসে আছে। মা জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে? বাবা উত্তর দিল না। মা চা করার জন্য গেল। রান্না ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। খুলতেই সেই ঘটনা। ঘরের ভেতরে লুকিয়ে ছিল আমার তিন মাসি, তাদের ছেলেমেয়ে, এক মামা। মাকে সারপ্রাইজ দিতে। সে এক মহা হৈ হৈ কান্ড। আশপাশের বাড়ির লোকজনও জমা হয়ে গেল আনন্দের শরিক হতে। আসলে তখন কোনও আনন্দই কারও চার

দেওয়ালের ভেতর আটকে থাকত না। খুব হৈ হৈ করে কাটালাম ক'টা দিন। পরের দিন ছিল কালী পুজো। সব বন্ধুরা আমাদের বাড়িতে এসেছিল। আমরা প্রচুর পটকা ফাটিয়েছিলাম। এমনকি বেঁচেও গিয়েছিল কিছু।

আরও দু'দিন পর সবাই চলে গেল। চটি-জুতো লুকিয়েও আটকানো গেল না। শুধু আমার মাসতুতো দিদি থেকে গেল। খুব মজা হল। আমার দিদি থাকা মানে আমি তখন বন্ধুদের রাজা। কারও ক্ষমতা নেই আমার সাথে ঝগড়া করে। দিদি যদি একবার কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ায় তো ওরা আর পরিষ্কার করে কথা বলার ক্ষমতায় থাকে না। সেই দিদির মত বুদ্ধিমান ভূ-ভারতে কেউ ছিল না। সেই দিদি একদিন বুদ্ধি দিল চকলেট বোমের বারুদ দিয়ে তুবড়ি বানানোর। মা তখন দিবা নিদ্রায়। আমি আর দিদি এক বাক্স চকলেট বোম, মানে প্রায় বারোটার বারুদ বার করে একটা কাগজে রেখে, দিলাম আগুন। চিড়বিড় করে জ্বলে তারপর বিশাল শব্দ। মা'র ঘুম ভেঙে গেল। ধোঁয়ায় ভর্তি বারান্দা। আর আমরা দুই মূর্তি দাঁড়িয়ে হতবাক। তাপে পুড়ে গেছে আমাদের সামনের চুল ভুরু। কিন্তু সে নিয়ে চিন্তা ছিল না, চিন্তা হচ্ছিল মায়ের গোল গোল রাগি চোখ দেখে। খারাপ সময় একা আসে না। ঠিক তার ক'দিন পরেই অঘটন। পাশের বাড়ির রূপা মাত্র ক্লাস এইটে পড়তেই এক ছেলের প্রেমে পড়ল আর ওর বাবার কাছে ধরাও পড়ে গেল। ব্যস, আমিও হঠাৎ করে বড় হয়ে গেলাম। যখন তখন বাড়ি থেকে বেরনো বন্ধ হয়ে গেল।

পাড়ার ক্লাবে গড়ে উঠতে দেখতাম একটু একটু করে মাতৃ দুর্গা প্রতিমা, পুজোর প্যান্ডেলের জন্য বাঁশ বাঁধা। যদিও আমাদের সবচেয়ে প্রিয় উৎসব ছিল ঝুলন। বড় রাস্তার ধারে কাঠের মিল থেকে কাঠের গুঁড়ো এনে লাল নীল সবুজ রং করে এক মাস আগে থেকে শুরু হয়ে যেত প্রস্তুতি

ততদিনে আবার সেই বাড়িটায় নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। শেষও হয়ে গেল। ওরা চলেও এল। ওদের বাড়ি খুব সুন্দর করে সাজান। ফ্রিজ আছে, রঙিন টিভি আছে। পাড়ার সবাই তখন ওদের বাড়িতে দেখতে যেত 'রামায়ণ'। তিরে তিরে সেই আগুন ঝরানো যুদ্ধ। রামায়ণ থেকে মহাভারত। রাস্তা জনশূন্য হয়ে যেত। আমার বন্ধুরা সবাই ভুলেই গেল ওখানে একটা বাতাবি লেবুর গাছ ছিল, আমাদের নিজস্ব একটা রান্নাঘর ছিল। আগাছায় ভরা একটা রূপকথার দেশ ছিল। আচ্ছা আজ এত বছর পর মনে হয়, ওই নোনা ধরা ইটের কান্না কি শুধু আমি একাই শুনতে পেতাম! কেমন যেন মনে হয় এক আলো আঁধারি জগতে মণিমানিক্য খুঁজতে হাতড়ে বেড়াই মাধ্যাকর্ষণ টান বিহীন আমি একা। ফ্ল্যাট বাড়ির তলে বুঁজে যাওয়া পুকুর কাঁদে, ছেড়ে আসা ভাড়া বাড়ির কালো ছাদ কাঁদে। ঝুলনের শেওলা শ্বাস প্রশ্বাস খোঁজে। আর সেই ঝাঁক ঝাঁক ফড়িং! এসব কি আদৌ হারিয়ে গেছে! কোনওদিন আর দেখা হবে না! নাকি একদিন যাদুবলে পৌঁছে যাব অন্য এক পৃথিবীতে সেখানে অবিকল সাজান থাকবে আমার মেয়েবেলা।

অর্পিতা গোস্বামী চৌধুরী

এখন ডুয়ার্স পত্রিকা প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি	
হলিডে ইয়ার, হরেন মুখার্জি রোড	৯৪৩৪৪৪২৮৬৬
বিশ্বাস বুক এজেন্সি, বাটা গলি, হিলকার্ট রোড	৯৪৩৪৩২৭৩৪২
শিবমন্দির	
অনুপ দাস, শিবমন্দির বাজার	৯৮৩২০২৯৫১৪
জলপাইগুড়ি	
ভবতোষ ভৌমিক, কমার্স কলেজের বিপরীতে	৯৭৩৩২৪৬৯১৩
বিজয় ঝা, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	৮৫৩৮৮২২৪০৪
মালবাজার	
সম্রাট (হোম ডেলিভারি)	৯৩৩২০০৫৮৬৫
চালসা	
দিলীপ সরকার, চালসা মোড়	৯৭৭৫৪১৫১৪৪
বিন্নাগুড়ি	
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল	৯৪৩৪৮০৯৫৯০
বীরপাড়া	
বরুন ঘোষ, পোকিসা	৯৫৯৩৩৫৪১৫২
মাদারিহাট	
জগৎ চৌধুরী (হোম ডেলিভারি)	৯৭৪৯৭২৫৭৮১
লাটাগুড়ি	
সৌমেন (হোম ডেলিভারি)	৯০০২৪০৯৮৯৩
ময়নাগুড়ি	
দেবাশিষ বসুভাট	৯৯৩৩১৯০৮৫৮
ফালাকাটা	
অমল চন্দ্র পাল	৯৪৩৪৪১২৬৪৯
তুফানগঞ্জ	
আনন্দবাজার বুক স্টল	৯৩৩৩৬৮৮৬৭১
দিনহাটা	
হরিপদ রায়	৯৯৩২৬৩৯০৬৮
আলিপুরদুয়ার	
দীপক কুমার হোড়, কলেজ হল্ট	৭৬৭৯৮৯৫৩০৭
কোচবিহার	
সার্থক পণ্ডিত (হোম ডেলিভারি)	৭০০১২৬৩২৮৬
জয়ন্ত দাস, বড় পোস্ট অফিসের বিপরীতে	৯৪৩৪২১৭০৮৪
মালদা	
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি	৯৯৩২৯৬৭৯৯১
বালুরঘাট	
মাধববাবু	৯১২৬২৬০৬৬৩
ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন	৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক বিশাল বুক সেন্টার ৪০৬৪৪০৯৭

বড় গল্প

স্কেচ দেবাশিস সাহা

ছায়া জন্ম নেয়

সাগরিকা রায়

সারারাত ঘুম না হলে সকালে ঝিম ঝিম করে শরীর। তন্ময় ঘুম চোখে তাকিয়ে অনন্যাকে দেখার চেষ্টা করল। অনন্যা ভোরে ওঠে। বরাবরের অভ্যেস। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে অনন্যা বিছানা ছাড়তে দেরি করছে। ওর শরীর ভাল নেই। আচ্ছা, আয়া আসেনি এখনও! অনন্যা ওয়াশরুমে যাবে কি? ইদানিং শরীরটা ভাল নেই অনন্যার। ইউটেরাসে ছোট্ট সিস্ট হয়েছিল। সেটা অপারেশন করিয়ে ফিরেছে পনের দিন হল। এখনও দুর্বল অনন্যা।

ঠিক আটটায় আয়া আসে। সেন্টার থেকে সেটাই বলা হয়েছিল। সকাল আটটা থেকে রাত আটটা মোট বারো ঘন্টার ডিউটি। কিন্তু হচ্ছে না। আয়া টাইম মেনটেন করছে না। এভাবে চলে না। প্রতিদিন দেরি করছে। অনন্যা একা হাঁটাচলা করতে পারে না বলে সব সময় একজন হেল্পার দরকার হয় ওর। কিন্তু সে-ই যদি এত দেরি করে তাহলে খুব মুশকিল তো! নাঃ, উঠে বসল তন্ময়। পাশে শুয়ে কাতরাচ্ছে অনন্যা। গত তিন বছর ধরে অনন্যা অসুস্থ থাকায় বাড়িটা এখন হসপিটাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। অফিস থেকে বাড়ি ফিরে আসার সেই ভাললাগাটুকু ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে রাস্তার কোণে কোণে! ফিরতে ইচ্ছে করে না। ইচ্ছে করে না আগের মত তাড়াহুড়ো করে বাড়িতে পৌঁছে যেতে। লাস্ট মেট্রোতে উঠে দেরি করে পৌঁছেও অনন্যার মুখোমুখি হতে ইচ্ছে করে না। ইচ্ছেগুলো তাড়িয়ে বেড়ায় ওকে আজকাল। একবার অনন্যার বিষাদক্লিষ্ট মুখের দিকে চোখ ফেলে মুখ ফিরিয়ে নিল তন্ময়। ভুগে ভুগে কেমন বৃদ্ধা টাইপ চেহারা হয়ে গেছে অনন্যার। গলিত লাশ! ঢ্যালঢেলে নাইটি উঠে আছে হাঁটুর ওপরে। সেদিকে তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল তন্ময়। ভাললাগা বলে সত্যি কিছু আছে কি আর? খুব আশ্চর্য হল তন্ময়। পাশে শুয়ে কাতরাচ্ছে অনন্যা, অথচ ওর এখন মনে পড়ল সুমিকে! অফিস যাতায়াতের সময় রোজ ট্রেনে দেখা হয় সুমির সঙ্গে। সুমি। খুব সাধারণ ঘরের মেয়ে। বিবাহিতা। ওর সিঁথিতে সিঁদুর দেখেছে তন্ময়। কোথায় যায় রোজ সুমি? জিগ্যেসই করা হয়নি! সাধারণ শাড়ি ব্লাউজেও বেশ লাগে ওকে। কানে, গলায় ইমিটেশন গয়না। মায়া ভরা চোখে ঘন করে কাজল পরে। দীর্ঘ পল্লব শান্তির ছায়া সৃষ্টি করে রাখে ওর চারপাশে। কোঁকড়ানো চুলে পরিপাটি বিনুনি। দুটো কালো সরু ক্লিপে খুচরো চুল আটকে রাখা। শ্যামলা মুখে আলগা লাবণ্য ছল ছল করে! ভরাট শরীর। নেইল পালিশহীন নখ পরিপাটি করে কাটা। সেদিন ফোনে কথা বলছিল কার সঙ্গে। তখন পাশে বসে সুমির মুখে কাঁচা পেঁয়াজের গন্ধ পেয়েছিল তন্ময়। সুমির পাশে বসে প্রায়দিনই বা বলা যায় অনেকদিন যাতায়াত করেছে তন্ময়। জলের গভীরে গিয়ে শুয়ে থাকা শ্যাওলার গন্ধ পেয়েছে সুমির গায়ে। বুনো আদিম গন্ধ। মনে পড়লে মাথা ঝিমঝিম করে। আশ্চর্য ঘটনা হল, ইদানিং অনেকরাত পর্যন্ত অনিদ্র অবস্থায় পাশে শুয়ে থাকা বিয়ে করা বউকে অগ্রাহ্য করে সুমিকে ভাবে তন্ময়। অন্ধকারে সুমিকে নিয়ে আসে কাছে। নিবিড় ভালবাসায় মত্ত হয়ে ওঠে।

ডোর বেল বাজছিল। আয়া জবা এসেছে! বিরক্তি চেপে উঠল তন্ময়। এভাবে পারা যাচ্ছে না। জীবনটা এভাবেই কেটে যাবে? এখনই জীবনের সবটুকু রস শুকিয়ে গেল? মনের বিরক্তি ঢেলে দিল আয়ার সামনে —কী ব্যাপার? আজও ট্রেন লেট? আধঘন্টা আগে বাড়ি থেকে বের হবে। এভাবে রোজ রোজ... পারা যাচ্ছে না! না পারলে বল, সেন্টার থেকে অন্য আয়া পাঠিয়ে দিক! রোজ রোজ দেরি করে আস। ভাল লাগে না। চা খাবে কখন তোমার পেশেন্ট?

আয়া মুখ গোমড়া করে ওর পাশ কাটিয়ে চলে গেল অনন্যার কাছে! এখন দুদিন তাড়াতাড়ি আসবে।

এদের চিনতে দেরি নেই তন্ময়ের! এক একটা চিজ বড়ি হ্যায় মস্ত মস্ত! প্রায় প্রত্যেকেই বর থাকতে আরেকজনকে বডিগার্ড হিসেবে রেখেছে। বাড়ি থেকে বের হয়। রাস্তায় অনেকটা সময় কাটিয়ে ফেরে সেই প্রেমিকের সঙ্গে।

বিরক্তি নিয়ে ট্রেনে উঠে সুমিকে দেখতে পেল না তন্ময়। মনের কোণে সুমি লুকিয়ে ছিল ও নিজেও বুঝতে পারছিল না। এখন দেখতে না পেয়ে বিষাদ নখ বসিয়ে দিল বুকে। প্রখর রৌদ্রের পর মেঘের তালাশ থাকে মনের অগোচরে। সুমি হয়তো সেই শীতল মেঘ হয়ে আসে তন্ময়ের কাছে! কে জানে!

খর তাপ প্রশমিত হল না বলে মন খিঁচড়ে থাকল। এসপ্ল্যানেডে পৌঁছে মেট্রো স্টেশন থেকে বেরিয়ে রাস্তা পার হল তন্ময়। সাদা লেগিনস পরা ভরাট শরীরের তরুণী তন্ময়ের আগে আগে রাস্তা পার হল। চোখ আটকে গেল তন্ময়ের। আর তখনই পেছন থেকে কেউ ডেকে উঠল —এই যে দাদা!

কে কাকে ডাকল দেখতে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল তন্ময়। তাকিয়েই অবাক। সবুজ সিন্থেটিক শাড়িতে শ্যামলা রঙ আরও ঘন হয়ে রহস্য সৃষ্টি করেছে। ঝকঝকে দাঁত ছড়িয়ে হাসল সুমি। লাল টিপ, হাতের ইমিটেশন চুড়ি। সুমি ভারি লাবণ্যময়ী হয়ে উঠল তন্ময়ের কাছে। এ যে বৈষ্ণব পদাবলীর জ্যান্ত প্রতিমা! ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি/অবনী বহিয়া যায়/ঈষৎ হাসির তরঙ্গহিল্লোলে মদন মুরছা যায়।

—এখানে কোথায়?

—এখানেই একবাড়িতে পেশেন্টের দেখাশোনা করি। বেডসোর হয়ে গেছে!

—পেশেন্ট? মানে?

—মানে দাদা, আমি তো টালিগঞ্জের 'সেবিকা' নামের আয়া সেন্টারে চাকরি করি। পেশেন্টের দেখাশোনা সেবা, সঙ্গে সঙ্গে থাকা। আজ আমার নাইট ডিউটি ছিল। এখন বাড়িতে ফিরছি। ফের হাসল সুমি -

আপনি অফিসে যাচ্ছেন? ছাতা নেন নি? খুব রোদ আজ! বলতে বলতে শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ মুছে নিল সুমি। নিতে নিতে ক্লান্ত চোখে হাসল-রাতে ঘুম হয় নি। অনেক রাত অব্দি পেশেন্ট জেগে ছিল। কথা বলছিল। শুনছিলাম। ওদের কথা শুনলে ওঁরা খুশি হন। এতে রোগ সেরে যায় তাড়াতাড়ি। মনটাই সব। বলুন?

—হ্যাঁ, সুমি, আপনার সঙ্গে কথা আছে। আপনি নাইট ডিউটি করেন, তাহলে ছটা সাড়ে ছটা নাগাদ মেট্রো স্টেশনে আসতে পারবেন? একটু দরকার ছিল। তন্ময় হাতে চাঁদ পাওয়া কাকে বলে বুঝতে পারল এই মুহূর্তে —আসলে, আপনাকে আমার খুব দরকার।

—পারব দাদা। আমি চলে আসব। সুমি হেসে ঘাড় নেড়ে বিদায় নিল। তন্ময় দাঁড়িয়ে পড়ে চলে যাওয়া সুমির দিকে তাকিয়েছিল। ভরাট শরীরের সুমি শরীরের কদর বোঝে। কেমন সুন্দর করে হাঁটছে! সত্যি, অদরকারে পড়ে থাকে হীরে মুক্তো। যার মূল্য কেউ বোঝে না! একে অপচয় ছাড়া আর কী বা বলা যায়?

আজ অফিসে নানা কাজের ফাঁকফোকরে সুমির হেঁটে চলে যাওয়াটা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিল তন্ময়। সুমি নাইট ডিউটি করে। অনন্যার আয়া জবা ডে ডিউটিতে আছে। নাইটে একজন থাকলে তন্ময় স্বস্তি পায়। সোজা হিসেব। আসুক না সুমি! তন্ময় বড্ড একা! অনন্যার প্রতি কোনও অন্যায় তো করছে না তন্ময়! সম্পূর্ণভাবে অনন্যার দিকে সজাগ থেকে যদি নিজেকে খানিকটা দেখে, তাহলে দোষ কোথায়? কিচ্ছু দোষ নেই! সুমিকে ভাল লাগে ওর। সে কথা নিজের কাছে আর লুকনো নেই। তাছাড়া একটু চা করে দিল, কি অনন্যাকে দেখাশোনা করল! এইটুকুই তো! সুমি হাসিখুশি। ঘর বড় অন্ধকার হয়ে আছে। এস সুমি। একটু আলো জ্বালো। এইটুকু মাত্র। তন্ময় অন্তত সেটাই মনে করে। দিনের শেষে একটা হাসিমুখ দরজা খুলে দেবে, কোন পুরুষ সেটা চায় না?

আজ বড্ড উত্তেজিত লাগছে। অযথাই অফিসের অনিমেষের সঙ্গে চেঁচিয়ে হেসে কথা বলতে ভাল লাগল। অনিমেষ একটু অবাক হয়েছে বুঝেও নিজেকে সামলাতে পারল না তন্ময়।

***

জবা গা স্পঞ্জ করে দিতে দিতে অনন্যাকে খেয়াল করছিল। অন্যদিন অনন্যা কথা বলে। অস্বস্তিগুলো নিয়ে আলোচনা করে। চুল আঁচড়ে দেয় জবা। অনন্যা আয়নায় মুখ দেখে। টিপ পরিয়ে দিতে বলে। আজ কিচ্ছু বলছে না। জবা অনন্যার অন্যমনস্ক মুখটা লক্ষ্য করেই কথা বলতে শুরু করল —বউদি, আজ কি চুলে

কে কাকে ডাকল দেখতে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল তন্ময়। তাকিয়েই অবাক। সবুজ সিন্থেটিক শাড়িতে শ্যামলা রঙ আরও ঘন হয়ে রহস্য সৃষ্টি করেছে। ঝকঝকে দাঁত ছড়িয়ে হাসল সুমি। লাল টিপ, হাতের ইমিটেশন চুড়ি। সুমি ভারি লাবণ্যময়ী হয়ে উঠল তন্ময়ের কাছে। এ যে বৈষ্ণব পদাবলীর জ্যান্ত প্রতিমা!

একটু তেল দেব? তেল দিয়ে জল ঠেসে দিহ? আরাম পাবে দেখ বউদি।

—না, থাক, ভাল লাগছে না রে! আমার ঘুম পাচ্ছে। আজ খাব না। শুয়ে পড়ব। ডাকিস না। ঘুমোতে দিস। অনেকগুলো কথা একসঙ্গে বলে হাঁপিয়ে ওঠে অনন্যা। জবা কথা বাড়ায় না। দাদা এলে বউদির শরীরের কথাটা জানাতে হবে। মনে হচ্ছে বউদির শরীর ভাল ঠেকছে না। ইউটেরাসে সিস্ট হয় অনেক মহিলারই। তাই বলে এমন ঝিমিয়ে পড়তেও কাউকে দেখেনি জবা। বউদি ধীরে ধীরে বেশ ঝিমিয়ে যাচ্ছে। আজ একটু বেশি যেন। ওষুধ ঠিকঠাক খেয়েছে তো দিনের বেলা? দিনের ওষুধ অনন্যার বেডসাইড টেবিলে রাখা থাকে। ও একাই খেয়ে নেয়। আজ কি খেয়েছে? জবা টেবিলের কাছে গিয়ে বক্স খুলে দেখে। না, যা ভেবেছে, তাই। বউদি ওষুধ খায়নি! দাদা ফিরলে বলতে হবে।

—জবা, আমার পায়ে খুব ব্যাথা করছে। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। একটু মাসাজ করে দেবে?

জবা খুশি হল। যা হোক, নিজে থেকে কথা তো বলেছে বউদি। তাড়াতাড়ি করে ভিটামিন তেল দিয়ে মাসাজ করতে বসে গেল। অনন্যার ফর্সা পা দুটো জবার হাতের ছোঁয়ায় আরাম পাচ্ছিল। অনন্যার চোখ বুজে আসছিল। জবা বেশ খানিকক্ষণ মাসাজ করে আস্তে অনন্যার পা দুটো বিছানার ওপর নামিয়ে রাখল। অনন্যা ঘুমিয়ে পড়েছে। জবা অনন্যার গায়ের ওপর হালকা চাদর টেনে দিল। ঘুমোক বউদি। ততক্ষণে জবা টিভি অন করে সোনার সংসার সিরিয়ালটার শেষটুকু দেখে নেবে। দাদা অফিসে চলে গেছে। এতবড় ফ্ল্যাট নিঝুম হয়ে আছে পুকুরের তলের মত। মাঝে মাঝে রাস্তা দিয়ে একটা দুটো বাইক বা গাড়ি চলে যায়। পুকুরের তল থেকে যেন মাছ ঘাই মেরে ওঠে। জবা লিভিং রুমের টিভি অন করেও ফের অফ করে সুইচ। এই টিভি ধরা বারণ আছে। বউদির ঘরের টিভি দেখার অনুমতি দিয়েছে দাদা। অথচ বউদি এখন ঘুমোচ্ছে। টিভির শব্দে জেগে যাবে। জবা উঠে অনন্যার ড্রেসিং ইউনিটের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। দামি ক্রিমের কৌটো খুলে হালকা করে ক্রিম তুলে নিল। গালে ঠোঁটে ভাল করে ঘষল। এতবড় ফ্ল্যাটে নিজেকে রানি বলে মনে হয়। ফ্রিজ খুলে খাবার বের করে। অনন্যা ঘুম ভেঙ্গে খাবার খাবে। তখন মাইক্রোওভেনএ খাবার গরম করে নেবে জবা। এরকমই চলছে গত ছ'মাস ধরে। এখন বসে থাকা ছাড়া কাজ নেই। জবা জানালা খুলে দিল। দিতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল হাওয়া। জানালার লম্বা লম্বা পর্দাগুলো হুটোপাটি জুড়ে দিল। ঠিক একটার সময় তন্ময় ফোন করে রোজ। জবা সেটুকু সময় অপেক্ষা করে। ল্যান্ডফোন বেজে উঠতেই রিসিভ করল জবা —হ্যাঁ, বউদি ঘুমোচ্ছিল। এখন ডেকে তুলে খাওয়াচ্ছি।

—ওষুধপত্র ঠিকঠাক দেখে দিও।

—হ্যাঁ দাদা। জবা ফোন রেখে দিল। ফের অনন্যাকে খাওয়াতে বসল। অনন্যা ফেলে ছড়িয়ে খাচ্ছে। জবা মৃদু শাসন করল —এভাবে খেলে শরীর সারবে?

খাওয়া হলে অনন্যার মুখ ধুইয়ে দিল জবা। পিঠের নীচে বালিশ দিয়ে বসাল। ড্রেসিং ইউনিট থেকে পিঙ্ক কালারের নেইলপালিশ এনে অনন্যার পায়ের নখে লাগাল। অনন্যা মন দিয়ে দেখছিল ওর কাজ। একটু শ্বাস ফেলল —এসব কেন করছিস জবা! কী আর হবে এসব করে!

—তা বললে হবে বউদি? শরীর থাকলে খারাপ হবে। ফের ভাল হয়ে যাবে। দেখ, নেলপালিশ লাগিয়ে তোমার পা দুটো কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে! জবা একটু বডি লোশন দিয়ে পায়ের পাতা দুটো মাসাজ করে দিল। অনন্যা অন্যমনে নিজের পায়ের পাতার দিকে তাকিয়েছিল। কিছু ভাবছিল। জবা নিজের মনে বকবক করে যাচ্ছিল। অনন্যা কিছুটা শুনছিল, কিছুটা নয়। জবা বোধহয় কোনও প্রশ্ন করেছিল। অনন্যার দিক থেকে সাড়া না পেয়ে তাকিয়ে দেখল অনন্যা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে কী দেখছে। একটা পাখি। পাখিটা জানালায় বসেই ফুড়ুৎ। অনন্যা হেসে উঠল —ওটা কী পাখি রে জবা?

অনেকদিন পরে বউদিকে হাসতে দেখে জবা খুশি হল। উঠে জানালার বাইরে গলা বাড়িয়ে পাখিটাকে খুঁজল। পাখি জবার পেশেন্টকে হাসিয়ে দিয়ে চলে গেছে। গেল কোথায়? জবা পাখি খুঁজে না পেয়ে মাথা ঢুকিয়ে নিচ্ছে, তখনই দেখল একটা উবের চলে যাচ্ছে। ভেতরে কি চেনা কাউকে দেখল জবা? কে? খুব চেনা চেনা! কে বাড়ির সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে উবের চেপে! ভাল করে দেখতে যাচ্ছিল জবা, কিন্তু গাড়ি ততক্ষণে হাপিস হয়ে গেছে। হয়ত ভুল দেখেছে। বউদিকে কিছু না বলাই ভাল। জবা পেছন ফিরে দেখল অনন্যা ঘুম চোখে জবাকে দেখছে। জবা আস্তে আস্তে শুইয়ে দিল অনন্যাকে। চোখের সামনে উবের চলে যাচ্ছিল। জবা ফের জানালায় উঁকি দিল। গাড়িতে কি এ বাড়ির দাদা ছিল? এ বাড়ির দাদা কেন থাকবে! কিন্তু খানিকটা এ বাড়ির দাদার মত সাইড ফেস।

গাড়িটা খুব আস্তে চলছিল এই ফ্ল্যাটবাড়ির সামনে দিয়ে। যেন বাড়িটাকে দেখতে দেখতে যাচ্ছে! সত্যি

বাবা, কে ছিল গাড়িতে!

মনটা উদবিগ্ন হয়ে থাকল সারাদিন। কী যে হয় মাঝে মাঝে! একটা গাড়ি দেখে সব তালগোল পাকিয়ে গেল!

***

মেট্রো স্টেশনে পৌঁছে ফ্যানের নীচে দাঁড়াল তন্ময়। টিভি স্ক্রিনে বিজ্ঞাপন দেখাচ্ছে। ঘড়ি দেখল তন্ময়। সাড়ে ছ'টা। সুমির এসময় চলে আসার কথা। দেরি করছে কেন! সুমি মেট্রোতে যাতায়াত করে না নিশ্চয়। হয়ত বাসে আসছে। তাই খানিক দেরি হচ্ছে। তন্ময় দেখা করতে বলেছে, অথচ সুমি আসবে না, এটাও হতে পারে না। সুমি আসবেই! তন্ময় একটু ভেবে এক্সিট দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। সুমিকে না হলে টিকিট কেটে ভেতরে যেতে হত।

বাইরে এসে দাঁড়াতে সুমিকে দেখতে পেল তন্ময়। হলুদ কালো প্রিন্টেড শাড়ি, কালো ব্লাউজ, চওড়া ক্লিপে খোঁপা আটকে আছে। শুভ্র হাসি ছড়িয়ে ডাকল —এই যে দাদা! আমি এসে গেছি।

তন্ময় আগেই দেখেছে ওকে। ও হাত দেখিয়ে এগিয়ে গেল। সুমি আজ বেশ পরিপাটি করে সেজেছে। তন্ময় মুগ্ধ হয়ে গেল। সুগন্ধী হয়ে এসেছে সুমি। সস্তা পারফিউম ইউজ করেছে। একটু চড়া গন্ধ। ঠোঁটে ন্যাচারাল কালার লিপস্টিকের ছোঁয়া। গলায় মোটা মোটা পুঁতির মালা।

—আসুন, বাইরে গিয়ে কথা বলি। তন্ময় রাস্তা ক্রস করে বড় বড় পা ফেলে। সুমি দ্রুত পাশাপাশি হাঁটে। তন্ময় ফলের দোকানগুলোর গা ঘেঁষে থাকা চায়ের দোকানে দাঁড়াল। দু ভাঁড় চা নিয়ে খানিক দূরত্বে চলে গেল সুমিকে নিয়ে। সুমি তন্ময়ের দিকে তাকিয়ে হাসল। কথা বলল না। তন্ময় অস্পষ্ট ভাবে বুঝে ফেলল সুমি যথেষ্ট বুদ্ধিমতী।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সুমিকে লক্ষ্য করল তন্ময়। কথাটা বলতে হবে। আসলে, তন্ময়ের ওয়াইফ খুব অসুস্থ, একজন নাইটের আয়া ওর দরকার। সুমি যখন এই কাজ করছেই, তখন সুমি কি তন্ময়ের কাজটা করতে পারবে? ভাঁড়ের চা কখন শেষ হয়ে গেছে। খেয়াল হতেই ভাঁড় ছুঁড়ে ডাব্বায় ফেলে দিল তন্ময়। সুমি চুপচাপ চা খাচ্ছে মুখ নীচু করে। তন্ময়ের কথাগুলো শুনেছে। হয়ত ভাবনা চিন্তা করছে নিজের সঙ্গে। চোখ নামিয়ে রেখেছে। নজর মাটির ভাঁড়ে। কিন্তু মন অন্য দিকে। এমন কী ভাবছে সুমি? তন্ময় লক্ষ্য করছিল সুমিকে। সুমি বুঝতে পারছে যে তন্ময় ওকে দেখছে। কিন্তু ভাবে সেই বুঝে ফেলাটা প্রকাশ করছে না। কেবল ওর চোখের পাতা পড়ার ধরণে তন্ময় বুঝতে পারছিল যে, সুমি ওকে ভাবছে। তন্ময়কে ভাবছে। তন্ময়ের কথাগুলো নিয়ে ভাবছে।

তন্ময় কিছুক্ষণ অবজার্ভ করল সুমিকে। ঠিকঠাক স্টেপ ফেলতে হবে। মাছ জালে বন্দী হল কিনা বোঝা যাচ্ছেনা এখনও। দেখা যাক।

—আপনার বাড়ি কোথায় দাদা? সুমি ভাঁড় ফেলে এসে দাঁড়াল —আমার সেন্টার টালিগঞ্জে।

—আমার ফ্ল্যাট বাঁশদ্রোণিতে। আপনাকে পেছনে যেতে হবে।

—হ্যাঁ। বেশ, এখন দশদিন পরে আমার বিল হবে। তারপরে আপনার ডিউটি করতে পারব। দশদিন হতে আর দু'দিন বাকি আছে। সুমি হলুদ-কালো ছাপা শাড়ির আঁচলে মুখ মুছল —এখন যেখানে ডিউটি করছি, সেখানকার কাজটা ছেড়ে দিতে হবে। বলেই ধবধবে হাসি ছড়ালো সুমি —দু'দিন দেরি হলে অসুবিধে হবে?

তন্ময়ের বুকে আনন্দের দামামা বেজে উঠল। সুমি আসছে ওর ফ্ল্যাটে! হলুদ-কালো ছাপা শাড়ি থেকে অচেনা বিজাতীয় ফুলগুলো তন্ময়ের দিকে তাকিয়ে খুশিতে মাথা দুলিয়ে উঠল। খুব হাওয়া বইছে ওদের গায়ের ওপর দিয়ে। হাওয়ায় ফুলের পাঁপড়িগুলো উড়ে যায় আর কি! বলতে বলতে সুমির শাড়ি জুড়ে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল, যাঃ! সুমি ভিজে যাচ্ছে। ওর শরীরে ফুল ফুটে উঠছে একটা দুটো তিনটে।

সুমিকে নিয়ে অনেকটা রাস্তা এলোমেলো ঘুরে বেড়াল তন্ময় আজ। সুমি মুখে কিছু বলছে না, কিন্তু চোখে কৌতূহল টিপটিপ করছিল। হয়ত এই ধরনের পরিস্থিতি ওর জীবনে হরদম আসে! তন্ময়ের পাড়াতেই অলয় সোম আছেন। স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা হয় না। স্ত্রী থাকেন শ্যামবাজারের পৈত্রিক ফ্ল্যাটে। অলয় সোম বাঁশদ্রোণিতে আয়া নিয়ে থাকেন। ঝুল বারান্দায় বসে পূর্ণিমার রাতে দুজনে চাঁদের আলো উপভোগ করেন। একসঙ্গে বেড়াতে যান। রেস্তোরাঁয় খেতে যান। কিচ্ছু অসুবিধে নেই। লোকে কতদিকে আর নজর দেবে? যে যার নিজের নিজের ধান্দায় ব্যস্ত। সুমির জীবনে নিশ্চয় এই রকম হাজারো অলয় সোম আসে, আছে। তন্ময় একটু হাসিখুশি মস্ত যাপন কাটাবে। এতে কার বা কী বলার থাকতে পারে?

পাকা কথা হয়ে গেল। পরশুর পরের দিন সুমি যাচ্ছে তন্ময়ের ফ্ল্যাটে। নাইট ডিউটি। তন্ময় নিজের অ্যাড্রেসটা ভাল করে লিখে বুঝিয়েও দিল সুমিকে। সুমি ব্যাগে ঠিকানা লেখা কাগজটা ঢুকিয়ে নিল। এবারে ও যাবে।

তন্ময়ও যাবে বাড়িতে। ওর অসুস্থ বউ অপেক্ষা করে আছে। দুজনে দুদিকে চলে গেল। যদিও দুজনের মন গিঁট বেঁধে আটকে রইল কোন একজায়গায়!

***

জবার ফোনটা দুবার বেজেই থেমে গেল। অনন্যার চুল আঁচড়ে দিচ্ছিল জবা। চিরুনি রেখে ফোন রিসিভ করতে করতেই ফোন কেটে গেল। অচেনা নম্বর! জবা বিশেষ পড়াশোনা জানে না। কিন্তু ফোনের নম্বরগুলো অদ্ভুতভাবে বুঝে যায়। অনন্যা একটু আগে ওষুধ খেয়েছে। ওর ঘুম ঘুম পাচ্ছিল। জবা অন্যমনস্ক হাতে বিনুনি বেঁধে দিচ্ছিল। এই ফোনটা গতকালও এসেছিল। কেউ কি ইচ্ছে করে মিসড কল দিচ্ছে? কেন? কার কীসে লাভ? জবা এমন কাউকে চেনে না যে জবাকে ইয়ার্কি করে ফোন করে করে বিরক্ত করবে! চুল আঁচড়ে বিনুনি বেঁধে কটন গোলাপ জলে ভিজিয়ে মুখে মুছিয়ে দিল অনন্যার। টিপের পাতা থেকে ছোট টিপ তুলে দুই ভ্রুর মাঝে বসিয়ে দিল। অনন্যা চুপচাপ সেজে নিল। কোন প্রতিবাদ করে না ও। এখন অনন্যা খানিকক্ষণ ঘুমোবে। জবা সমস্ত ফ্ল্যাটময় ঘুরে বেড়াবে। অন্যদিন আয়নায় নিজেকে দেখে। একটু ক্রিম মাখে। টিভি দেখে লো ভলিউমে। আজ কিছু ভাল লাগছিল না। বারান্দায় উঁকি দিল দু একবার। গতকাল উবের চেপে কেউ গিয়েছে এই আবাসনের সামনে দিয়ে। কাকে যে দেখেছে গাড়িতে, জবা মনে করতে পারে না কিছুতে।

দরজায় বেল বাজল। এসময় কে এল! জবা ভয় পেল। এসময়ে কখনও কেউ আসে না। অন্তত জবা ডিউটিতে আসার পর থেকে কখনওই কাউকে এই সময়ে আসতে দেখে নি। দরজা খুলবে জবা? দাদাকে একটা ফোন করে পারমিশন নিয়ে তারপরে দরজা খোলা উচিত মনে হচ্ছে। ফোনটা বের করতে যেতেই ফোন বেজে উঠল জবার। দাদার ফোন। দাদা মানে তন্ময়! দাদা এখন ফোন করছে! কেন?

ফোন অন করতেই তন্ময়ের গলা —জবা, দরজা খোল।

জবা অবাক হলেও স্বস্তি পেল। যাই হোক, দাদা এসেছে যখন, ভাবনা নেই। ও তাড়াতাড়ি করে দরজা খুলে দিল। তন্ময় এক মহিলাকে নিয়ে এসেছে। এই মহিলাকে জবা আগে কখনও দেখেনি। বস্তুত এই বাড়িতে আসার পরে দাদা-বউদি ছাড়া তৃতীয় কাউকে দেখেনি জবা। মাঝে মাঝে বউদির কাকিমা, এক পিসি ফোন করে। সেও বিলেত থেকে। জবা সরে দাঁড়িয়ে ওদের ঢোকার রাস্তা করে দিল।

তন্ময় সমস্ত ফ্ল্যাট ঘুরিয়ে দেখাল সুমিকে। আজ বাড়ি চেনাতে নিয়ে এসেছে। আগামীকাল থেকে কাজে নেমে পড়বে সুমি। জবা নাইটের আয়াকে দেখে খুশি হল না। ওর একচ্ছত্র আধিপত্যে কাঁটা ফুটেছে যেন। তবে অতিথি সৎকারে অবহেলা করল না। চা বানাল যত্ন করে। ঘন্টাখানেক থেকে, অনন্যার সঙ্গে ভাব করে চলে গেল সুমি। বাড়িতে স্বামী আছে। খিটখিটে, মদ্যপ। বেশি দেরি করে বাড়ি ফিরলে সে নাকি সাঙ্ঘাতিক রেগে যাবে। সুমি দ্রুত নেমে গেল। তন্ময় সঙ্গে গেল এগিয়ে দিতে। এদিকের রাস্তা ঘাট চিনিয়ে দেওয়া থাকলে সুমির পক্ষে সময় মেপে আসা-যাওয়া করা সুবিধে।

ওরা চলে যেতেই ফের সুনসান ফ্ল্যাট। এসি মেসিনের লুজ কানেকশনের জন্য একটা শব্দ হচ্ছে অনেকক্ষণ ধরেই। জবা চা নিয়ে অনন্যার কাছে এসে বসল। অনন্যা চুপ করে শুয়ে আছে। জবার সাড়া পেয়ে চোখ খুলল —ওরা কি চলে গেছে ?

—হ্যাঁ বউদি। এই মাত্র গেল। ভালই হল। নাইটে তোমাকে দেখার লোক থাকা দরকার।

অনন্যা কথার জবাব দিল না। জবা অনন্যাকে মাসাজ করল কিছুক্ষণ। অনন্যার ঘুম পাচ্ছে। চোখ বুজে আছে ও। জবা হালকা চাদর অনন্যার গায়ে ঢেকে দিল। ঠিক তখনই জবার ফোন বেজে উঠল। জবা ফোন রিসিভ করতে ওপাশে কেউ নিশ্চুপ হয়ে আছে টের পেল। শ্বাস প্রশ্বাসের আওয়াজ পাচ্ছে জবা। কেউ যেন মন দিয়ে জবার গলার স্বর শুনছে। জবা বারবার 'হ্যালো, হ্যালো' করে অবাক হয়ে গেল। লাইন কাটেনি! কেউ ওপাশে চুপ করে জবার গলা শুনে যাচ্ছে। ওপাশে কে? নারী না পুরুষ? কে জবার সঙ্গে ইয়ার্কি করছে? জবা যে এতবার হ্যালো হ্যালো বলে যাচ্ছে, ওপাশে যে-ই থাকুক, সে শুনছে, অথচ কোনও সাড়া দিচ্ছে না! জবা বিরক্ত হচ্ছিল। এ কী রে বাবা! ফোন করেছিস, তো কথা বলছিস না কেন রে? কিছু চাই কি তোর? জবা বিরক্তির পাশাপাশি ভয়ও পাচ্ছিল। এরকম কেন হচ্ছে! এই আবাসনে গত দুমাস ধরেই কাজ করছে জবা। কখনও কোন ঝামেলা হয়নি। নাঃ, ব্যাপারটা দাদাকে জানাতে হবে। ফোন রেখে জানালা-দরজা চেক করল জবা। সব বন্ধই আছে। পাশের ঘর হল দাদার লাইব্রেরি রুম। প্রচুর বই সাজানো ওয়াল ক্যাবিনেট জুড়ে। ঘরটা বন্ধই থাকে। সীমা নামের একটি বউ ঠিক সকাল আটটায় আসে ঝাড়পোঁছ করতে। তখন লাইব্রেরি রুমটা খোলা হয়। এখন যেমন বন্ধ আছে। জবা আস্তে আস্তে ঘুরে ঘুরে পুরো ফ্ল্যাট দেখছিল। লাইব্রেরিরুমের পাশ দিয়ে আসার সময় মনে হল ভেতরে কেউ সরে গেল। একটা আবছা ছায়া নড়াচড়া করলে বন্ধ ঘরের বাইরে থেকেও তার উপস্থিতি বেশ টের পাওয়া যায়। এখন যেমন জবার মনে হচ্ছে ওঘরের ভেতরে কেউ

আছে। হালকা পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। জবা ভয় পেল। ভেতরে বেড়াল ঢুকেছে ঠিক। কিন্তু কখন ঢুকল! জবা তাড়াতাড়ি করে অনন্যার কাছে চলে এল। অনন্যা চোখ বুজে পড়ে আছে। জবা ইচ্ছে করে জোরে ডাকল —বউদি, বউদি, ঘুমোচ্ছ নাকি?

আস্তে চোখ খুলে তাকাল অনন্যা। অল্পক্ষণ তাকিয়ে দেখল জবাকে। যেন চিনতে পারছে না। পরক্ষণে হাসির রেখা ঠোঁটে এঁকে দিল —কী হল জবা? একা একা ভাল লাগছে না? একটু শুয়ে থাকো।

অনন্যার হাসি মুখ দেখে স্বস্তি এল জবার মনে। একা একা থাকলেই যতসব আজগুবি ধারণা মাথায় চেপে বসে। ও একটু হাসল —হ্যাঁ বউদি, একা একা ভাল লাগে না। কথা বল। গল্প করো দেখি। সারাক্ষণ কেন চোখ বুজে থাকো?

—হ্যাঁ, কথা বল। আজ নতুন মেয়েটা আসবে না?

—আজ আসবে?

—হুম, ও আমাকে সেটাই বলে গেল।

—যাক, ভালই হল বউদি। দরকারে ডেকে নেবে। এই তোমার খাটের পাশে মেঝেতে ওর শোয়ার ব্যবস্থা করো। তাহলেই ডাকাডাকি করতে অসুবিধে হবে না। আর আমি তো সকালেই চলে আসছি। এস, তোমার পা টিপে দিই।

এখন বিকেলের ছায়া ফ্ল্যাটের মধ্যে খুব আস্তে আস্তে ঢুকে পড়ছে। ঘরের রঙ পালটে যাচ্ছে। দরজার পর্দাগুলো নিশ্চল হয়ে আছে। আলো কমে আসছে ঘরের ভেতরে। আসবাবপত্রের ছায়া ঘন হয়ে উঠছে। জবা বেসিনে হাত ধুচ্ছিল। লাইব্রেরি রুমের ভেতরে হালকা ছায়া সরে যেতে দেখল ও। কে আছে ভেতরে?

***

সাতদিন হল সুমি ডিউটিতে ঢুকেছে। অনন্যা সুমিকে পেয়ে খুশি কিনা বোঝা যায় না। তবে সুমির কর্তব্যে ত্রুটি নেই। রাতে অনন্যা ঘুমিয়ে পরলে তন্ময়ের জন্য কালো কফি নিয়ে আসে সুমি। ব্যালকনিতে বসে কফি খায় তন্ময়।

এখন তন্ময় জমিয়ে বাঁচছে। অফিস যাওয়ার সময় সুমির সঙ্গেই বেরিয়ে যায়। জবা বাকিটা সামলে নেয়।

সেদিন তন্ময় আর সুমি বেরিয়ে গেলে জবা অনন্যার খাবার তৈরি করে। অনন্যাকে স্নান করতে সাহায্য করে। ভেজা চুল আঁচড়ে দেয়। জামাকাপড় চেঞ্জ করতে সাহায্য করে জবা। অনন্যা চা আর ঝুরিভাজা খেয়ে ঘুমিয়ে নেয়। সেদিন অনন্যা ঘুমিয়ে পড়লে জবা নিজে ফ্রেস হয়ে নিল। চুল বেঁধেছে সবে, ডোর বেল বেজে উঠেই বন্ধ হয়ে গেল। জবা বুঝল তন্ময় এসেছে। সেদিনের মত। দরজা খুলতেই একটা শক্ত হাত মুখ চেপে ধরল জবার। মাখনে ছুরি চালানোর মত করে গলার নলি কেটে দিল। জবা চিৎকার করার সময় পেল না। দলা পাকিয়ে পড়ে গেল মেঝের ওপর। অনন্যা গভীর ঘুমে মগ্ন। তখন কেউ একজন ঘরে ঢুকে আলমারি হাটকে মাটকে দেখল। ব্যাগে মাল গুছিয়ে ঢুকে পড়ল লিফটে।

জবার শরীর নড়েচড়ে উঠল। ধোঁয়াটে ধূসর রঙ চোখের চারপাশে নেচে বেড়াচ্ছে। হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে উঠল জবা। দু' হাতে গলা চেপে ধরে দরজার বাইরে এল। পাশের ফ্ল্যাটের ডোর বেলে আঙুল চেপে ধরে রাখল জবা। এই ফ্ল্যাটে একটি পরিবার থাকে। দরজা ঠিক কেউ খুলবে। সত্যি তাই হল। দরজা খুলে দাঁড়াল ফর্সা লম্বা বউটি। জবার সমস্ত শরীর রক্তে মাখামাখি। কোন রকমে ইশারায় নিজের গলাটা দেখাল জবা। তারপরে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। কাটা কলাগাছের মত লুটিয়ে পড়ল বউটির পায়ের কাছে। আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল বউটি। দু' হাতে মুখ চেপে ধরে গোঙাতে শুরু করল। ফ্ল্যাটের ভেতর থেকে কারা ছুটে আসছে।

তন্ময়কে ফোন করেছে আবাসন থেকে। তন্ময় বিভ্রান্ত হয়ে ছুটে এসেছে। এসে কিছু চিনতে পারছিল না। পুলিশ এসেছে। জবাকে কলকাতা মেডিক্যালে ভর্তি করা হয়েছে। ফ্ল্যাটের ডাইনিং, বেডরুম, কিচেনে চাপচাপ রক্ত। দরজার কাছে কাচের চুড়ির ভাঙা টুকরো পড়ে আছে। অনন্যা ভীত বিহ্বল চোখে বিছানার ওপর বসে আছে। ওর সামনে একটা প্লেটে ঝুরিভাজা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে।

পাশের ফ্ল্যাটের সুনেত্রা দত্ত জানিয়েছে ডোর বেল বেজেই চলেছিল। দরজা খুলেই দেখে জবা গলা চেপে দাঁড়িয়ে। হাতের ফাঁক গলে রক্তের ধারা নেমে আসছে। কথা বলতে পারেনি জবা। পড়ে যায় দরজার মুখে।

সাধারণভাবে লুটপাটের উদ্দেশ্যে জবাকে খুন করা

জবা আস্তে আস্তে ঘুরে ঘুরে পুরো ফ্ল্যাট দেখছিল। লাইব্রেরিরুমের পাশ দিয়ে আসার সময় মনে হল ভেতরে কেউ সরে গেল। একটা আবছা ছায়া নড়াচড়া করলে বন্ধ ঘরের বাইরে থেকেও তার উপস্থিতি বেশ টের পাওয়া যায়। এখন যেমন জবার মনে হচ্ছে ওঘরের ভেতরে কেউ আছে। হালকা পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। জবা ভয় পেল।

হয়েছে বলে মনে করছে পুলিশ। কিছুদিন ধরে জবাকে নজরে রাখা হচ্ছিল। এই সময়ে ফ্ল্যাটে কেউ থাকে না। একজন অসুস্থ মহিলা, আর একজন আয়া।

তন্ময় জবার সেন্টারে খবর দিয়েছে। জবার স্বামী অসুস্থ। সে থাকে মুকুন্দপুরে। খবর পেয়ে সে আসছে। সুমিকে ফোন করল তন্ময়। বিভ্রান্ত ঘর, মানুষকে সামলাতে একজন শক্তমনের কাউকে দরকার।

সেকেন্ড ফ্লোরের অঞ্জলি বসু একটা তথ্য দিলেন। একটা তামাটে রঙের মারুতি গাড়ি আবাসনের সামনে রেখে দুজন যুবককে আবাসনের ভেতরে ঢুকতে দেখেছিলেন। বের হতে দেখেন নি।

আশ্চর্য ঘটনা হল এখানে নিরাপত্তারক্ষী নেই। কে ঢুকছে, কে বের হচ্ছে কিছুই জানা যায় না।

তন্ময়ের ওপর দিয়ে ক'টা দিন খুব ঝামেলা গেল। থানা পুলিশ চলছেই। কোন ট্রেস পাওয়া গেল না সেই মারুতি গাড়ির বা অচেনা অজানা যুবকদের। আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে পড়ল সব। অনন্যা ট্রমায় ছিল বেশ কিছুদিন। সুমির আদরযত্নে ও সেরে উঠেছে। এখন সুমি ছাড়া এ বাড়ি অচল।

সেদিন অনেক রাতে তন্ময়ের আদরের ঝড় সামলে সুমি মুখ গোঁজ করে রইল। তন্ময় অল্প অল্প নীলাভ আলোয় সুমির ধারালো মুখখানা নিবিষ্টমনে দেখছিল। কোঁকড়া চুল কপালের ওপর দিয়ে নেমে এসেছে। চোখ মেলে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে আছে সুমি। কী হল সুমির?

—এভাবে কতদিন? সুমি চোখ ঘুরিয়ে তাকাল তন্ময়ের দিকে —তোমার বউ সুস্থ হয়ে গেছে প্রায়। আমার এখানে থাকার মেয়াদ শেষ হয়ে এল। তুমি কিছু বল!

—আমি কী বলবো? তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে পারবে না এটাই জানি। ব্যাস। তন্ময় সুমিকে কাছে টেনে নেয়। সুমি ঝটকা মেরে উঠে বসল। চুলগুলো সাপটে ধরে উঁচু খোঁপা বেঁধে নিতে নিতে হিসহিস করে উঠল —আমার ব্যবস্থা কী করলে? সারাজীবন তোমার বউএর খিদমত খাটব? তুমি কি তাই ভেবেছ নাকি? তাহলে ভুল ভেবেছ। আমাকে খাটিয়ে মজা লুটে ছেড়ে দেবে, আমি সেটা হতে দেব না। আধো অন্ধকার ঘরের বিছানার ওপর বসে থাকা সুমিকে একটি পাইথন বলে মনে হল তন্ময়ের। কথা বলার তালে তালে চুল, শরীর দুলে দুলে উঠছে। ভয় ভয় করছে তন্ময়ের। সুমি স্রেফ আয়া সেন্টারের আয়াই নয়, ও যেন আরও কিছু।

সেদিন স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে রেখেছিল তন্ময়। কিন্তু নিজে ব্যাপারটা ভোলেনি। এরপর থেকেই সুমিকে খুব ভাল করে নিরীক্ষণ করা শুরু করে তন্ময়। শুক্রবার অফিসে গিয়েও কেমন অস্বস্তি নিয়ে ছিল সারাদিন। হাফডে কেটে বেরিয়ে এসেছিল কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই। অবচেতনে অস্বস্তি ধাক্কা দিচ্ছিল বলেই তন্ময় মন বসাতে পারছিল না কোনও কাজে। রাস্তায় এলোপাথারি ঘোরাঘুরি করছিল। সুমি কি চলে যাবে? অথবা অনন্যাকে তন্ময়ের সঙ্গে সম্পর্কের কথা বলে দেবে? বা আরও কিছু? যা-ই হোক, তন্ময় কি সুমিকে ছেড়ে থাকতে পারবে? ভাবতেই চমকে উঠল তন্ময়। অসম্ভব! নেতিয়ে পড়া জীবনে ফের বান ডেকেছে। সুমি নামক সুনামিকে ত্যাগ করে বাঁচতে পারবেনা তন্ময়।

অনেকক্ষণ পরে গরমের হলকা টের পেল তন্ময়। আকাশ ফেটে আগুন পড়ছে। শরীর হয়ে গেছে নিংড়ানো গামছার মত। জলশূন্য। চটপট খানিক হেঁটে শপিং মলে ঢুকে পড়ল তন্ময়। রেস্তোরাঁতে বসে কোল্ড কফিতে চুমুক দিতে যেতেই সুমিকে দেখল সুন্দর করে হেঁটে লিফটে ঢুকে যেতে। কালো পোশাকে খোলা চুলে রহস্যময়ী দেখাচ্ছিল ওকে। তন্ময় প্রথমে অবাক হয়ে গেলেও সামলে নিয়ে সুমিকে টার্গেট করে লিফটের দিকে এগিয়ে গেল। লিফট থার্ড ফ্লোরে গেছে। তন্ময় থার্ড ফ্লোরের বোতাম টিপে সেখানে নামতেই লম্বা কড়িডোর সামনে গা ছেড়ে শুয়ে আছে। কোথায় গেল সুমি?

এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে এগিয়ে যাচ্ছিল তন্ময়। করিডোরে বাঁক নিতেই কালো কাচের দরজাঅলা ফ্ল্যাটের সামনে এসে পড়ল তন্ময়। কী করবে ভাবছে, এমন সময় একজন মহিলা কাচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল। দেখাদেখি তন্ময়ও ঢুকে পড়ল। ভারি নরম আলো ছড়িয়ে আছে ঘরময়। বেশ কিছু নারী দাঁড়িয়ে আছে। একজন পুরোহিত, ঝরঝরে ইংরেজিতে মন্ত্রোচ্চারণ করে চলেছেন। পেছনে দাঁড়িয়ে তন্ময় চুপ করে দেখছিল। সুমি কোথায়? এখানে কি সুমি আছে? নাকি অন্য কোনওখানে আছে সুমি? এই আধো অন্ধকারে কারও মুখই ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। এখানে সকলেই কালো পোশাক পরে আছে। তন্ময় অধীর আগ্রহে ঝুঁকে পড়ে সকলের মুখ দেখতে চেষ্টা করছিল। মন্ত্রপাঠ শেষ হলে একজনকে সামনে আনা হল। খোলা চুলের মহিলাকে দেখে তন্ময় এই অল্প আলোয় সুমিকে চিনতে পারল। সুমিকে হাতে সুগন্ধী তেল দেওয়া হল। দুহাতে তেল মাখার পর সুন্দর গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল ঘরে। আজ সম্ভবত সুমির হিলিং সেশন। সুমি নিজের কথা বলছে। ওর হাজব্যান্ডের অত্যাচার, প্রেমিকের নড়বড়ে ভাব

সুমিকে ভীষণ ডিপ্রেশনে ঠেলে দিচ্ছে। বলতে বলতে কেঁদে ফেলল সুমি। তন্ময় সুমির কান্নার অর্থ বুঝতে পারছিল না। এখানে কী হচ্ছে? সুমি কাদের কাছে নিজের দুঃখের কথা বলছে? সবার অলক্ষ্যে ঘরটি থেকে বেরিয়ে এল তন্ময়। ও শুনেছিল এই শহরের বুকেই কোথাও কোথাও ডাকিনী বিদ্যার চর্চা হয়। পরিবেশ, পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে এটা ডাকিনী বিদ্যা-চর্চার কেন্দ্র। তাহলে সুমি কি ডাকিনী বিদ্যার চর্চা করে?

সেদিন রাতের ডিউটিতে এল সুমি। নীল ফুল ফুল শাড়ি, টান করে বাঁধা চুল সুমি একটু বিষাদগ্রস্ত যেন। মন ভার। অনন্যা সোফায় বসে সিরিয়াল দেখছিল। সুমি এসে বাইরের পোশাক ছেড়ে ঢিলেঢালা কাফতান পরে নিয়েছে। অনন্যার চোখ মুখ ভেজা টাওয়েলে হালকা করে মুছিয়ে দিল। চা বানাল। তন্ময়কে দিল। অনন্যাকে দিল। নিজে নিল না আজ।

***

অনন্যা অনেকক্ষণ হল ঘুমিয়ে পড়েছে। কম ডোজের ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয় ওকে। সুমি গা ধুয়ে অনন্যার কফি কালারের নাইটি পরে ,অনন্যার ফেস ক্রিম গালে ঘষতে ঘষতে ঘরে এল। চুল চুড়ো করে বাঁধা। ঝট করে সুমিকে দেখে অনন্যা বলে ভুল হয়ে গেল তন্ময়ের। নীলাভ আলোয় সুমিকে দেখে সেই অদ্ভুত ঘরে দাঁড়িয়ে থাকা সুমিকে মনে পড়ে গেল তন্ময়ের। কিছু কি জিজ্ঞাসা করা উচিত হবে? সুমি নিজে থেকে কিছু বলে নি। তন্ময় ওর ব্যাপারটা জেনে গেছে জানলে রেগে যেতে পারে। তন্ময় চুপ হয়ে গেল। উলটে সাদর আহ্বান জানাল অভিসারের সঙ্গীকে —এস, এই রাত তোমার আমার।

—আমাকে একটু সময় দিতে হবে। কিছুক্ষণ ধ্যান করব।

—ধ্যান? তুমি এসব জান?

জানি। ডিপ্রেশন কাটাতে আমাকে একটি সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়েছিল। সেখান থেকেই নির্দেশ পেয়েছি।

তন্ময় এই সুযোগ ছাড়ল না। সুমি আজ নিজেকে জাহির করতে চাচ্ছে। ভেতরের বিষয়টা এই ফাঁকে জেনে নেওয়া যেতে পারে।

—একটু বোঝাও আমাকে। তন্ময় এখন ভারি ছেলেমানুষ এক বিদ্যার্থী মাত্র।

সুমি আয়নার বিপরীতে দাঁড়াল —প্রত্যেকটি ধ্যান আমার কাছে উপাসনা। এই সময় আমি নানা শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করি মনে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য। এই শক্তি কখনও প্রাচীন আত্মা, কখনও প্রকৃতি, কখনও বা অদৃশ্য গাইড, যে আমাকে পথ দেখায়।

—তুমি কি উইকা? ডাইনি বিদ্যার সঙ্গে যুক্ত সুমি? কতদিন হল?

—বেশিদিন না। এখন আর কথা না। যাই, ধ্যানে বসি। বলে বারান্দার খোলামেলা গাছপালা সমন্বিত ঠান্ডা ঠান্ডা জায়গায় গিয়ে বসল সুমি। তন্ময় একটু দাঁড়িয়ে থেকে ঘরে চলে এল। আজ সুমিকে দেখে আয়া সেন্টারের সাধারণ আয়া বলে ভাবতে পারছে না। একটু কি ভয় ভয় করছে তন্ময়ের! মনে হচ্ছে এই সুমিকে জাস্ট ব্যবহার করার জন্য নিয়ে এসেছিল ঠিকই, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তন্ময় নয়, সুমি নিজেই তন্ময়কে বশীভূত করেছিল এ বাড়িতে নিয়ে আসার জন্য।

খানিকক্ষণ পরে সুমি ঘরে ঢুকল হাসি মুখে। চুল এখন খোলা। পরনের বসন অদৃশ্য। মোহময়ী, উন্মত্ত, কামার্তা এক নারী ডুবিয়ে দিচ্ছিল তন্ময়কে অজানা অমৃতলোকে। তন্ময় ডুবছে ডুবছে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে যাচ্ছে ওর। কেবল সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে সুমি নামক এক সাপিনীর শ্বাসের হলকা আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে আছে তন্ময়কে!

ভোর রাতে সুমি জাগালো তন্ময়কে। তখনও আলো ফোটেনি। রাস্তায় সিকিউরিটি গার্ডের বাঁশির জোরালো আওয়াজ ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে ভোরের স্নিগ্ধতা। সুমির ফিসফিসে কথা তন্ময়ের কানে স্পষ্ট হয়ে এল না। ঘুণপোকার মত কুরকুর করে ঢুকছিল। সুমি ভোরের নরম বাতাসে ফের নতুন করে খেলায় মেতে উঠল। ওর শরীর দুলছে, চুল উড়ছে, মুখে রহস্যময় হাসি। তন্ময় সুমির হাতের পুতুল যেন।

অনন্যা ডেকেছিল। ওরা কেউ শুনতেই পায়নি। অনন্যা বিছানা থেকে আস্তে আস্তে নেমে পায়ে রুম স্লিপার ঢুকিয়ে নিল। ঘরের ভেতরে আবছা আলো। অনন্যা ঘরের অন্যপাশে সুমির বিছানার দিকে তাকাল। সুমি নেই। তাহলে হয়ত বাথরুমে গেছে সুমি। বুঝে নিল অনন্যা। বারান্দার দিকের দরজা খুলে ভোরের দুনিয়াটা দেখছিল অনন্যা। কেমন নরম আলো ছড়িয়ে

আজ সম্ভবত সুমির হিলিং সেশন। সুমি নিজের কথা বলছে। ওর হাজব্যান্ডের অত্যাচার, প্রেমিকের নড়বড়ে ভাব সুমিকে ভীষণ ডিপ্রেশনে ঠেলে দিচ্ছে। বলতে বলতে কেঁদে ফেলল সুমি। তন্ময় সুমির কান্নার অর্থ বুঝতে পারছিল না। এখানে কী হচ্ছে? সুমি কাদের কাছেনিজের দুঃখের কথা বলছে? সবার অলক্ষ্যে ঘরটি থেকে বেরিয়ে এল তন্ময়। ও শুনেছিল এই শহরের বুকেই কোথাও কোথাও ডাকিনী বিদ্যার চর্চা হয়।

আছে। এখনও জেগে ওঠেনি জগত। পাখিদের কিচমিচ আমগাছের অন্দরমহলে। একটু একটু করে জাগছে প্রাণ। আজকের দিনটা কেমন অন্যরকম। কোথা থেকে অচেনা ফুলের গন্ধ আসছে। নাক ভরে শ্বাস নিল অনন্যা। তখনই পেছন থেকে ডেকে উঠল সুমি —তুমি উঠে পড়েছ! বাথরুমে যাবে? চল। নিয়ে যাচ্ছি।

নিয়ে যাচ্ছি! শব্দটা ঘরের মধ্যে ঘুর ঘুর করে। ছোট বিষাক্ত পোকার মত। কেন যে অনন্যা এই চমৎকার ভোরে কাঁচা রক্তের গন্ধ পেল! পেতেই মন বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। কে মেরেছে জবাকে? কেন মারল? মৃত্যু এমন হাহাকার নিয়ে আসে কেন! কোথায় চলে গেল জবা! কেমন সুন্দর করে চুল বেঁধে দিত! কত যত্ন করত।

—জবাকে কে মারল সুমি? কেউ কি ধরা পড়েছে? অনন্যা ঘাড় ঘুরিয়ে সুমির দিকে তাকাল —তুমি রাতে ঘুমোওনি? কেমন এলোমেলো দেখাচ্ছে!

—ঘুম হয়নি। আমিও জবার কথাই ভাবছিলাম। কেন যে মরতে হল ওকে! কারও পাকা ধানে মই দিয়েছিল ঠিক।

অনন্যা সুমির হাত ধরে ওয়াশরুমে যাচ্ছিল। একটা কথা মনে পড়ি পড়ি করেও পড়ছে না। কী কথাটা যেন কী যেন! যত্ন করে সুমি ওকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। দরজা বন্ধ করে বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে ঠান্ডা জলের ঝাপটা দিতে স্বস্তি এল। আয়নায় নিজের ক্লান্ত, দীর্ঘ অসুখের ছাপ ফেলা মুখটা দেখতে দেখতে কথাটা মনে হল অনন্যার। কেন যে মরতে হল জবাকে! কারও পাকা ধানে মই দিয়েছিল। মই দিলেই মরতে হবে? জবা কার পাকা ধানে মই দিয়েছিল? অনন্যা কি কারও পাকা ধানে মই দিয়েছে? না। যদি দিত, তাহলে ওকেও মরতে হত? ওই ভাবে? গলার নলি কেটে? উফ! জলে ভেজা মুখে আয়নার ভেতরের অনন্যার দিকে তাকিয়ে রইল অনন্যা। ভয় নয়, কেমন এক বিষাদ ঘিরে ধরেছে এই ভোরেই।

—হল বউদি? চা খাবে, না কফি? সুমি বাইরে থেকে ডাকছে।

অনন্যা আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল। একটু টলমল ভাব। ভেজা মুখ নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। হাতের টাওয়েল ঝুলছে মরা বেড়ালের মত।

সুমি অনন্যাকে ধরে ধরে ডাইনিং টেবিলে বসাল। তন্ময় চায়ের কাপ এগিয়ে দিল —আজ কেমন আছ?

—জবাকে কেন মরতে হল বলতো? কেই বা মারল? অনন্যার গলার স্বরে ভয় থিরথির করে —আমার বড় ভয় করছে!

— ভয় নেই। যান দাদা, বউদিকে নিয়ে কয়েকদিন ঘুরে আসুন। মনের চেঞ্জ দরকার। সুমি বিস্কুট এগিয়ে দিল অনন্যাকে। অল্প হেসে তন্ময়কেও বিস্কুট দিল।

অনন্যা বারান্দায় বসে পাখিদের রুটির টুকরো খাওয়াচ্ছিল। সুমি ঘর গুছিয়ে রাখছিল। তন্ময় পেছন থেকে জড়িয়ে ধরতেই সুমি নিস্পৃহ গলায় বলল —বউদিকে কোথায় নিয়ে যাবে ঠিক করেছ?

তন্ময় থমকে গেল —এই মাত্র কথা হল। এত দ্রুত কি ডিসিশন নেওয়া যায়?

—নিতে হবে। ভাবো। গলার স্বরে অদ্ভুত ঠান্ডা জড়িয়ে রেখেছে সুমি। তন্ময় অবাক হল। কী বলতে চায় সুমি?

কথা বলার সময় ছিল না। ডে-র আয়া এসেছে। সুমি রেডি হয়ে নিল। তন্ময়ের সঙ্গেই বের হয় অন্যদিন। ইদানিং দুজনে আলাদা বের হয়। সুমি বেরিয়ে যাওয়ার পরে তন্ময় বের হল। ডে-র আয়া টুম্পা ঢুকে অনন্যার সঙ্গে মিষ্টি হাসি বিনিময় করে চলে গেল বারান্দায়। কানে ফোন। একাধিক বয়ফ্রেন্ড আছে মেয়েটার। এক একদিন এক একজন লোকের সঙ্গে আসে। কেউ পৌঁছে দেয় বাইকে, কেউ নিজের অটোতে। এদিকে বিবাহিতা। ফিসফিস করে কথা বলে। একটা শব্দ বোঝা যায় না। অনন্যা বারান্দায় দাঁড়িয়ে থেকে দেখেছে এসব কান্ড। এখন ললিত লবঙ্গলতা হয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। অনন্যা সব বুঝেও কিছু বলতে পারে না। এই শ্রেণিটা কোথা থেকে উৎপন্ন হয়েছে, ভাবে অনন্যা। একটু ভয় ভয় করে। কবে আবার কোন প্রেমিক এসে মেরে রেখে যাবে কে বলতে পারে? আচ্ছা, জবাকে কি ওর প্রেমিক এসে মেরেছে? না, তাহলে সে অনন্যার আলমারি খুলে লুটপাট চালাত না। রাগ টাগ জবার ওপর ঢেলে চলে যেত। ধুর, সবসময় কি সেটাই হয়? খবরের কাগজে কত কিছু থাকে। মানুষের প্রবৃত্তি কোন এক জায়গায় আটকে নেই। আলমারিতে কিছু টাকা ছিল। আর অনন্যার সামান্য কয়েকটা গয়না। তবু তো লুট হয়েছে! জবার প্রেমিক থাকতে পারে? অবশ্য ওপর থেকে কাকেই বা বোঝা যায়। সুমি কেমন? ওকে ঠিকঠাক বুঝতে পারে না অনন্যা। রাতে গভীর ঘুম ঘুমোয়। ভোরে সুমিকে দেখে। সবই ঠিক আছে বলেই

তো মনে হয়। সব ঠিক আছে অনন্যা। মনে খিঁচ খিঁচ রেখ না। ওতে মন বিভ্রান্তই হয়। মন শান্ত কর। অনন্যা বুঝতে পারে না মন শান্ত রাখবে কেমন করে! জবার মৃত্যু-রহস্য অজানাই থেকে যাবে হয়ত। এখনও দরজার সামনে পা রাখতে গা শিরশির করে। জবা এখানেই পড়ে ছিল। এই খানটিতে রক্ত আর রক্ত...উঃ! এই প্রবলেমের কথা শুনে তন্ময় আবাসনের কমিটির সঙ্গে কথা বলে ব্লক চেঞ্জ করে নেওয়ার কথা ভেবে রাখল। কালই কথা বলে নিতে হবে। দেখা যাক, শিশিরদাকে বলে কাজ হয় কিনা। এখন কি ফোন করে নেবে? কথাটা এগিয়ে রাখা যাক। তন্ময় ফোন তুলে নিল।

সারাদিন বড্ড অস্থিরতার মধ্য দিয়ে গেল। কিচ্ছু ভাল লাগছিল না। বিছানায় শুয়ে গল্পের বই নিয়ে নাড়াচাড়া করল অনন্যা। পড়তে মন বসল না। আজ এমন হচ্ছে কেন?

আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরেছে তন্ময়। ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। আকাশ কালো করে এসেছে। মেট্রোতে ভিড় হতে পারে ভেবে চলে এসেছে। সুমি এল ঝড় শুরু হওয়ার পরেই। ঝড়ের দাপটে খানিকটা এলোমেলো। চুলের পারিপাট্য উধাও। মনে হয় ছুটে এসেছে।

অনন্যা উদগ্রীব —খুব ঝড় হচ্ছে?

—হ্যাঁ, মানে বৃষ্টিও শুরু হয়েছে। ওদিকে আলো চলে গেল।

—ওহো, ভয় পেয়েছ খুব। যাও, ফ্রেস হয়ে নাও।

জবাব না দিয়ে চলে যাচ্ছে সুমি। আঁচল দিয়ে মুখ ঘাড় মুছছিল। একবার থেমে তাকাল —আমি এসে চা করছি।

চলে গেল ওয়াশরুমের দিকে। অনন্যার মনে হল সুমি একটু বেশিই উদ্ভ্রান্ত কি? ও যে কাজ করে, তাতে সাধারণ ঝড় বৃষ্টিতে এমন ভয় পাওয়া কম দিন তো কাজ করছে না! চার বছর হয়ে গেল এই সেন্টারে আছে সুমি। এর আগে প্রজাপতি সেন্টারে ছিল। তাহলে? কথাটা প্রকাশ করল না অনন্যা। মনে রেখে দিল।

ডিনারের পরে ওষুধ খাইয়ে দিল সুমি অনন্যাকে। মুখে ট্যাবলেট দিয়ে নিজের হাতে জল খাইয়ে দেয়। নিয়মিত। মোট চারটে ওষুধ। জবা কটা দিত? তখন মনে হচ্ছে বেশি বেশি ওষুধ খেতে হত। ওষুধ খাইয়ে দিয়ে অনন্যাকে বিছানায় যত্ন করে শুইয়ে দেয় সুমি। চুলে হাত বুলিয়ে দেয়। একটু পরেই ঘুমে চোখ ঢুলে আসে। ঘোর লেগে যায়। গভীর ঘুমে তলিয়ে যায় অনন্যা। তখন সুমি উঠে অনন্যার বেডরুমের দরজা আলগা করে ভেজিয়ে দিয়ে পাশের বেডরুমে চলে আসে। যেখানে তন্ময় অপেক্ষা করে আছে ওর জন্য। আজও তেমনই হল। সুমি এল। অন্যদিনের মত হাসি নেই মুখে। তন্ময়ের কাছে এসে বসল —কথা আছে।

***

ভোর রাতেই বেরিয়ে পড়ল তন্ময় অনন্যাকে নিয়ে। পুরী যাচ্ছে। অনন্যা ঘুম ভেঙে হতচকিত হয়ে পড়েছে। আগের দিন কিছুই বলেনি তন্ময়। আজ এই ভোর রাতে বাইরে যাওয়া? কী কান্ড ! আগে বলবে তো! মাথা টাথা খারাপ হল নাকি?

তন্ময় দেরি করতে চায় নি। বুঝিয়েছে অনন্যাকে —আমাদের কি পিছুটান কিছু আছে? চল, বেরিয়ে আসি। এখন তোমার একটু চেঞ্জ দরকার। আর আমি সব ঠিক করেই রেখেছিলাম। এটা সারপ্রাইজ। খুশি তো?

অনন্যা খুশি না অখুশি কিচ্ছু বুঝতে পারার আগেই গোছগাছ করে ফেলেছে সুমি। একটা ব্যাগেই সব এঁটে গেল। দুটো দিন থাকবে। বেশি কিছুর প্রয়োজন নেই। এই আবাসনের সি ব্লকে চলে এসেছে তন্ময়। মাত্র দুদিন হল। এখানে পরিচিতের সংখ্যা একেবারেই নেই বললেই হয়। ওরা ভোররাতে বেরিয়ে পড়ল। মোবাইলে উবেরের নাম্বার সেভ করা আছে। ট্যাক্সি আসতেই চটপট গাড়িতে উঠে পড়ল ওরা। দুজন। সুমি যাচ্ছে না। মাথায় ঘোমটা টেনে নিয়েছে সুমি। অনন্যাকেও ঘোমটা তুলে দিল। ভোর রাতের ঠান্ডা বাতাসে শিরশিরে লাগে। কানে ঠান্ডা লেগে যাবে। গাড়ি চলে গেল। সুমি হেঁটে হেঁটে রাতের আলো ছায়া মাখা রাস্তা দিয়ে চলে গেল। রাত ঢেকে নিল ওকে।

কেউ সাক্ষী রইল না পুরীযাত্রীদের যাত্রা দেখার জন্য। সারা দিনে রাতে কত লোক আসে যায়, কেই বা তার খবর রাখে! তাছাড়া সি ব্লকে তন্ময় বা অনন্যাকে

ওষুধ খাইয়ে দিয়ে অনন্যাকে বিছানায় যত্ন করে শুইয়ে দেয় সুমি। চুলে হাত বুলিয়ে দেয়। একটু পরেই ঘুমে চোখ ঢুলে আসে। ঘোর লেগে যায়। গভীর ঘুমে তলিয়ে যায় অনন্যা। তখন সুমি উঠে অনন্যার বেডরুমের দরজা আলগা করে ভেজিয়ে দিয়ে পাশের বেডরুমে চলে আসে। যেখানে তন্ময় অপেক্ষা করে আছে ওর জন্য।

কজন চেনে? শহরের তান্ডবে একাকার হয়ে যায় সব। চেনা মুখগুলো কখন যে অচেনা হয়ে যায় জানা যায় না।

ঠিক দুদিন পরে ফিরে এল তন্ময়। ট্যাক্সি থেকে অনন্যাকে ধরে ধরে নামাচ্ছে, সিকিউরিটি গার্ড এসে দাঁড়াল —আপনারা ছিলেন না? থানা থেকে খোঁজ করেছিল। আজই। আমরা কেউ জানতাম না যে আপনারা নেই, তাছাড়া আপনাদের ফোন নাম্বারে ফোন করা হয়েছিল। নো রেসপন্স।

—থানা থেকে? কেন? জবার ব্যাপারটা মানে আমার আগের আয়া খুন হয়েছিল পঁচিশ দিন আগে। সে কারণেই এসেছিল। আর কিছু বলেছে থানা থেকে? তন্ময় গাড়ি থেকে ব্যাগ নামিয়ে নিল।

—আপনি এলে দেখা করতে বলেছে। আমার মনে হল খবরটা আপনাকে জানিয়ে দেওয়া উচিত, তাই বলে দিলাম স্যার।

—ঠিক আছে। আমি যোগাযোগ করে নেব। অনন্যা, আমাকে ধরে থাকো। আস্তে আস্তে! এদিকে লিফট! মুখ ফিরিয়ে সিকিউরিটি গার্ডের দিকে তাকিয়ে ভদ্রতাসূচক মাথা নাড়ল তন্ময়।

ঘন্টা খানেক পরে নিজেই থানায় গেল তন্ময়। জবার খুনির কোনও খোঁজ পাওয়া গেল কিনা!

থানা থেকে অবশ্য সে ব্যাপারে এখনও অন্ধকারেই আছে বলে জানাল। জবার বরকে সন্দেহের তালিকায় রেখেছে পুলিশ। আবার অন্য কেউ জবার সঙ্গে এক্সট্রা ম্যারিটাল সম্পর্কে জড়িত কিনা সেটাও দেখছে পুলিশ।

একটু আশ্চর্য হল তন্ময় —তাহলে আজ তন্ময়কে ডাকা হয়েছে কেন? তন্ময় অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে চেঞ্জে গিয়েছিল। আজ ঘন্টাখানেক হল ফিরেছে। সিকিউরিটি গার্ড তন্ময়কে বলেছে থানা থেকে তন্ময়ের খোঁজ করা হচ্ছিল। কী প্রবলেম?

পুলিশ ইন্সপেক্টর ইশারায় তন্ময়কে বসতে বললেন —আপনাকে দরকার আছে। আচ্ছা, আপনার ফ্ল্যাটে নতুন আয়া এসেছে? সুমি? বেশ। কথা হল আমরা সুমিকে খুঁজছি। সুমি কোথায় আপনি জানেন?

—সুমি? সুমিকে খুঁজছেন আপনারা? কেন?

—সে কথা বলছি। আগে আমার কথার জবাব দিন। সুমি কোথায়?

—সুমি বাড়িতেই হবে নিশ্চয়। বাঁশদ্রোণিতে ওর বাড়ি। আমার সঙ্গে ওর দেখা গত দুদিন আগে। আমরা গাড়ি ধরব বলে ট্যাক্সিতে উঠেছি, সুমি হেঁটে হেঁটে চলে গেল। বলল, ওর হাজব্যান্ডের শরীর ভাল নেই। সকাল হলে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। ব্যস, আর ওর সঙ্গে দেখা হয় নি। ভেবেছিলাম থানা থেকে ফিরে সুমিকে ফোন করে জানিয়ে দেব যে আমরা ফিরে এসেছি। ও যেন নাইট ডিউটিতে চলে আসে। কিন্তু আমি একটা ফোন করে দেখি। তন্ময় ফোন করে। সুমির ফোন সুইচড অফ।

—আমরা খোঁজ করে সেবিকা আয়া সেন্টারে গিয়েছিলাম। সেখন থেকেও কিছু বলতে পারল না। দুদিন আগে ও সেন্টারে গিয়ে বিল নিয়ে এসেছিল। তারপরে ওর আর কোনও খবর নেই।

—কিন্তু আপনারা সুমিকে খুঁজছেন কেন? কী করেছে সুমি?

—ওর হাজব্যান্ডকে খুন করে বাড়ির কুয়োয় ফেলে রেখেছিল কেউ। বস্তায় পুরে বডিটা ডুবিয়ে দিয়েছিল। সাধারণত ওই কুয়ো খুব বেশি ব্যবহার হয় না। কিন্তু দুপুরের দিকে এক পড়শি মহিলা কাপড় কাচাকাচি করতে এসে ফুলে ওঠা বস্তাটা দেখতে পায়। লোকজন ডাকাডাকি করায় সেই বস্তা তোলা হয়। খুন হয়েছে তিনদিন আগেই। মদের সঙ্গে তীব্র ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ভিসেরা টেস্টএর রিপোর্ট পাইনি। আজ কালের মধ্যে পেয়ে যাব। কিন্তু সুমির কোন পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। এখন কথা যেটা, তা হল, সুমির বরকে কে মেরেছে? সুমি কোথায়? ও বেঁচে আছে কি?

—অদ্ভুত লাগছে! আমরা ট্যাক্সিতে উঠলাম। সুমি চলে গেল। হাত নেড়ে বিদায় জানাল! আর ওর সঙ্গে কোন যোগাযোগ হয়নি! ও কোথায় যেতে পারে? তাছাড়া ওর বরের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক ছিল বলেই জানি। মাঝে মাঝে দুঃখ করত অত্যধিক মদ্যপান করে লোকটা। পয়সা কড়ি রাখে না। এছাড়া আর কিছু কখনও বলে নি। একটু চুপচাপ থাকত। ঠান্ডা প্রকৃতির মহিলা। বেশিদিন আসেওনি। দিন কুড়ি হবে।

—আপনি কি সেন্টার থেকে নিয়েছিলেন সুমিকে?

—হ্যাঁ, সেন্টার থেকে নিলে ভরসা থাকে। কিছু হলে অভিযোগ করার জায়গা থাকে। কিন্তু সুমির সঙ্গে আমার অফিস যাতায়াতের সময় আলাপ হয়। তখন জানতে পারি ও আয়া সেন্টারে আছে। আমার ওয়াইফ অসুস্থ বলে নাইটের আয়াও দরকার। দিনের আয়া আছে। ওর সেন্টারে যোগাযোগ করে সুমিকে নিই। সুমি নাইট-ডিউটি করতো। অফিসার, সুমি বেঁচে আছে তো?

—একথা মনে হল কেন আপনার?

—জানি না কেন মনে হচ্ছে ওর বরকে যে খুন করেছে, সে কি সুমিকে ছেড়ে দেবে? হয়তো সুমি আই উইটনেস!

—হুম, দেখা যাক। তদন্ত চলছে। দরকারে আপনাকে

ডেকে নেব। কোনও খবর পেলে আমাদের জানাবেন।

বিভ্রান্ত তন্ময় বাড়ি ফিরে এল। এসব কেমন ধারার ঝামেলায় পড়ে গেল ও! জবার খুন খুবই রহস্যজনক। এর মধ্যে আবার সুমি? কোথায় গেল সুমি?

অনন্যা সব শুনে চুপ হয়ে গেছে। কালো ফ্রেমের রেট্রো গ্লাস খুলে রেখে হতাশ চোখে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। স্নান সেরে ঘরোয়া পোশাক পালটে চা বানাচ্ছিল। এরই মধ্যে তন্ময় এসে ভগ্নদূতের মত খবর দিয়েছে। তবে সামলে নিল তন্ময়ই —নাও, চা খেলে টনিকের কাজ করবে। কেক আছে ব্যাগে। বের কর। খাওয়া চাই। আমার তো মারাত্মক খিদে পেয়েছে।

অনন্যা খাবার সাজিয়ে দেয়। নিজেও নেয়। থানার খবরাখবর বলে তন্ময়। জবার খুনিকে এখনও পাওয়া যায়নি শুনে অনন্যা হতাশ ভঙ্গীতে মাথা নাড়ে —কী হচ্ছে এসব? পুলিশ কি ভ্যারেন্ডা ভাজছে?

তন্ময় সাহস দিতে থাকে ক্রমাগত —এগুলো নিয়ে ভেবে শরীর খারাপ করবে না। চেঞ্জে গিয়ে একটু ভাল লাগছে তো? সেটাকেই বজায় রেখে চল। আজ তোমাকে পার্লারে নিয়ে যাব। ভাল লাগবে দেখ।

—না না, বেড়াতে গিয়ে তো পার্লারে গেলাম ! এখন ওসব ভাল লাগছে না। আমি বাড়িতেই থাকি। একটু রেস্ট নেব। অনন্যা বার্গান্ডি কালারের চুলগুলো ক্লিপ থেকে খুলে নেয়। তন্ময় ভাবে একটু আধটু মেকওভারে মানুষ কত অন্যরকম হয়ে যায়। মুডও ভাল থাকে। অনন্যার নড়বড়ে ভাবটা নেই এখন। সুমির কথা শুনে ফের অসুস্থ হলেই হয়েছে।

—বেশ বেশ, শপিং? চল, চল।

অনন্যা রাজি হলই না। অগত্যা বিকেলে হালকা ঘুম থেকে উঠে একাই বেরিয়ে গেল তন্ময়। সুগন্ধি কিনে নিয়ে এল অনন্যার জন্য। অনন্যা খুশি হল গিফট পেয়ে। ড্রেসিং ইউনিটের সামনে দাঁড়িয়ে দেখল নিজেকে। পালস পয়েন্টে পারফিউম লাগাল। কানের লতির পেছনে, গলার পেছনে, কবজির ভেতরের অংশে, কনুই, হাঁটুতে!

তন্ময় একটু হলেও অবাক হল অনন্যার সাজসম্পর্কে আইডিয়া দেখে। অনন্যা বুঝতে পেরে হাসল —কী দেখছ ?

—দেখছি, কত জান, অথচ একফোঁটা অহঙ্কার নেই?

—এসব শিখেছি দেখে দেখে। আমার পরিচিত একজন সবসময় যেন সুগন্ধে মোড়া থাকত। কেমন করে এমনটা থাকেন উনি? জানতে চেয়েছিলাম। তখন বলেছিলেন এই সব পয়েন্ট সবসময় রক্ত চলাচলের জন্য গরম থাকে। তাই এসব জায়গায় পারফিউম লাগালে খুব তাড়াতাড়ি বাষ্পে পরিণত হয়ে সুগন্ধ চারপাশে ছড়িয়ে দেয়। ব্যস, শিখে গেলাম। এভাবে অনেকক্ষণ গন্ধ গায়ে লেগে থাকে। আর স্নানের পরে পারফিউম লাগালে তো দারুণ ভাল কাজ দেয়। এই, এত কথা কিসের? এস, তোমাকে একটু সুগন্ধি করে দিই? অনন্যা এগিয়ে এল হাসতে হাসতে। তন্ময় হাসছিল, কিন্তু সেই হাসিতে রঙ ছিল না। মনট খিঁচ খিঁচ করছে। জবার খুনটা জাস্ট অদ্ভুত!

তন্ময় খেয়াল করল অনন্যা সুমির ব্যাপারটা ভুলে গেছে এই মুহূর্তে। কিন্তু একসময়ে ঠিকই মনে পড়বে! বা হয়তো মনে পড়েছে, কিন্তু তন্ময়কে বুঝতে দিচ্ছে না!

***

জীবন থেমে থাকে না। হুড়হুড় করে ছোটে সে। অনন্যার শরীর এখন ভালই আছে। ইদানিং ঘরে বসে না থেকে ইংরেজিটা ঝালিয়ে নিচ্ছে ব্রিটিশ কাউন্সিলে গিয়ে। ভালই লাগে বাইরের সুন্দর জগত। কত মানুষ নানা ধান্দায় ছুটছে। মাঝে মাঝে জিনসের সঙ্গে টপ পরে। গলায় পেঁচিয়ে নেয় স্কার্ফ। স্নিকারস পরে ছন্দে হাঁটতেও পারে। তন্ময় খুব ভাবে অনন্যার জন্য। ও-ই বলেছে একটু কমফোর্টে থাকতে। শাড়ি পরে এক্সিলেটরে চলাফেরায় অসুবিধে হয় অনন্যার। তন্ময় বুঝিয়ে সুঝিয়ে পোশাকের বদল ঘটিয়েছে। পার্ক স্ট্রিট দিয়ে হেঁটে আসতে আসতে অনন্যা এই একবছরের কথা ভাবে। জবার খুনি ধরা পড়েছে। লোকটা বদ সঙ্গে বহুদিন আগেই জেল ঘুরে এসেছে বার তিনেক। জবাদের বস্তির এক ঘুপচি ঘরে আস্তানা। জবা লোকটাকে চিনতো। হয়তো সে কারণেই জবাকে মরতে হল! কোন একদিন লোকটা জবাকে তন্ময়দের আবাসনে ঢুকতে দেখেছিল। জবাকে ফলো করে ওর যাতায়াতের সময়টা গেঁথে নিয়েছিল। এরপর জবা এখানে কোন ফ্ল্যাটে কাজ করে সেটাও বের করে নিয়েছিল। তারপর অপারেশন! জবাকে না মেরে উপায় ছিল না। জবা চিনে ফেলেছিল ওকে। কিন্তু পুরো অপারেশনটা ফালতু হল। মাল যেমন ভাবা গিয়েছিল তেমন পাওয়া যায়নি। পুলিশ এক রাতে বোমাবাজি হওয়াতে বস্তিতে হানা দেয়। তখন সেই খুনিকে বাকি কিছু সন্দেহভাজনদের সঙ্গে ধরে। এরপর জিজ্ঞাসাবাদের সময় কেমন করে যেন জবার খুনের কথা চলে আসে। পুলিশের সন্দেহ হয়। ইন্টারোগেট চলে। খুনি ধরা পড়ে। লোকটা নাকি জিজ্ঞাসাবাদের সময় ক্ষেপে গিয়ে বলে ফেলেছিল —ওটা ফালতু খুন হয়ে গেছে। মাল কিচ্ছু পাওয়া যায়নি। পোষায়নি। একজনকে ভাড়া করতে হল। কাজটা একা করতে যাওয়া ঠিক হত না। তাই তপসিয়া থেকে জাফরকে নিতে হয়েছিল। পুরো ফালতু কাজ হয়েছে। বেকার!

রাস্তা পার হতে হতে মন থেকে জবাকে সরিয়ে দিতে চায় অনন্যা। ইদানিং যা শুরু হয়েছে ! অবিরত অ্যাকসিডেন্টের খবর পাওয়া যাচ্ছে! সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফএর সতর্কবার্তা দিয়েও লাভ হচ্ছে না। রাস্তায় সাবধান থাকাই ভাল। তন্ময়কেও সে কথাই বলে ও।

মিডলটন স্ট্রিটের বডি পলিশিং অ্যান্ড বিউটি-তে অ্যাপয়েন্মেন্ট করা আছে। তন্ময় নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে শিখিয়েছে অনন্যাকে। এতে মন ভাল থাকে। তাছাড়া শরীরের শুকনো ভাব, পিগমেনটেশন, ট্যানভাব কমাতে বডি পলিশিং জরুরি। এতে রিল্যাকশনের দারুণ অনুভূতি হয়।

কাচের দরজা ঠেলে ঢুকে গেল অনন্যা। বাথটবে হালকা গরম জলে শুয়ে থাকবে খানিকক্ষণ। পরবর্তী স্টেপ আসা পর্যন্ত জবাকে নিয়ে ভাবনাটা আসবে ঠিক। বেচারি জবা! কার কখন কী হয়ে যায়, কেউ বলতে পারে না! সুমির বর জুয়াড়ি ছিল। মারধোর করতো সুমিকে। বর মরল। সুমির জীবনটা কোন খাতে চলে গেল!

সন্ধে হয়ে গেছে। তন্ময় ফিরতে এখনও আধ ঘন্টা বাকি। একটা ফোন করে তন্ময়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিল অনন্যা। তন্ময় ওকে কালিঘাট মেট্রোতে দাঁড়াতে বলছে। অফিসের বিশেষ কোন কাজে তন্ময় কালিঘাটে গেছে। অনন্যা গেলে একই সাথে ফিরবে বাড়িতে।

রাতে ঘন মেঘ করে এসেছে। প্রকৃতি মল্লার রাগে উজাড় করে দিচ্ছে নিজেকে। ছোট ব্যালকনিতে অল্প ড্রিঙ্ক নিয়ে বসেছিল ওরা দুজনে। রেড ওয়াইন অনন্যার জন্য। ইদানিং ভদকা পছন্দ করছে অনন্যা। মুড নাকি ভাল থাকে এতে ওর। তন্ময় অনন্যাকে মনের মত করে নিয়েছে। অনন্যা বাধা দেয়নি। জীবনের ছোট ছোট সুখগুলোকে অনুভব করেই বেঁচে থাকতে হয়। একটি অল্প বয়সী মেয়ে ডিনার তৈরি করে দিতে আসে সাতটা নাগাদ। কিচেনে বোধহয় রুটির তোড়জোড় করছে। তন্ময় বলে এল আজ খিচুড়ি হবে। ঝুরঝুরে খিচুড়ি। সংগে ডিম ভাজা, পাঁপড়। কিছু পাঁপড় ভেজে দিয়ে আসতে বলল ব্যালকনিতে।

ফিরে এসে বসতেই অনন্যা বডি পলিশিংয়ের কথা জানাল। তন্ময় মুখ এগিয়ে অনন্যার গাল চেটে দিল —আঃ, সত্যি চনমনে লাগছে তোমাকে। আজ বৃষ্টিতে স্নান হবে। দুজনেই ভিজব। তুমি ভেজাবে আমাকে। আমি তোমাকে। আজ নতুন করে আবিষ্কার করব পরস্পরকে। রাজি?

অনন্যা তন্ময়ের শার্টের বোতাম খুলে মুখ ডুবিয়ে দিল। একটু নেশা হয়েছে। মদির চোখে তন্ময়ের চোখে চোখ রাখে অনন্যা —আজ আমি সাপিনী আর তুমি সাপ! শঙ্খ হব! আর আর ভয় নেই বল? আর কেউ খুঁজে পাবে না আমাকে ! কেউ জানবে না কুয়োর ভেতরে বরকে মেরে বস্তায় পুরে ফেলে দিয়েছিলাম। সেই ঝড় বাদলের রাতে এসে তোমাকেই সব বলেছি। তুমি বউকে নিয়ে পুরী ঘুরতে গেলে। আমি পায়ে হেঁটে খানিকটা গিয়ে তোমাদের গাড়িতে উঠে বসলাম। মনে পড়ে? বউদিকে নিয়ে আমরা মুর্শিদাবাদে চলে গেলাম। বউদিকে হাপিস করার কথা ছিল। কিন্তু কী করে কী করলে গো? কেমন করে মেরে ফেললে বউকে? হি হি হি! আমার লোক এত ভাল কাজ জানে ভাবতে পারি নি। এক ঝটকায় বউদি মরে গেল। হি হি হি! নেশায় পড়েছে অনন্যা। তন্ময় নেশাগ্রস্ত সুমিকে দেখে। মনে পড়ে, সুমি দুটো লোক ফিট করেছিল। তন্ময়কে কিচ্ছু করতে হয়নি। সুমিও কিছু করেনি। ওই লোক দুটো নাকি বাংলাদেশের বর্ডার পেরিয়ে এসে কাজ সেরে ফের চলে যায়। কেউ খুঁজে পাবে না! সুপারি দিয়েছিল সুমি। টাকা গেছে তন্ময়ের। তাতে কী ? তন্ময় কি এমনটা চায়নি?

অনন্যার বডিটা লোহার তারে চেপে চেপে পেঁচিয়ে আগাগোড়া শক্ত পার্সেল বানিয়ে বোল্ডার বেঁধে মাঝ গঙ্গায় নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তন্ময় শ্বাস ফেলে। উফ, কত ঝামেলা যে গেছে। মুর্শিদাবাদে সুমির চেনা লোক ছিল। সে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিল খুনিদের সঙ্গে। রাতারাতি। লালগোলায় বেড়াতে গিয়েছিল ওরা। সুমিকে হোটেলে রেখে দুজনে বেরিয়ে ছিল। ঘোড়ার গাড়িতে ওঠার ভারি শখ অনন্যার। তো, কাজটা ঘোড়ার গাড়িতেই হাসিল হল। সুপারি কিলার তন্ময়ের পাশে বসে থাকা অনন্যার পাশে গিয়ে এক ঝটকায় ঘাড় মটকে দিল। মাঝ গঙ্গায় লোহার তারে বেশ করে পেঁচিয়ে রাখা বডি জলের তলে থাকতে থাকতে পার্ট পার্ট পচে বেরিয়ে আসে। জলচরের খাদ্য হয়। বোল্ডার ওপরে উঠে আসতে দেয় না। তারে পেঁচিয়ে পড়ে আছে একটা কঙ্কাল। অনন্তকাল।

—ওসব নিয়ে ভেব না। পাত্তি দিয়েছি, ঝামেলা মিটে গেছে। সুপারি দিয়েছি, কাজ হয়ে গেছে। তুমি সি ব্লকে এসে আমার বউ অনন্যা হয়ে আছ। সুমি কে? বরকে খুন করে সে বেপাত্তা। আমরা তার কী জানি? চিন্তা নেই। কী হল, এখনও পাঁপড় দিয়ে গেল না। দেখছি। তন্ময় উঠে গেল। উঠেই দরজার মুখোমুখি হয়ে গেল মেয়েটার। একরাশ ভাজা পাঁপড় নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তন্ময়কে দেখে প্রচন্ড চমকে উঠল মেয়েটি।

তীব্র ভয় পেয়েছিল। ভয়ার্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠল —পাঁপড় এনেছি! এই যে পাঁপড়! গলা কাঁপছিল ওর। তন্ময় বুঝে ফেলল, মেয়েটা আড়াল থেকে তন্ময়ের বউএর কথা শুনেছে।

তন্ময় দেখল মেয়েটির ফিগারটা ভারী সুন্দর। অজন্তার নারী মূর্তির মত। হঠাৎ করে তন্ময়কে দেখে বিভ্রান্ত হয়ে আছে বলে খেয়াল নেই শরীর থেকে আঁচল সরে গেছে। আত্মনিবেদনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে মূর্তিমতী রতিদেবী। ওর হাত থেকে পাঁপড় ভাজার প্লেট নিয়ে কিচেনে টেনে আনল মেয়েটিকে। আদরে আদরে ভয় ভাঙাতে শুরু করল। কিচ্ছু ভয় নেই। ওটা একটা সিনেমার গল্প বলছিল তন্ময়ের বউ। আয়, আমার কাছে আয়। টাকা লাগবে? বলিস আমাকে। কত টাকা লাগবে? আমি দেব। বলতে বলতে একটু ভদকা খাইয়ে দিল মেয়েটাকে। নেশা হোক।

নেশা হয়েছে। একটু একটু নড়বড় করছে মেয়েটা। ব্যালকনিতে বসে ভদকায় ল্যাদ হয়ে পড়ে আছে তন্ময়ের বউ। তন্ময় বাইরে থেকে লক টেনে দিল। মেয়েটাকে লিফটে ঢুকিয়ে গ্রাউন্ডে নেমে গেল। মাঝে মাঝে ভাগ্য খুব হেল্প করে নরকের দ্বারে পৌঁছতে। গাড়ি গ্যারেজ করা হয়নি। গাড়িতে ঢুকিয়ে নিল মেয়েকে। পৌঁছে দিতে হবে। না হলে একা যাবে কেমন করে বাড়িতে। পেছনের বস্তির কাঁচা রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে গাড়ির বাঁশি শোনে তন্ময়। আজ এসেছে কানাইএর বাঁশির ডাকে।

ট্রেন আসার সময় হল। মেয়েটাকে টেনে বের করল তন্ময় গাড়ি থেকে। মেয়েটা হেসে উঠল। ওর শরীর থেকে কাঁচা পেঁয়াজ আর বৃষ্টির সোঁদা গন্ধ আসছে। চারপাশে ঘন অন্ধকার। দূরে দূরে একটু একটু আলো টিপ টিপ করছে। এদিকে লোকজন বলতে কিচ্ছু নেই। তন্ময় মাটিতে শুইয়ে রাখল মেয়েটিকে। মাটিতে শুয়ে থাক। পকেট থেকে ভদকার বোতল বের করে মেয়েটার মুখে ঢেলে দিল তন্ময়। গাড়ি আসছে কি?

***

সকালে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে বাতাসে ঠান্ডা ভাব এসেছে। মৃদু নরম বাতাসে আরামের আমেজ। তন্ময় গভীর ঘুমে তলিয়ে গিয়েছিল। এসি অফ করে জানালা খুলে দিয়েছিল অনন্যা। বাইরে থেকে ঠান্ডা হাওয়া ছুটে এল ঘরের ভেতরে। অনন্যা জানালা দিয়ে আকাশ দেখল। মেঘ হালকা হয়ে এসেছে। মানে ঘন্টা খানেক পরে রোদ উঠে যেতে পারে। তন্ময় ঘুমোচ্ছে দেখে আর ডাকল না অনন্যা। আধ ঘন্টা পরে ডেকে দেবে।

উপাসনার জন্য তৈরি হল অনন্যা। স্নান সেরে ঢিলে পোশাক পরে নিয়ে বসল ও। ভেজা চুল বেয়ে জল পড়ছে টস টস করে। উপাসনার প্রধান অঙ্গ হল ধ্যান। প্রতিটি উপাসনার সময় অনন্যা নানা শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করে। প্রাকৃতিক শক্তি, প্রাচীন কোন আত্মা, কখনও অদৃশ্য কোনও গাইড। ডুবে যাবে ধ্যানে। সুগন্ধি ধূপ জ্বেলে দিল ঘরে। হাতের তেলোয় সুগন্ধি তেল মেখে নিল। চোখ বুজে এল। আজ চাঁদের দিন। পূর্ণিমা। চাঁদ অনন্যার পূজ্য দেবী। ত্রিকোণ টুপি পরে নিয়েছে। অনেকদিন যৌথ ভাবে উপাসনায় বসা হয়নি! আজ কেন মন উদগ্রীব হয়ে আছে বুঝতে পারছে না অনন্যা। ধ্যান ভেঙে যাচ্ছে বারবার।

তন্ময়ের মনে হল এক সরু টানেলের মধ্য দিয়ে ছুটে যাচ্ছে ও। দুপাশে আলো নেই। বহুদূরে আলো দেখা যাচ্ছে। পায়ের নীচে জল কাদা। পা ডুবে যাচ্ছে নোংরায়। তন্ময় ছুটছে। এখান থেকে পালাতে হবে যেভাবেই হোক। পেছনে হালকা পায়ে কারা ছুটে আসছে। একটা হই হই চিৎকার করে উঠছে ওরা। তন্ময়কে ধরে ফেলবে এখনই। ভয়ে ত্রাসে হাঁপিয়ে পড়েছে তন্ময়। আর পারছে না ছুটতে। অন্ধকারে কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না। হাতড়ে হাতড়ে চলছে তন্ময়। ঘেমে চুপচুপে হয়ে আছে ও। বের হবে কোথা দিয়ে? রাস্তাটা কোনদিকে যেন? উফ! হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল তন্ময়। নোংরা কাদা জলে দুর্গন্ধ। এটা কী? লোহার পাত? রেল লাইন? এটা কি রেল লাইন? পেছনের লোকগুলো এখনও ছুটে আসছে? চিৎকার করে চলে ওরা। ধরে ফেলল ধরে ফেলল ওরা তন্ময়কে!

—এই তন্ময়, কী হয়েছে? স্বপ্ন দেখছ? ওঠো তো। আমাদের এই আবাসনে কিছু হয়েছে মনে হচ্ছে! অনন্যা ধাক্কা দিচ্ছে তন্ময়কে।

তন্ময় জেগেও বুঝতে পারছিল না টানেলের শেষে পৌঁছে গিয়েছে কিনা! ঘোর লাগা চোখে অনন্যাকে দেখল। কে এই মহিলা? টানেলের অন্ধকারে এই মহিলা এল কোনদিক দিয়ে?

নেশা হয়েছে। একটু একটু নড়বড় করছে মেয়েটা। ব্যালকনিতে বসে ভদকায় ল্যাদ হয়ে পড়ে আছে তন্ময়ের বউ। তন্ময় বাইরে থেকে লক টেনে দিল। মেয়েটাকে লিফটে ঢুকিয়ে গ্রাউন্ডে নেমে গেল। মাঝে মাঝে ভাগ্য খুব হেল্প করে নরকের দ্বারে পৌঁছতে। গাড়ি গ্যারেজ করা হয়নি। গাড়িতে ঢুকিয়ে নিল মেয়েকে। পৌঁছে দিতে হবে।

—আরে, ওঠো না! দেখ একটু বাইরে গিয়ে! কিছু হয়েছে মনে হচ্ছে! বলা যায় না আগুনটাগুন লেগেছে কিনা! উঠে একটু দেখ। ব্যালকনিতে যাও। অনন্যা অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছিল। এখানে কারও সঙ্গেই সে অর্থে কানেকশন নেই। মেলামেশায় উৎসাহী নয় ওরা দুজনেই। কোথায় কী হচ্ছে বুঝতেও পারে না তাই। তন্ময় বোধহয় কোন দুঃস্বপ্ন দেখছিল। এখনও সেই ঘোরের মধ্যেই আছে। অনন্যা জোরে ঝাঁকুনি দিল —কী হচ্ছে তন্ময়? ওঠো!

তন্ময়ের ঘোর কেটে গেল। ও ধড়মড় করে উঠে বসল। কিছু বলছিল অনন্যা।

—কী হল? ধাক্কা দিচ্ছ কেন?

—দেখ, বাইরে কিছু হয়েছে। শুনতে পাচ্ছ একটা চেঁচামেচি হচ্ছে?

তন্ময় কান খাড়া করল। হ্যাঁ, ঠিক! চেঁচামেচি হচ্ছে! তন্ময় বিছানা ছেড়ে উঠে পায়ে রুম স্লিপার ঢুকিয়ে নিল। ব্যালকনি থেকে দেখা গেল ছোটখাটো ভিড় হয়েছে আবাসন চত্বরে। কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে না। তন্ময় লিফটে ঢুকে গেল। দেখে আসা যাক। কী হল আবার!

ভিড়ে না ঢুকেও পরিস্থিতি বোঝা যায়। প্রচন্ড উত্তেজিত সকলেই। এই আবাসনে কাজ করত একটি মেয়ে, কাছাকাছি কোনও কলোনিতে থাকতো, গতকাল ট্রেনের নীচে মাথা দিয়ে সুইসাইড করেছে। দেখগে, কার সংগে ইস্টিমিস্টি ছিল! মেয়েটার নাকি একবার বিয়ে হয়েছিল। বিহারে। মেয়েটা কিছুদিন থেকে বরের বন্ধুর সঙ্গে পালিয়ে যায়। পরে তাকেও ছেড়ে বাপের বাড়িতে ফিরে আসে। ক্যারেকটারে গন্ডগোল আছে মেয়েটার। তন্ময় ফিরে গেল। যা হয়েছে, তাতে তন্ময় আর কীই বা করতে পারে! অন্যমনস্ক ছিল বলে তন্ময় লিফটে উঠতে ভুলে গেল। সিঁড়ির ধাপ একটা একটা করে ভাঙতে ভাঙতে চিন্তা করতে থাকে। একটা কাজের লোক দরকার। অনন্যার পক্ষে একা সংসার সামলানো অসম্ভব।

অনন্যা উৎকণ্ঠিত মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। তন্ময় ঠোঁট উলটে হাতের ভঙ্গী করে ঘরে ঢুকে পড়ল। অনন্যা এগিয়ে এল —কী হয়েছে গো?

বাথরুমে ঢুকে যেতে যেতে তন্ময় অবহেলার সুরে কথা বলে —কে একটা মেয়ে কলোনিতে থাকে সুইসাইড করেছে সক্কালবেলা ফালতু যত্তসব মুডটাই নষ্ট করে দিল! যত্ত প্রস্টিটিউট!

জলের ধারার নীচে দাঁড়িয়ে তন্ময় আরাম উপভোগ করতে থাকে। অনন্যা কারও সঙ্গে মেলামেশা করে না। ও কিচ্ছু জানে না। জানতে পারবে না। ওকে নিজের অপরাধের কথাটা জানাতে হবে, কে দিয়েছে এই দিব্যি? মেয়েটা পাঁপড় দিতে এসে অনন্যা মানে সুমির ভদকার নেশায় বলে ফেলা কথাগুলো শুনে ফেলেছিল। সেই জন্যই মেয়েটা তন্ময়কে দেখে অত ভয় পেয়েছিল! সুমি নেশাগ্রস্ত ছিল বলে জানতেই পারে নি কিছু। আরে, মেয়েটাকে কোন শূয়োর বাঁচিয়ে রাখবে? রাখলে মেয়েটা কি তন্ময়কে বাঁচতে দিত?

অফিসের সময় হল। তন্ময় তৈরি হল। সুমিকেও বাঁচাতে হবে তো! নাকি?

ছায়া জন্ম নেয়। তাকে বাঁচিয়ে রাখ হে!

লেখা পাঠান হাতে লিখে নয়, টাইপ করে

ডুয়ার্স সংক্রান্ত আপনার কোনও লেখা থাকলে টাইপ করে পাঠান। আপনার লেখা সম্পাদকমন্ডলীর পছন্দ হলে এই পত্রিকায় তা ছাপা হবে। লেখার বিষয়বস্তুর উপর ছবি থাকলে অবশ্যই পাঠাবেন। লেখা পাঠানোর ঠিকানা 'আড্ডাঘর', মুক্তাভবন, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি। অথবা মেল করতে পারেন নিচের মেল আইডি-তে

editor.ekhonduars@ yahoo.com

এখন ডুয়ার্স

ধারাবাহিক কাহিনি

অরণ্য মিত্র

লক্ষ্যভ্রষ্ট পঞ্চশর

শালগুড়ির রাধু বর্মনের গালামালের দোকানের কর্মচারি রবিকে পাওয়া যাচ্ছে না। মালিকের বাড়ির গোডাউন থেকে ঘি-এর টিন নিয়ে বেরিয়েছিল, কিন্তু ফিরে আসেনি। রাধু বর্মন নিশ্চিন্ত যে ঘি চুরি করে পালায় নি রবি। রাধুবাবুর ছোট ছেলের বউ রিয়ার অনেক গুণ। তাঁর স্বামী মনোজ স্ত্রীমুগ্ধ। রবির নিখোঁজ সংবাদে বিচলিত না হয়ে সে গেল রাতের বেলায় কন্ডোম আনতে। পরদিন সকালে রাধু বর্মন ঠিক করলেন মাথাভাঙ্গার পরান বর্মনের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। সে রবিকে চেনে। রবির বাড়ি যেতে হবে। ক্যামেরাধারী শিক্ষক সন্দীপ জানা অবিবাহিত এবং রিয়ার মানসিক প্রেমিক। রবি নিখোঁজের ছুতোয় সে হাজির হয় রাধুবাবুর বাড়িতে। রিয়া তাঁকে অনুরোধ করল ফোটো তুলে দিতে। নিরীহ মেজাজে শুরু হওয়া এক রহস্যকাহিনীর দ্বিতীয় পর্বে কি জানা গেল রবি কোথায়?

৫

কখন নিঃশব্দে মেঘ ঘন হয়ে উঠেছিল রাধু বর্মন টের পান নি। ঘুমোতে যাওয়ার সময় দেখলেন ঝম ঝম করে বৃষ্টি নেমেছে। সারা রাত কখনও তুমুল কখনও টিপ টিপ বৃষ্টিতে শালগুড়ি পুরো ভিজে গেল। সকালে ঘুম থেকে উঠে রাধু বর্মন দেখলেন নদী ভরে গেছে। হু হু করে ছুটছে ঘোলা জল। আকাশ মেঘাবৃত। ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি পড়েই চলেছে। বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা, ভেজা বাতাস। নদীতে স্নান করার আশা ত্যাগ করে রাধু বর্মন ফিরে এলেন। রিয়া চা এনে দিল। রাধু বর্মনের হঠাৎ মনে পড়ল ননীর কথা।

ননীর ভালো নাম নন্দন বর্মা। তিনি রাধু বর্মনের ক্লাস ফ্রেন্ড। ননী লেখাপড়ায় ভালো ছিল। সে জলপাইগুড়ির প্রসন্নদেব কলেজে ফিলজফি পড়াত। সদ্য রিটায়ার করে শালগুড়ির বাড়িতে ফুল বাগান নিয়ে মেতে আছেন। অবশ্য ননী চাকরি পেলেও কখনও শালগুড়ি ছাড়ে নি। তাঁর দুই মেয়ে আগাগোড়া বাইরে পড়াশুনো করলেও ননী মাঝে মাঝেই শালগুড়ির বাড়িতে এসে দু-চারদিন কাটিয়ে যেত। রাধু বর্মনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব অটুট রয়েছে। তবে কাজকর্মের চাপে দেখা-সাক্ষাৎ কম হয়। ননী মাঝে মাঝে ফোন করে। বাজারে এলে একবার উঁকি দিয়ে যায়।

'ননীর নম্বরটা একটু বির করি দ্যাও তো।' রাধু বর্মন চায়ে চুমুক দিয়ে রিয়ার দিকে ফোন এগিয়ে দিলেন। রিয়া নম্বর খুঁজতে খুঁজতে বলল, 'উনি শালগুড়িতে আছেন?'

'হুঁ। তিন-চারদিন আগে দেখা হইসিল। কসে, এ মাসটা থাকিম।'

'নাও। রিং হচ্ছে।'

রাধু বর্মন কানে ফোন লাগালেন। রিয়া বেরিয়ে গেল। ফোনের ওপার থেকে ননীবাবু সহাস্যে বললেন, 'কী কান্ডও! তুই ফোন করসিস!'

'মুই তো ভাবিসু এলায় যাম তর বাড়িৎ।'

'আয় ক্যানে।'

আধঘন্টার মধ্যে রাধু বর্মন টোটোয় চড়ে ননীর বাড়ির সামনে নামলেন। ননীরা কয়েক পুরুষের বড়লোক। পুরোন বাড়ির পাশে শহুরে কায়দায় নীল রঙের দোতলা বাড়ি বানিয়েছে সে। সামনে বাগান। ননী হাফ প্যান্ট আর গেঞ্জি পরে কোমরে হাত দিয়ে গেটের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন।

'ব্যাপার কী ক' তো?'

'চল। বলি।'

বসার ঘরটা বেশ সাজান গোছান। রাধু বর্মন জিগ্যেস করলেন, 'তোর বউ আসে নাকি?'

'বউ জলপাইগুড়িৎ! পুরা ফ্রিডম।'

রাধু বর্মন সোফায় বসে আরাম পেলেন। তারপর বললেন, 'আমার দোকানে রবি বলে একটা ছেলে কাজ করত।'

'তারে নাকি পাওয়া যাচ্ছে না?'

'পরশু দুপুরে আমাদের বাড়ি গেলে গোডাউন থেকে ঘি আনতে। তারপর থেকে কোনও খোঁজ নাই বুঝলি? ফোন বন্ধ। লোকে কসে উয়ায় ঘি আর ভ্যান রিক্সা নিয়া ভাগিসে। এটা আমার বিশ্বাস হয় না।'

'পুলিশে খবর দিতে হবে।'

'এগুলা পাতি কেস। পুলিস আসবে না।'

'তোর ছোট ছেলেটা তো নেতা হইসে। খোঁজ লাগাতে ক'!'

'লাগাইসে। রবিকে কেউ দ্যাখেই নাই। মালটা ভ্যানিশ হয়্যা গ্যাসে।'

'তালে কী করতে বলিস?'

'রবি দোকানেই থাকত। দোকানের লাগোয়া ঘর আসে একটা। দোকানের ভিতর দিয়াই যাওয়া যায়। ঘরে রবির একটা ব্যাগ আসে। সেইটা একবার সার্চ করিয়া দেখা লাগে। তুই যাবি?'

'মুই?' ননী উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। 'এখনই যাবি?'

'দোকান তো খুলবই। এখনই চল তালে।'

হাটবার নয় বলে বাজার মোটামুটি খোলা। বিকেলের আগে জমবে না। রাধু বর্মন দোকানের সাতটা তালা

একে একে খুলে পাল্লা একটু ফাঁক করে বললেন, 'তুই ঢোক।'

ননী দোকানের ভেতরে পা রাখলেন। রাধু বর্মন বাকি পাল্লাগুলি খোলা শুরু করেছেন। ঘরের অন্ধকার কেটে গেল। তিনদিক জুড়ে সারি সারি মালপত্র। বাইরে সাজিয়ে রাখার জিনিসগুলি ভেতরে ডাঁই করা। তার পাশ দিয়ে সন্তর্পণে দোকানের কোনার দিকে একটা আধখোলা দরজার দিকে এগোলেন ননী।

একটা ছোট ঘর। এটা আসলে দোকানেরই অংশ। পার্টিশন দেওয়া। হাতের কাছে সুইচ দেখে ননী সেটা টিপলেন। উজ্জ্বল এলইডি বাল্বের আলোয় ঘরটা ভেসে গেল। ঘরের সিংহভাগ জুড়ে একটা তক্তপোষ। শস্তা কিন্তু পরিচ্ছন্ন চাদর আর বালিশ। একটা বড় কিন্তু পুরোন ব্যাকপ্যাক ছোট একটা টুলের ওপরে দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা। এ ছাড়া জলের বোতল, গ্লাস, দড়িতে ঝোলান দুটো শার্ট একটা প্যান্ট আর গামছা। দেয়ালে কোথাও ঝুল বা ময়লা নেই। তক্তপোষের কোনায় একটা ছোট ফ্যান দেয়ালের সঙ্গে লাগান।

'ছেলে তো বেশ টিপটপ থাকত।' ননী মুখ ঘুরিয়ে রাধু বর্মনের উদ্দেশে বললেন।

'এইটা ওর গুণ ছিল। পুরা ফিটফাট থাকত।'

'হুঁ।' ননী ব্যাকপ্যাকটা খুলতে শুরু করেছেন। সেটা থেকে ক্রমে একটা ভালো ডেনিমের প্যান্ট, দুটো উজ্জ্বল রঙের টি শার্ট, বডি স্প্রে, মোবাইল চার্জার, ভোটার কার্ড, আধার কার্ড আর ব্যাঙ্কের পাস বই বেরিয়ে জমা হল বিছানায়।

ননী জামা কাপড়গুলো নাড়াচাড়া করে চিন্তিত মুখে পাস বই-এর পাতা ওল্টাতে লাগলেন।

৬

সন্ধের আগে আগে শালগুড়িতে খবরটা প্রথমে এল পরেশ প্রামাণিকের কাছে। পরেশ প্রথম জীবনে বাঙলাদেশে কফ সিরাফ পাচার করত। তারপর পাচার করত গরু। এখন সে ঠিকাদার। বাঙলাদেশে পাচার কর্মে তাঁর ডান হাত লোচন মিঞা ফোন করে খবরটা দিল। লোচন খুব একটা ফোন করে না। পরেশ স্থানীয় 'গরু বাঁচাও কমিটি'র আহ্বায়ক। লোচন মিঞা হজ করতে যাবে বলে পয়সা জমাচ্ছে। খুব দরকার না হলে লোচনের ফোন আসে না দেখে পরেশ বেশ কৌতূহল নিয়ে মোবাইলটা তুলল।

'দাদা! একটা নিউজ আসে।'

'ক।'

'ময়নাগুড়ির আগে যে পুরান ব্রিজটা আসে সেইখানে রবির লাশ পাইসে পাব্লিক। আমি সেখানেই।'

'রবি?' পরেশ লাফিয়ে ওঠে। এদিক ওদিক দেখে নিয়ে ফিসফিস করে বলে, 'রবি? তুই শিওর?'

'লাশ পেলাস্টিকে পাকিট করা সিলো। তবে গন্ধ বারয় গিসে। পুরা ফুইলা গিসে দাদা। চেনা যায় না।'

'চিনলি কী করে?'

'ডান হাতের বালা। মালটা ফ্যাশান করত পুরা। হাতে একখান রাক্ষসের মুখ আঁকা বালা পরত দেখেন নাই? শস্তার মাল অবশ্য।'

'পুলিশ কি জানে এটা রবির লাশ?'

'তা আর জানতে বাকি কী? এখন শালগুড়িতে পুলিস আসবে। খোঁজ খবর তল্লাসি হবে। এটা তো পুরা মার্ডার কেস।'

'তুই বলতে চাস কী?'

'সাবধানে থাকেন দাদা। রবিকে কে খুন মার্ডার করল তা জানেন?'

'ধুস শালা! ও কি মার্ডার হওয়ার মাল। ও হলো কেষ্ট। শালা আমার মেয়েটাকে ট্র্যাপ করসে!'

'রবি কি আপনের মাইয়ার গালফেন হয়?'

'একসঙ্গে ঘুরসে খবর পাইসি। মেয়ে স্বীকারও করসে। এইবার একসঙ্গে আর কী কী করসে ভাব! যা যুগ শালা! মোবাইল খুললেই মেয়েদের মাই খোলা, গুদ খোলা পিকসার। কিন্তু এখন তো টেনশন হয়ে গেল!'

'ক্যান?'

'পুলিস যদি ভাবে আমি মার্ডার করসি? মেয়ে তো শালা সেটাই ভাববে রে লোচন!'

'আপনে সত্যি মার্ডার করান নাই?'

'শুওরের বাচ্চা!'

খটাস করে ফোন কেটে দিলেন। লোচনটা বরাবর এই রকমেরই হারামি। কিন্তু এখন মাথা ঠান্ডা রাখার সময়। পা টিপে টিপে বাড়ির ভেতরে গিয়ে দেখলেন বউ রান্নাঘরে কিছু একটা করছে। মেয়ের ঘরের দরজা বন্ধ। মেয়ের নাম বনানী।

বনানী হলো পরেশ প্রামাণিকের তৃতীয় পক্ষের মেয়ে। প্রথম বউটার ওপর পণের দাবিতে একটু বেশি অত্যাচার হওয়ায় সেটা পেটে বাচ্চা নিয়ে গলায় দড়ি

রবির লাশ উদ্ধারের খবর শুনে বউ কয়েক সেকেন্ড ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে ডুকরে কেঁদে উঠল। কান্না শুনে বনানী ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই পরেশ প্রামাণিক গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, 'আগেই বলসিলাম। কান দিস নাই। রবির লাশ পাইসে।'

দেয়। দ্বিতীয় বউটা ছিল কলেজ পাশ। তাঁকে পরেশ ঠিক বাগ মানাতে পারেন নি। উল্টে ডিভোর্স আদায় করে গুচ্ছের টাকা আর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেছে। তিন নম্বর বউ নিয়ে আর ঝামেলা হয় নি। বিস্তর পণ দিয়েছে। মেয়েটাও মন্দ হয় নি। গত বছর মাধ্যমিক পাস করেছে। সারাক্ষণ মোবাইল ঘাঁটে। পরেশকে বাপ বলে খাতিরই করে না।

এবার বোঝ খাতির না করার ফল। বয়ফ্রেন্ড খুন হয়েছে।

রবির লাশ উদ্ধারের খবর শুনে বউ কয়েক সেকেন্ড ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে ডুকরে কেঁদে উঠল। কান্না শুনে বনানী ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই পরেশ প্রামাণিক গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, 'আগেই বলসিলাম। কান দিস নাই। রবির লাশ পাইসে।'

মেয়ে একটু ক্ষণ স্থির চোখে বাপের দিকে তাকিয়ে ঘরে ঢুকে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল। পরেশ প্রামাণিক করুণ গলায় জোরে জোরে বলতে লাগলেন, 'আমার দোষ নাই কিন্তু। আমি কিসু করি নাই।'

৭

অনেক দৌড়োদৌড়ি করে মনোজ বর্মনের বাড়ি ফিরতে ফিরতে সাড়ে এগারটা বেজে গেল। রবির লাশ পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠিয়ে, থানার সঙ্গে কথাবার্তা সেরে, দলের নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে দশটা নাগাদ যখন বাজারের সামনে এল তখন দু-চারটে দোকান মাত্র টিমটিম করে খোলা। হাওয়া আর ঝিরঝির বৃষ্টির রাতে গুটিকয় লোক। আসলে গোপনে বাঙলা মদ বিক্রি হচ্ছে বলে সেগুলো খোলা। আচমকা রবির লাশ পাওয়ার খবরে প্রথমে জোর ঘাবড়ে গেছিল মনোজ। তারপর সব কিছু সামলাতে বিস্তর ধকল গেছে। রিয়া রাগ করলেও আজ বাঙলাই খেতে হবে তাকে।

কিন্তু ভাগ্য একটু ভাল ছিল। শস্তার হুইস্কির বোতল পাওয়া গেল একটা। সেটা ফাঁকা করে বেশ খানিকটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে বাড়িতে ফিরে বাইক দাঁড় করাতে করাতে মনোজের ইচ্ছে হল গুনগুন করে গান করতে। রবি মরেছে তো তাঁর কী? সে তো মারে নি। ব্যাটা কোথায় কী ঘাপলা করেছিল কে জানে। মেরে ভাসিয়ে দিয়েছে। থানার আইসি বলেছেন নিয়ম রক্ষার্থে তাঁরা কাল একবার আসবেন। হত্যার পেছনে অন্য কোনও গল্প আছে বলে তাঁদের বিশ্বাস।

যদিও পুলিশকে বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু এই মুহূর্তে মনোজের অনেকটা চাপমুক্ত লাগছিল। তবে বাবার কথা ভেবে গান না গেয়েই ভেতরে গেল সে। রিয়া টিভি দেখছিল। বেরিয়ে এসে বলল, 'হল সব কিছু?'

'পুলিশ বলছে কেসটার পিছনে কন্সপিরেসি আছে। কাল একবার আসবে তদন্ত করতে।'

'ডেড বডি?'

'গন্দ বারয় গ্যাসে।' নাক কুঁচকে বলল মনোজ। 'ভাবা যায়! রবিকে কেউ খুন করে জলে ভাসায় দিল! ভ্যান রিক্সাটা গেল কোথায়?'

'এখন তো মোবাইল থেকে অনেক কিছু জানা যায়।'

'মোবাইল শালার পকেটেই ছিল বুঝলা?' জামা-প্যান্ট ছেড়ে গামছা পরতে পরতে মনোজ জানাল। 'কল লিস্ট চেক করলে কিসু জানা যেতে পারে।' তারপর হুইস্কির দশা থেকে একটু বেরিয়ে এসে সিরিয়াস মুখ করে বউকে জিগ্যেস করল, 'বাবা কী করছে? শক তো পাইছেই।'

'শরীর খারাপ করেছিল শোনার পর। দোকান থেকে চলে এসেছে। ভাবছিলাম ডাক্তারকে ফোন করতে হবে। দরকার হয় নি। এখন ডিস্টার্ব করো না।'

মনোজ বাথরুমে চলে গেল। রবির কেস সোজা নয় সেটা সে বুঝতে পেরেছে। ময়নাগুড়ির আইসি'র ধারণা, হয় রবি কোনও বাজে ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিল নয় তো কোনও মেয়েঘটিত কেস। মোটামুটি বোঝা গেছে যে মাথার পেছনে জোর আঘাত করে অজ্ঞান করে দেওয়ার পর মুখে প্লাস্টিক পেঁচিয়ে খুন করা হয়েছে। মুখ আলাদা ভাবে প্লাস্টিকে পেঁচান ছিল। খুন করার পর বডিটা প্লাস্টিকের বড় বস্তায় ভরে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। কাল রাতে তুমুল বৃষ্টিতে নদীর জল ফুলে ওঠায় সেটা ভাসতে ভাসতে এসে ব্রিজের তলায় আটকে গেছে।

স্নান সেরে একটা বারমুডা পরে নিজের ঘরে টিভির সামনে বসল। খবরটা অল্প করে হলেও একটা চ্যানেলে দেখাচ্ছে। মনোজ চ্যানেলটা খুলে তাকিয়ে থাকল। এই মুহূর্তে জ্যোতিষি কুবের ভাই শনি-মঙ্গলের কম্বিনেশনের ফলাফল বোঝাচ্ছে। মনোজ মন দিয়ে তলা দিয়ে বয়ে যাওয়া লেখাগুলো পড়তে লাগল। তারপর তাঁর নাকে এলো একটা মিষ্টি গন্ধ। সে চোখ তুলে দেখল রিয়া ঘন সবুজ রঙের নাইটিটা পরে প্লেটে চা ভর্তি কাপ বসিয়ে ঘরে ঢুকেছে। এই নাইটিতে নিজের বউকে সব চাইতে ভাল লাগে মনোজের। নাইটির ধরনটাও কেমন খোলা খোলা। মনে হয় কাঁধ থেকে পিছলে পড়ে যাবে।

'এখন আবার চা খাব নাকি?' মনোজ ইতস্তত করে।

'নেশা কমে যাবে?' রিয়া সামান্য হাসে। 'সে জন্যই খাও। আমার কয়েকটা কথা আছে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ।' চায়ের কাপ টেনে নিয়ে সড়াৎ করে চুমুক দেয় মনোজ। রিয়ার বিচার-বুদ্ধির ওপর তাঁর আস্থা কম নেই। বিছানায় পা তুলে বসে সে সোজা হয়ে রিয়ার দিকে তাকিয়ে বলে, 'বলো।'

'কাল পুলিশ আসবে। আমাদের সন্দেহ করার মত কোনও ব্যাপার নেই তো?' রিয়া বিছানায় মুখোমুখি বসল। 'পুলিশ শুনেছি খুনের মামলা খুব সিরিয়াসলি নেয়।'

'ভয় করছে?'

রিয়া মাথা নিচু করে মৃদু স্বরে বলল, 'একটু।'

মনোজ খুশি হল। এই ভয় পাওয়াটাই প্রমাণ করছে রিয়া আসলে বউ। তাই পরের চুমুকটা ধীরে সুস্থে দিয়ে সে একটু হেসে বলল, 'আমাদের সন্দেহ করার মত তো কিসু নাই। তবে এইটা ঠিক যে রবিরে লাস্ট দেকসো তুমি। ঘি নিয়ে যাওয়ার পর কেউ আর ওকে দেখে নাই।'

'গুবলিও দেখেছে। ও তখন ছিল। আমার সঙ্গে গল্প করছিল।'

মনোজের মেজ কাকার বড় নাতি হল গুবলি। এগার ক্লাসে পড়ে। একটু সরল আর বোকা গোছের মেয়ে। দেখতে মিষ্টি। রিয়া কাকিমার বিশেষ ভক্ত।

'তাই?' মনোজ মাথা নাড়ায়। রিয়া শরীর থেকে আসা গন্ধটা একটু গোলমাল করছে। অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে সে। আরও একটা লম্বা চুমুক দিয়ে সে নড়েচড়ে নিয়ে বলল, 'তাইলে তো ভালোই হইসে। দুইজনা দেখিসে। এখন কাথাডা হইল্ উয়ায় কায় মারিল্?'

'কায় মারিল্?'

'কায় জানে কায় মারিল্!' মনোজ বিছানা ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। আসলে তাঁর ইচ্ছা করছিল রিয়াকে জাপ্টে ধরে শুয়ে পড়ে। তার জন্য একটু অপেক্ষা করতে হবে। অন্তরের ছটফটানি কমাতে সে রিয়ার থেকে একটু সরে এসে বলল, 'একটা খবর কিন্তু শুনলাম। পরেশ প্রামাণিকের মেয়ের সাথে নাকি রবির একটু ভাবসাব হইসিল। —তুমি কিসু জান?'

'দু-তিনদিন ওদের একসঙ্গে দেখা গেছে। জঙ্গলের দিকে। গুবলিও শুনেছে ওর বন্ধুদের কাছে।'

'তাই?' মনোজ অবাক হয়। 'দিনের বেলায় রবির ডিউটি থাকত না?'

'হাটবার না থাকলে তিনটের দিকে ও দোকান থেকে বের হত। ওই সময় দোকানে লোক খুব কম আসে।'

'পরেশের মেয়েটাকে পটাইসিল তার মানে!' মনোজ নিজের মনেই হাসে। 'তবে পরেশ মারবে না। ও শালার অত দম নাই। কিন্তু বাড়ি থেকে ঘি নিয়ে মালটা গেসিল কোথায়?'

'ওটাই তো ভয় লাগছে।' রিয়ার গলা শুকনো শোনাল। 'কেউ দেখে নি ওকে।'

'দেখতেই হবে তার মানে কী?' রিয়ার ভয় পাওয়াটা বেশ লাগছে মনোজের। বউ-এর পিঠে একটু হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে, 'সেদিন হাটবার সিল। ভ্যানরিক্সা তো কম চলে নাই। নিশ্চই কেউ না কেউ দেখসে। পুলিশ ওর ফোন সার্চ করলেই জানতে পারবে।'

'ভয় লাগছে। রবিকে কেন মারল? কী সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার!'

মনোজ একটু চুপ করে থেকে রিয়ার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'ভয় কাটানের উপায় আসে ডার্লিং।'

রিয়া সপ্রশ্ন চোখে তাকাল।

'খায় দায় নিই আগে। তারপর নাইটি খান খুলিম তর। এইসব সেক্সি ড্রেস পিন্ধিছিস— যৎ-নঅ করি খুলিম্।'

কাজ হলো কথায়। রিয়া দু-সেকেন্ড মনোজের দিকে তাকিয়ে থেকে খিলখিল করে হেসে ফেলল। মনোজ তাঁকে জাপ্টে ধরে একটু টিপে, অল্প চটকে, চকচকিয়ে কয়েকটা চুমু খেয়ে ছেড়ে দিয়ে কিঞ্চিৎ হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'চিন্তা নাই। তবে পরেশের মেয়ের কাথাডা কাউরে কহিস না। পুলিশ শালা মহা হারামি।'

রিয়া এবার স্বাভাবিক স্বরে জানাল যে তার বয়ে গেছে কিছু বলতে। এরপর সব অনেকটা সহজ হয়ে গেল। কাল পুলিস এলে কী বলা হবে কী হবে না, তা নিয়ে আলোচনা হল খেতে খেতে। অবশেষে কমলা রঙের রাত আলোয় রিয়াকে নাইটি থেকে মুক্তি দিয়ে মনোজ পরিকল্পিত খুনির মত একটু একটু করে খুন করতে শুরু করল তাঁকে। সেই খুনে যন্ত্রণা নেই। প্রতিটি আঘাতে থর থর করে কেঁপে উঠে রিয়া বুঝিয়ে দিল সে মরে যাচ্ছে। সুখ তাঁকে মেরে ফেলছিল। তাঁকে পিষতে পিষতে মনোজের মনে হল কন্ডোম একটা বাড়তি বিষয়।

কিন্তু উপায় নেই। অন্তত আজকে।

ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল।

৮

মাসখানেক পরের কথা। পুজো এসে গেল প্রায়। দুপুরের দিকে রোদ্দুর একটু তেজি থাকে। সেটা বাদ দিলে পরিবেশ মনোরম হয়ে উঠছে। ভোর বেলায় ঘাসপাতা হিমে ভিজে থাকছে। দু-সপ্তাহ কলকাতা-জলপাইগুড়ি কাটিয়ে নন্দন বর্মা গতকাল সন্ধে নাগাদ শালগুড়িতে এসেছেন আবার। রাধু বর্মন সকাল সকাল তৈরি হচ্ছিলেন বন্ধুর বাড়ি যাবেন বলে। সকাল সাড়ে সাতটা বেজেছে সবে। চমৎকার সকাল। রাধু বর্মন পায়ে পাম্প শু গলাতে গলাতে মোটর সাইকেলের শব্দ পেলেন।

'আরে মাস্টর যে!' সন্দীপ জানাকে বাইক থেকে নামতে দেখে রাধু বর্মন বেরিয়ে এলেন। 'আসেন আসেন।'

'মনোজবাবু?' সন্দীপ জানা এদিক ওদিক তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন। 'ঘুম থেকে উঠেছেন?'

'মনোজ তো দার্জিলিঙৎ। আপনে বসেন আমি একটু বাইরে যাই। বউমা!'

রিয়া ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে সন্দীপ জানাকে দেখে হাসিমুখে বলল, 'সে কী! আপনি? আসুন।'

'মনোজবাবু দার্জিলিং গেছেন শুনলাম। যাই তবে।'

'তা কি হয়। চা খেয়ে যান। ফোটোগুলো খুব ভালো হয়েছিল। ফেসবুকে ছেড়েছিলাম। দেখেন নি?'

'একদিন আপনাদের দু-জনের ফোটো তুলব। তা মনোজবাবু যে ব্যস্ত।' চটি খুলে বসার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সন্দীপ জানা বললেন। রিয়া মুচকি হেসে সামান্য শরীর মুচড়ে বলল, 'আজ ক্যামেরা নেই?'

'হ্যাঁ। ব্যাগে আছে।'

'আরেকদিন তুলে দেবেন তো। ফোন করে আসবেন। রেডি হয়ে থাকব।'

রিয়া একটা ফুলহাতা কোটের মত লাল রঙের পোশাক পরে আছে। চুল ঢিলে করে বাঁধা। সন্দীপ জানা তাঁর আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে বললেন, 'আপনার ফোটো সব সময় ভালো আসবে। আপনি হলেন ফোটোজেনিক।'

'ওর কাছে কী দরকার ছিল? স্কুলের ব্যাপার?' নরম গলায় জিগ্যেস করল রিয়া।

'হ্যাঁ, মানে —' সন্দীপ জানা থেমে গেলেন। রিয়া মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে মৃদু গলায় বলল, 'রবির ব্যাপারটা ওকে খুব আপসেট করে দিয়েছিল। তাই একটু ঘুরতে গেল। পরশু ফিরবে।'

'আমাদের কন্টাই-এর একটা ছেলে ময়নাগুড়ি থানায় আছে বলেছিলাম না?'

'তাই বুঝি?'

'তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।'

'কিছু বলল?' রিয়া একটু ঝুঁকে পড়ে। 'আইসি তো খালি বলছে কোনও ক্লু পাচ্ছে না।'

'রবির ফোন রেকর্ডটা তো জানেন বোধহয়?'

'আপনাদের মনোজবাবু জানে। আমাকে কিছু বলে নি। আপনার কিছু জানা থাকলে বলুন না প্লিজ!'

রিয়ার অনুরোধে সন্দীপ জানার বুক অবধি গলে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'না না! তেমন কিছু বলে নি। ওই যেটা জানা গেছে। আসলে

ইনভেস্টিগেশন ফাইনাল না হওয়া অব্দি সব কি বলা যায়?’

‘প্লি ই জ! চা করি?’

‘রবির ফোন বন্ধ হয়েছিল সেদিন চারটে দশে। জোড়াপাকুড়ির বাজারে।’

‘তাই?’ রিয়া মুখেচোখে কৌতূহল। ‘কেউ নিশ্চই ওকে জোড়াপাকুড়ি বাজারে দেখেছিল?’

‘কেউ দেখেনি। কী মিস্টিরিয়াস ব্যাপার বলুন তো!’

‘ভ্যান রিক্সাটাও নাকি পায় নি?’

রিয়ার চোখের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে অন্তরে চুমু খাওয়ার দুঃসাহস জেগে উঠছিল সন্দীপ জানার। তিনি অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন, ‘নদীটা কিন্তু বাজার থেকে দূরে নয়। সেটা বেশ নির্জন জায়গা। রবিকে সেখানেই খুন করে নদীতে ফেলে দিতে পারে।’

‘কেউ না কেউ তো দেখত তবে?’

রিয়া এবার স্বাভাবিক স্বরে জানাল যে তার বয়ে গেছে কিছু বলতে। এরপর সব অনেকটা সহজ হয়ে গেল। কাল পুলিস এলে কী বলা হবে কী হবে না, তা নিয়ে আলোচনা হল খেতে খেতে। অবশেষে কমলা রঙের রাত আলোয় রিয়াকে নাইটি থেকে মুক্তি দিয়ে মনোজ পরিকল্পিত খুনির মত একটু একটু করে খুন করতে শুরু করল তাঁকে। সেই খুনে যন্ত্রণা নেই।

‘মনে হয় ওকে জোড়াপাকুড়িতে আটকে রেখে রাতের বেলায় মার্ডার করেছে।’ সন্দীপ জানা আবার রিয়ার শরীর চোখ বুলিয়ে নিলেন। এমন বউকে মনোজবাবু কিছু বলেনি রবির ব্যাপারে! মালটা একটু গাড্ডু বটে! রিয়া মাথা নিচু করে কিছু ভাবছিল। চোখ তুলে যেন সন্দীপ জানাকে দেখেই নি এমন ভাব করে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে উদাস গলায় প্রশ্ন করল, ‘আমি একটা কথা শুনেছি।’

‘কোনটা?’

‘আপনি সত্যিটা বলবেন তো?’

‘আরে জানলে বলব না কেন!’

‘পরেশ প্রামাণিককে চেনেন?’

‘বুঝেছি আপনি কী জানতে চাইছেন। অ্যাবাউট হার ডটার —।’

‘ওয়াজ দেয়ার এনি রিলেশান বিটুইন বনানী এন্ড রবি?’

রিয়ার মুখে গোটা ইংরিজি বাক্য শুনে সন্দীপ জানা একটু থমকে গিয়ে সিরিয়াস মুখে বললেন, ‘ওদের দু-জনকে কিন্তু ঘুরতে দেখেছে বেশ কয়েকজন। পুলিশ জেরা করেছিল পরেশবাবু আর তাঁর মেয়েকে। সেখানেও তো একটা ব্যাপার ঘটেছিল -— তা জানেন কি?’

‘বনানী প্রথমে ওর বাবাকে সাসপেক্ট করেছিল। এটা ও বলেছে আমাকে।’

‘তারপর পুরো বাবার ফেবারে। এখন বলছে, রবির কিছু কিছু ব্যাপার ও জানত, কিন্তু ভেবেছিল লোকের প্রচার।’

রিয়া চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে সন্দীপ জানার চোখে চোখ রেখে একটু ভুরু নাচিয়ে বলল, ‘রবির সম্পর্কে খারাপ কথা শুনেছিল বলছেন? কিন্তু কে বলেছিল? রবির বিষয়ে তো কেউ বিশেষ কিছু জানেই না।’

সন্দীপ জানা কথাটা বুঝতে পেরে অবাক হয়ে বললেন, ‘এটা দারুন বলেছেন তো!’

‘মনে হয় বাবার চাপে পড়ে বনানী এসব পরে বলেছে। বসুন। চা আনি।’

হালকা হিল্লোল তুলে বেরিয়ে গেল রিয়া। সন্দীপ জানা বিস্মিত-মুগ্ধ চিত্তে বসে থাকলেন। এই রকম একটা ধারাল মেয়ে মনোজবাবুর বউ হয়ে কী ভাবে দিন কাটাচ্ছে! মনে হয় মেয়েটা বরের সঙ্গে বিশেষ কথা বলারই সুযোগ পায় না। আজকের পর তো মনে হচ্ছে একটু সাহস দেখালেই রিয়া আরেকটু ঢলে পড়বে!

সন্দীপ জানা মনে মনে উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। রিয়া তো মাঝেমধ্যে জলপাইগুড়ি যায় কেনাকাটা করতে। একদিন সঙ্গে গেলে হয় না?

একা একা সোফায় বসে পা নাচাতে নাচাতে ভাবতে লাগলেন সন্দীপ জানা। আগের দিন ছাগলকে দুধ খাওয়ানর সময় রিয়ার বুকের যে ক্লোজআপটা তোলা হয়েছিল সেটা দেখান কি ঠিক হবে? ছবিটা অবশ্য দেখার মতই উঠেছে। রিয়ার মুখটা সামান্য নিচে। চোখ দুটো তুলে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে। ব্লাউজের ফাঁক দিয়ে অনেকটা ক্লিভেজ। সন্দীপ জানা পরে মন দিয়ে দেখে উদ্ধার করেছে ডান দিকের বুকের একটু গভীরে একটা তিল আছে।

সন্দীপ জানা নিজের হাঁটুতে আলগা চাপড় মেরে নিজের মনেই বললেন, ‘নাঃ! একবারে এতটা এগোন উচিত হবে না। রবি মার্ডার কেস নিয়ে আরও তথ্য যোগার করে সেই অছিলায় মাঝে মাঝেই আসতে হবে।’

পর্দা সরিয়ে ট্রেতে চা আর বিস্কুট নিয়ে রিয়া ফিরে এল। ছোট একটা টুল টেনে নিয়ে সেখানে ট্রে-টা রেখে ধপ করে বসে পড়ল সন্দীপ জানার পাশে। একটা হালকা মিষ্টি গন্ধ ভেসে এ লো। এখন ইচ্ছে করলেই রিয়াকে তিনি ছুঁয়ে দিতে পারেন। রিয়া সাবধানে টুলটা সন্দীপ জানার হাঁটুর সামনে এনে দিয়ে বলল, ‘আপনাকে একটা প্রমিস করতে হবে।’

‘প্রমিস?’

‘রবির কেসের ব্যাপারে যা জানবেন এসে বলে যাবেন। সে আপনার মনোজবাবু থাকুক আর না থাকুক। আমার বুঝি শুনতে ইচ্ছে করে না?’

‘হ্যাঁ হ্যাঁ।’ সন্দীপ জানার মনে হলো শিক্ষক না হয়ে ময়নাগুড়ি পুলিসের খোচর হলে জীবন ধন্য হত। রিয়া তাঁকে আরও আপ্লুত করে দিয়ে হাত বাড়িয়ে বলল, ‘তবে প্রমিস?’

‘আর না বলার কী আছে?’

‘আমাকে ছুঁয়ে বলুন।’

সন্দীপ জানা হঠাৎ ভারি রোমান্টিক হয়ে গেলেন। রিয়া বাড়িয়ে দেওয়া করতলে হাত রেখে ধরা গলায় বললেন, ‘বিলিভ মি। প্রমিস!’

‘থ্যাঙ্কিউ!’

অসম্ভব মিষ্টি হেসে হাতটা সামান্য টিপে দিয়ে হাত সরিয়ে নিল রিয়া। নাভির খানিকটা নিচে হালকা বৈদ্যুতিক প্রবাহ অনুভব করলেন সন্দীপ জানা। নিজের হাতটা ফিরিয়ে আনার সময় আলগোছে ছুঁয়ে দিলেন রিয়ার হাঁটু। রিয়া যেন টেরই পেল না।

শরতের সকাল অতি চমৎকার। সন্দীপ জানার জানা ছিল। এতটা চমৎকার সেটা জানলেন।

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

স্কেচ স্বরূপ গুহ

শারদীয়া শুভেচ্ছাসহ

Lataguri Tour & Travel

Lataguri
Gorumara National Park
Jalpaiguri

DOOARS Hotel Booking, Tour Planning Car Booking.
DARJEELING Hotel & Car Booking.
BHUTAN Hotel & Car Booking.

BUBAI RAY
WhatsApp No.
9932017340
Contact No.
7797329740

হাংরি রিপোর্টার

বছর ঘোরার আগেই ‘ঘুষ’ নেওয়া টাকা ফিরিয়ে দিল দুই টিটিই

তুষার প্রধান

সাংবাদিক না হয়ে রাজনীতিকও হতে পারতাম! যখন শিলিগুড়ি কলেজে পড়ি, তখন পুরোপুরি নিজের ইচ্ছেয় না হোক, কলেজের ছাত্র সংসদের নির্বাচনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম। প্রো-ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে ক্যান্ডিডেট হয়েছিলাম। আমাকে রাজনীতিতে মনস্ক করার জন্য সে সময় ব্যাপক তৎপরতা নিয়েছিল গৌতম দেব। এখন যিনি পর্যটন মন্ত্রী। গৌতম দেবের কথায় আশ্বস্ত হয়ে, সেটা সম্ভবত ১৯৭৬ সালের ছাত্র সংসদ নির্বাচনের কথা, বড় পদের জন্য লড়াইয়ে সামিল হয়ে গিয়েছিলাম। সেবার থেকেই মূলত ছাত্র পরিষদের দিনকাল ক্রমশ খারাপ হয়ে আসছিল। জয় পরাজয়ের নিরিখে ছাত্র পরিষদের ততদিনে দিকে দিকে পরাজয় শুরু হয়ে গিয়েছে। আমার যেহেতু কোনও রাজনৈতিক দূরদর্শিতা কোনও কালেই ছিল না, তাই কিছুটা আঁচ পেলেও নিজের যোগ্যতার ওপর গভীর আস্থা ও বিশ্বাস রেখে ভোটে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম। আমার এখনও মনে পড়ে, সে সময় সংস্কৃতি-অপসংস্কৃতির ধ্বজাধারীদের মধ্যে ব্যাপক লড়াই শুরু হয়ে গেছে। যেসব বিষয়কে নগ্নতা বলে অপসংস্কৃতির শিলমোহর লাগানো হচ্ছিল, আমি ছিলাম তার বিরুদ্ধে। এসব তথাকথিত নগ্নতার অভিযোগে দুয়ো দিতে আমি বিশ্ব শিল্প-সাহিত্যের নানা প্রান্ত ও প্রত্যন্ত থেকে উদাহরণ তুলে বক্তৃতা করতাম। আমার বক্তৃতায় যেহেতু বিতর্কের বিষয় থাকত প্রচুর, তাই ক্লাসে ক্লাসে এবং কলেজ-ইউনিভার্সিটির ছাত্র জমায়েতে যখন বক্তৃতা করে বেড়াতাম, তখন শ্রোতার অভাব হত না।

তবে শুধু বক্তৃতায় তো ভোটের বাক্স ভরে না! শেষমেশ দেখা গেল, আমার পাশাপাশি ছাত্র পরিষদ থেকে জেনারেল সেক্রেটারি পদে দাঁড়িয়েছেন যিনি, তিনি আমার থেকে অনেক কম ভোট পেলেন বটে, কিন্তু দু'জনের কেউই জয়ী হতে পারলাম না। সেবারের ভোটে এসএফআই থেকে আমার বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিল নুরুল ইসলাম। পরবর্তীতে একটা সময় শিলিগুড়ির মেয়রও হয়েছিল নুরুল। নানাভাবে জনপ্রতিনিধি তো থেকেইছে। তবে ওই যে কলেজের ছাত্র সংসদের ভোটে হেরে গেলাম, তখন থেকে আর রাজনীতির ধার মারাতাম না। যদিও তখন এসএফআই-এর পল্লবকান্তি রাজগুরু ছিলেন আমার প্রাণের বন্ধু এবং সহপাঠী।

শিলিগুড়ি কলেজ প্রসঙ্গে আরও দুটো লাইন এই ফাঁকে বলে নিতে চাই। সেটা হল, যেবার বাংলা অনার্সের ছাত্র হলাম, সেবারেই শিলিগুড়ি কলেজের ইংরেজি বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন সমর চক্রবর্তী। এখন কবি সমর চক্রবর্তী নামেই যিনি বেশি বিখ্যাত। এই সমর চক্রবর্তীর নাম উল্লেখ করার একটা কারণ, উনি যেদিন প্রথম ক্লাস নেন, দু' চারটে প্রশ্ন করেন। সেদিন কেউ তার উত্তর না দিতে পারলেও আমি পেরেছিলাম। তার পুরস্কার হিসেবে ক্লাসের শেষে সমর স্যার আমাকে একটা সিগারেট গিফট করেছিলেন। বলেছিলেন, তোমাকে আমার ভাল লেগেছে তাই এই সিগারেট ‘উপহার’। অধ্যাপক তাঁর ছাত্রকে এভাবে পুরস্কৃত করছেন এটা আমার কাছে ভালই লেগেছিল। এরপর কখনও সখনও সমর স্যারের কাছ থেকে সিগারেট নিয়েছি চেয়ে। স্যারও খুশি মনেই দিয়েছেন।

রাজনীতির জগতে তিনি শিলিগুড়িরই হোন কিংবা দার্জিলিং বা আলিপুরদুয়ারের, পরবর্তী জীবনে এঁদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ক্ষেত্রে কলেজে ভোটে দাঁড়ানোর কোনও লিঙ্ক কিন্তু কখনওই আমি খুঁজে পাইনি। অতএব কলেজে ভোটে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অধিকারী হয়েছিলাম, একথা আমি আজও বলতে পারি না। তবে বিভিন্ন কাগজে সাংবাদিকতা পেশায় জুড়ে যাওয়ার সূত্রে আমার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারটি বিপুল এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সব উল্লেখযোগ্য ঘটনা যদি বলতে যাই, তাহলে রামায়ণ হয়ে যাবে। আমি মূলত ‘সহজ পাঠ’ প্রেমী একজন মানুষ, তাই সহজ পাঠের মধ্য দিয়ে যতটুকু বলা যায়, ততটুকুই বলার চেষ্টা চালাব।

আজ তারই একটা ঘটনার কথা বলি। তখন আমি সাংবাদিক হিসেবে বেশ পোড়খাওয়া হয়ে গিয়েছি। উত্তরবঙ্গ সংবাদ, হিমালচলী, জনপথ সমাচার... এসব করতে করতে ‘ডানপথ’ নামে একটি সান্ধ্য দৈনিক শিলিগুড়ির বুকে নামিয়ে দিয়ে, আমি নই, আমরা দেখিয়ে দিয়েছিলাম, নির্ভীক সাংবাদিকতা কারে কয়। সে থাক গে, এখনই ডানপথের কথা বিশদে বলতে চাইছি না, শুধু এটুকু বলতে চাইছি, নির্ভীকতা এবং সততার দৌড় জানা থাকলে অনেক দূর পর্যন্ত দৌড়ানো যায়। কারণ, যে ঘটনার কথা বলছি, তা হল, ট্রেনে আসন সংরক্ষণ করে দেওয়ার অছিলায় একবার আমাদের কাছ থেকে দুই টিটিই চারশো টাকা নিয়েছিল। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সে টাকা ফেরত দিতে হয়েছিল তাঁদের।

২০০৬ সালের ২৪ অক্টোবরের ঘটনা। তার কয়েকদিন আগে আমরা তিন জন সাংবাদিক উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়েছিলাম, টিভি-র জন্য ডকুমেন্টারি করা এবং কিছু খুচরো সংবাদের কাজ করতে। ফেরার টিকিট কাটা ছিল উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসে। ওয়েটিং লিস্টে যে জায়গায় ছিল (থ্রি টিয়ারে ৩১, ৩২, ৩৩) তাতে টিকিটগুলি কনফার্মড হয়ে যাবে, এই বিশ্বাসে ভর করে আমরা চলে গিয়েছিলাম গরুমারায়। আমাদের আস্থা ছিল, তখন যিনি এনজেপি-তে রেলের সিনিয়র পিআরও হিসেবে কাজ করছেন, তিনি আমাদের কথা দিয়েছিলেন, যেদিন আমাদের ফেরা সেদিন যেন আমরা ওঁকে পিএনআর এসএমএস করে দিই। উনি তখন ‘কনফার্মড’ করে দেবেন। লাটাগুড়ি তথা গরুমারার দিকে যাঁরা আগে গেছেন, দেখেছেন টাওয়ার পাওয়া যায় না। আমাদের মাথায় সেই ‘টাওয়ার না পাওয়ার কথা’ থাকার কথা নয়। আমরা সেদিন ফোনের লাইনে ঢুকতে না পেরে দুপুরের অনেক আগেই সিনিয়ার পিআরও তারকনাথ ভট্টাচার্যের মোবাইলে এসএমএস করে টিকিট কনফার্মেশনের জন্য রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছিলাম। আমাদের বিশ্বাসে ছিল, এখন না হোক পরে অন্তত তিন ঘণ্টার মধ্যে যে কোনও সময় ওই এসএমএস নিশ্চয়ই তারকনাথ ভট্টাচার্যের নম্বরে ঢুকে যাবে। কিন্তু কপাল যখন খারাপ হয়, তখন স্টেপনি চাঙ্গা থাকলেও দু'চাকা একসঙ্গে পাংচার হয়। সেদিন আমাদের হয়েছিল সেই অবস্থাই। গাড়ি ছাড়ার মিনিট পাঁচ কি দশ আগে আমরা যখন উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস ধরার জন্য এনজেপি স্টেশনে পৌঁছেছিলাম, তখন দেখি আমাদের টিকিট আনকনফার্মড। দু' চারটে ক্রমিক নম্বর কমে টমে একটু নড়েচড়ে বসেছে এই যা।

আমাদের সঙ্গে দূরদর্শনের কাজ করার জন্য বড় মুভি ক্যামেরা এবং স্টিল ছবি তোলার দামি ক্যামেরা। এই দুটো জিনিসকে অক্ষত অবস্থায় নিয় যেতে গেলে রিজার্ভেশন কম্পার্টমেন্ট ছাড়া উপায় নেই। অন্য কোনও ট্রেনে রিজার্ভেশন পাওয়ার চেষ্টা করতে গেলে হাতের পাঁচ ‘উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস’-ও যাবে চলে। অগত্যা সাহসে ভর দিয়ে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের থ্রি টিয়ার কোচ এস-৪ এ উঠে পড়লাম। ট্রেন ছাড়ার পর টিটিই-র সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে গন্ধ পেলাম, এই কামরায় বেশ কিছু আসন খালি আছে। আসলে কোনও বড় পর্যটক দল হয়ত ট্রেন মিস করেছে। সেই দলের সদস্য সংখ্যা ৬ থেকে

৮ হতে পারে। এস কে সিং নামে এক টিটিই-কে বলেই বসলাম, আমাদের তিনটি বার্থ চাই। উনি ওঁর চেয়ে লম্বা ফর্সা এবং স্বাস্থ্যবান এক টিটিই-কে দেখিয়ে দিলেন। বললেন, ওঁর সঙ্গে কথা বলুন। এস কে সিং যাঁর সঙ্গে কথা বলতে বললেন, তাঁর বুকে নেমপ্লেট ছিল না। তবে কায়দা করে নাম জেনে নিলাম— নবীন চৌধুরী। আমাদের তিনটে বার্থ দরকার শুনে উনি কোনও ধানাই পানাই করলেন না। বললেন, ২০০ টাকা করে পড়বে প্রতি বার্থে। তিনজনে ৬০০ টাকা দিতে হবে। ৬০০ টাকা দেওয়া মাত্রই টিকিট অর্থাৎ বার্থ কনফার্মড হয়ে যাবে।

আমি আবার এস কে সিং-এর দ্বারস্থ হলাম। বললাম, কামরায় তো যাত্রী অ্যাবসেন্ট আছে, সেখানে আমাদের দিয়ে দিন না। এস কে সিং আমাদের যা কথা বলার নবীন চৌধুরীর সঙ্গেই বলতে বললেন। নবীন চৌধুরীকে অনেক অনুরোধ, উপরোধ করার পর উনি তিন জনের আসন সংরক্ষণ হেতু ৪০০ টাকায় রাজি হলেন। এর আগে নবীন চৌধুরীকে আমি এ-ও বলি যে, ৬০০ টাকা আসন সংরক্ষণের জন্য দিলে আমাদের খাবার কেনার টাকা থাকবে না। ক'দিন বাইরে থেকে কাজকর্ম করতে গিয়ে পকেটে যা টাকা পয়সা ছিল, সব খরচ হয়ে গেছে। প্রথমে আমাদের এস-৫ কামরায় জায়গা করে দিয়েছিলেন। পরে গাড়ি কিষাণগঞ্জে ঢুকলে নবীন এসে আমাদের সিট নম্বর এস-৪-এ চেঞ্জ করে দেন। বলেন, আপনারা এস-৪-এর ২৫, ২৬, ২৭ (থ্রি টিয়ার) স্লিপারগুলিতে চলে যান। এরপর টিকিটের ওপর সেই ২৫, ২৬,২৭ লিখেও দেন। আমরা ৪০০ টাকা দিয়ে নিরাপদে যাত্রার গ্যারান্টি পাই।

যাত্রীরা কোনও কারণে আসেনি বলে কয়েকটা আসন খালি, সেই আসনগুলি নিয়ম অনুসারে আনকনফার্মড রয়েছে যাঁদের টিকিট, সেইসব দাবিদারদের মধ্য থেকে পাওয়ার কথা। সেই আসন টিটিই দুজন আমাদের বেচে দিল! কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারছিলাম না, এই ধরনের অন্যায় তৎপরতা। কিন্তু উপায়হীন। তবে সঙ্গী দুই সাংবাদিককে বলেই বসলাম, এভাবে যখন টাকা নিল, কলকাতায় পৌঁছে আমার প্রথম কাজ হবে, বাড়িতে স্নানটা সেরেই রেল কর্তৃপক্ষকে কমপ্লেন করতে বসা। পরদিন বাড়ি পৌঁছে জেনারেল ম্যানেজার, এনএফ রেল, মালিগাঁও লিখে চিঠি ছেড়ে দিলাম। রেলের জিএম (গ্রিভান্স সেল) থেকে এনকোয়ারি শুরু হল। ওদের এনকোয়ারিং অফিসারেরা এটা বুঝতে পারলেন, টিকিট তিনটি কনফার্মড করে দেওয়ার জন্য উৎকোচ নেওয়া হয়েছে। মালিগাঁও রেল সদর থেকে কাটিহারকে বলা হল, অভিযোগকারীর সামনে সেদিন থ্রি টিয়ারে যত টিটিই-র ডিউটি ছিল, তাঁদের দাঁড় করাতে।

রেল থেকে আমার কাছে কমপ্লিমেন্টারি পাস চলে এল। সে পাস দেখালে গাড়িতে মুফতে আসন সংরক্ষণ (যাতায়াত)। আমাকে প্রথমে বলা হল, কাটিহারে তদন্তের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, আপনি অমুক তারিখে তদন্ত বোর্ডের সামনে হাজির হোন। আমি সেই চিঠি পাওয়ার পর কাটিহারের সংশ্লিষ্ট রেল আধিকারিককে জানালাম, আমি কাটিহারে গিয়ে ঘুষখোর দুই টিটিই-র বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে ভয় পাচ্ছি। কারণ, দুই ঘুষখোরের মধ্যে একজনের বাড়ি কাটিহারে। আমি তাঁকে দোষী প্রতিপন্ন করলে তাঁর চাকরির ওপর আঘাত আসবে। আর চাকরির ওপর আঘাত এলে, সে আঘাত কতটা গুরুতর হবে, উনি তা আমার চেয়ে বেশি জানেন, তাই উনি আমাকে ছেড়ে দেবেন না। মোদ্দা কথা, আমার ওপর হামলা হতে পারে, সে কথা স্পষ্ট করেই জানালাম। একই সঙ্গে আর্জি জানালাম, আমাকে এই তদন্তের তাগিদে নিউ জলপাইগুড়ি কিংবা শিলিগুড়ি জংশনে ডাকা হলে, আমার যেতে আপত্তি নেই।

রেল এরপর ঠিক করল, নিউ জলপাইগুড়িতে হবে এই 'কনফ্রন্টেড এনকোয়ারি'। আমাকে ফের কমপ্লিমেন্টারি পাস পাঠাল। সেই পাস নিয়ে বিবাদী বাগে যেখানে রেলের টিকিট সংরক্ষণের কাউন্টার রয়েছে, সেখানে গেলে, ওঁরা আমার হাতের ওই লালরঙা পাস দেখে আমাকে অফিসের ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসায়। বলে, এই ধরনের পাস হাতে থাকলে

ওদের এনকোয়ারিং অফিসারেরা এটা বুঝতে পারলেন, টিকিট তিনটি কনফার্মড করে দেওয়ার জন্য উৎকোচ নেওয়া হয়েছে। মালিগাঁও রেল সদর থেকে কাটিহারকে বলা হল, অভিযোগকারীর সামনে সেদিন থ্রি টিয়ারে যত টিটিই-র ডিউটি ছিল, তাঁদের দাঁড় করাতে।

রেল নিজের গরজে তার রিজারভেশন করে দেয়। এই পাস হাতে থাকলে রিজার্ভেশন কনফার্মড। ওয়েটিং লিস্টের কোনও ব্যাপারই নেই।

২০০৭ সালের ৪ আগস্ট গিয়ে পড়ল কনফ্রন্টেড এনকোয়ারির তারিখ। ৩ আগস্ট রাতে দার্জিলিং মেলে রওনা দিলাম। নিউ জলপাইগুড়িতে ট্রেন ঢুকতে না ঢুকতেই স্টেশন জুড়ে মাইকে ঘোষণা, আমার নাম করে স্টেশন ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করার সনির্বন্ধ অনুরোধ। স্টেশন ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে পরিচয় দিতেই উনি আমাকে একজন রেলকর্মীকে দিয়ে এনজেপি স্টেশনের ওপরতলায় এসি রিটায়ারিং রুমে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। সেখানে ঢুকে অ্যাটাচড বাথে স্নান করতে না করতেই ব্রেকফাস্ট এসে যায়। দুপুরে কী খেতে চাই, তার অর্ডার নিতেও চলে আসেন একজন। রিটায়ারিং রুমকে ঘিরে সে ব্যাপক উদ্দীপনা। মাঝে মধ্যে রেলকর্মীদের মধ্যে অতি উৎসাহীরা এসে উঁকিঝুঁকি মারার চেষ্টা করছেন। প্রত্যেকেরই একই কথা, এত টিটিই-কে কেন আজ এখানে তলব করা হয়েছে।

কাটিহার থেকে এনকোয়ারির জন্য বড় যে রেল আধিকারিকের আসার কথা, তাঁর একটু দেরি হয় আসতে। 'ট্রেন লেটের জন্য দেরি' বলে দুঃখপ্রকাশ করেন তিনি। কাটিহারের সেই রেল অফিসার আসার পর বাইরে অপেক্ষমান টিটিই-দের সার করে আমার ঘরে ঢোকানো হয়। সে ঘরে তখন দুই রেল আধিকারিক আর আমি। আমাদের সামনে দিয়ে সেদিনের থ্রি টিয়ারে ডিউটিতে থাকা টিটিই-দের হেঁটে যেতে হল। কাটিহার থেকে আসা আধিকারিক আমাকে বললেন, কে কে ছিল সেদিন ঘুষ নেওয়ার সময় আইডেন্টিফাই করুন। নবীন চৌধুরী সামনে দিয়ে যেতেই আমি ওর হাত 'খপ' করে ধরে চিৎকার করে উঠলাম, হ্যাঁ এই সেই লোক যে সেদিন আমার কাছ থেকে রিজার্ভেশন কনফার্মড করতে ৪০০ টাকা নিয়েছিল। এস কে সিং-ও টিটিই-দের লাইনে ছিল। কিন্তু সেদিন নিজেকে বাঁচানোর জন্য গোঁফ দাড়ি সব ছেঁটে হাজির হয়েছিল, তাই আমার সামনে দিয়ে পাস করলেও চিনতে পারিনি।

নবীন চৌধুরীকে সনাক্ত করে ফেলায় কাটিহার থেকে আসা অফিসার তাঁকে বললেন, আভি তো তুমহারা নৌকরি চলা জায়গা। ততক্ষণে আমার দুপুরের খাবার এসে গেছে ঘরে। ওঁরা সব বাইরে গেলেন। আমি খেয়ে দেয়ে নেওয়ার পর নবীন চৌধুরীকে আবার ডাকলেন কাটিহারের সেই রেল আধিকারিক। নবীন কার্যত আমার হাঁটুর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। বললেন, মাফ করে দিতে। এদিকে কান টানলে যেমন মাথা আসে, তেমনই ওই রেল আধিকারিক জিজ্ঞাসাবাদের পর চলে যেতেই এস কে সিং-কে নিয়ে নবীন চৌধুরী আমার ঘরে ঢুকে গেল। নবীন জোর করে সেদিনের নেওয়া ৪০০ টাকা নগদে আমার পকেটে জোর করে ঢুকিয়ে দিল। তারপর দু' চোখের কোল দিয়ে অশ্রুধারা বইয়ে দিতে দিতে বলল, আপনি কমপ্লেন উইথড্র করে না নিলে আমার চাকরিই চলে যাবে। ঘরে আমার বৌ, বাচ্চা আছে।

অন্যদিকে এস কে সিং আমাকে তখন অফার দিচ্ছে স্টেশনের বাইরে আপনার জন্য মোটরগাড়ি রাখা আছে, আপনি চাইলে কার্শিয়াং-কালিম্পং ঘুরে আসতে পারেন। আর শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডে 'কিথানিয়া' দোকান অর্থাৎ বিন্নির শো রুমে চলে যান, দু' চার পিস স্যুট লেংথ যা লাগে নিয়ে নিতে পারেন। আমি যত বলি, ঘুষ ব্যাপারটাকে ঘৃণা করি বলেই না এভাবে কমপ্লেন করতে বাধ্য হয়েছিলাম। কিন্তু ওদের কাকুতি মিনতি করা যেন থামতেই চায় না। এত হাতেপায়ে ধরাধরি করার পর একটা সময় আমি ওঁদের কথা দিই, কারও চাকরি যেহেতু খেতে পারব না, তাই দেখছি কী করা যায়। তবে কমপ্লেন আমি উথড্র করব না।

শেষমেশ নবীন চৌধুরী এবং এস কে সিং-এর পরিবারের কথা ভেবে আমি লিখি, সেদিন রিজার্ভেশন নিয়ে টাকা পয়সার লেনদেনে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল অন্য কোনও যাত্রীর হিসেবের সঙ্গে। সেটুকু কথাকে ম্যানেজ করার জন্য একটু সাজিয়ে গুছিয়ে লিখে দিয়েছিলাম বটে। তবে পরে আমার যেটা মনে হয়েছিল, নবীন চৌধুরী এবং এস কে সিংকে বাঁচানোর জন্য কাটিহারের সেই আধিকারিক প্ল্যান ট্যান ছকে এসেছিলেন। ওঁরা কোনওভাবে রেলের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে শেষমেশ ম্যানেজ দিতে পারেন। কারণ, পরবর্তীতে নবীন চৌধুরী এবং এস কে সিং এই দুই টিটিই-কেই দেখেছি আমি। অর্থাৎ ওঁদের চাকরি যায়নি, হয়ত দু'-চারদিনের জন্য সাসপেন্ড হয়ে থাকতে পারেন।

পুজোয় ওরা সবাই কিন্তু বাড়ি ফিরতে পারে না

উত্তরপক্ষ

প্রশান্ত নাথ চৌধুরী

উত্তরবঙ্গের বহু ছেলে বাইরে দক্ষ বা অদক্ষ শ্রমিকের কাজ করতে যায়। পানিপথের লাইন হোটেলে বা দিল্লির পাহাড়গঞ্জের খাবারেরদোকানে তাদের দেখা যায়। বেঙ্গালরুর হোটেলে বাঙ্গালি ওয়েটারদের প্রচুর চাহিদা, বেতন চলনসই। কর্নাটকে প্রায় দশ লক্ষ বঙ্গভাষী বাস করে। কেরলে আনুমানিক নব্বই শতাংশ শ্রমিক পশ্চিমবঙ্গ থেকে যায়।

হালকা শীতের রাত। গতানুগতিক বিলম্বে চলা ব্রহ্মপুত্র মেলে নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন থেকে ট্রেনে চেপে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে ফিরছিলাম। ইঞ্জিনের খুব কাছেই জেনারেল কামরা, ভিড়ে ঠাসা। কষ্ট করে ভিতরে ঢুকে দাঁড়ালাম। কিছুক্ষণ পরে সিটে বসা একজন যুবক জানতে চাইল কোথায় যাচ্ছি। গন্তব্য জানাতেই চেপেচুপে আমাকে একটু বসার জায়গা করে দিয়েছিল। আলাপ হতে জেনেছিলাম ওরা দু-ভাই দিল্লিতে নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করে। বাড়ি কামাখ্যাগুড়িতে। শ্বশুরবাড়ি বঙ্গাইগাঁও, সেখানে ওর দু'বছরের শিশু ও স্ত্রীকে রেখে দিল্লি যাচ্ছে রোজগার করতে। ছেলেটি দুর্গা পুজোয় বাড়িতেই কাটিয়েছিল, কিন্তু ওর দাদা দিল্লিতে। দু'জনের একসঙ্গে ছুটি মিলবে না। ও দিল্লি গেলে দাদা বাড়িতে আসবে কালি পুজোয়। বঙ্গাইগাঁও থেকে ওর বৌ ছেলেকে দাদা বাড়িতে নিয়ে আসবে ভাইফোঁটার পরদিন। কিছুদিন পর দাদা দিল্লি ফিরে এলে বাড়িতে থাকবে মা, বৌদি, স্ত্রী, দাদার দুই মেয়ে আর ওর ছেলে। দেড় বিঘে চাষের জমির দেখাশোনা ওদের মা করেন। সুন্দর চেহারার তরুণ, বয়স মাত্র ২৯। বিএ দ্বিতীয় বর্ষ পর্যন্ত পড়েছিল। ওর চোখেমুখে বিষণ্ণতার ছায়া দেখেছিলাম সেদিন। বাড়িতে মা ও বৌদির কাছে দু'বছরের শিশুপুত্র ও স্ত্রী থাকবে, ছেলেটি পড়ে থাকবে কত দূরে। এই ক'টা দিন বাচ্চাটা 'বাবা বাবা' ডেকে ওর চারপাশে ঘুরঘুর করে বেড়াত। মন খারাপ তো হবেই।

ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম 'দিল্লিতে কেন? গ্রামে কাজ নেই?' উত্তরে ও বলেছিল, ওখানে দৈনিক মজুরি ৫০০টাকা, অতিরিক্ত সময় কাজ করলে ঘণ্টায় ৬০ টাকা। এই রোজগার এখানে পড়ে থাকলে তো হবে না! দিল্লিতে সাইট বা নির্মাণস্থলের কাছেই টিনের চাল ও টিনের বেড়া দেয়া ব্যারাকে রাত্রিবাস। ছোটছোট খুপরি ঘর প্রচন্ড গরম, তাই সবাই ঘরের বাইরেই খাটিয়া লাগিয়ে ঘুমায়। সপ্তাহের মজুরি শনিবার দেয়। রবিবার ছুটি। ওরা ব্যাঙ্কে টাকা জমা করে। স্ত্রীর সাথে যৌথ অ্যাকাউন্ট আছে এবং এ.টি.এম. কার্ডটিও স্ত্রীর কাছেই আছে। সে প্রয়োজন মত টাকা তোলে। দিল্লিতে দুই ভাই-এর কাছে দুটি মোবাইল ফোন এবং বাড়িতে একটি মোবাইল ফোন আছে। তিনটির সিম একটি বিশেষ কোম্পানির, অফার আছে 'আনলিমিটেড টক টাইম'। কাজেই বাড়িতে যত ইচ্ছে কথা বলা যায়!

উত্তরবঙ্গের বহু ছেলে বাইরে দক্ষ বা অদক্ষ শ্রমিকের কাজ করতে যায়। পানিপথের লাইন হোটেলে বা দিল্লির পাহাড়গঞ্জের খাবারেরদোকানে তাদের দেখা যায়। বেঙ্গালরুর হোটেলে বাঙ্গালি ওয়েটারদের প্রচুর চাহিদা, বেতন চলনসই। কর্নাটকে প্রায় দশ লক্ষ বঙ্গভাষী বাস করে। কেরলে আনুমানিক নব্বই শতাংশ শ্রমিক পশ্চিমবঙ্গ থেকে যায়। বঙ্গজ শ্রমিকদের কেরলের মানুষজন পছন্দ করেন বলেই মনে হয়। একবার কেরলবাসী এক গাড়িচালক আমার সাথে কোচিতে তিনদিনের ট্যুরে ছিল। ছেলেটি আমাকে বুঝিয়েছিল, বাঙ্গালিরা প্রায় সবাই সৎ এবং রান্না খুব ভাল জানে। সেবার কাজেও পটু। কেরলের অনেকে উচ্চশিক্ষা নিয়ে বিদেশে কর্মরত, তারা দেশে ডলার পাঠায়। বাবা মার জন্য দেশে বড় বাড়ি বানিয়ে দিয়েছে। এমন সব বয়স্ক মানুষদের দেখাশুনো করার জন্য বাংলার তরুণ তরুণীদের কেরলে নাকি প্রচুর চাহিদা। ছেলেটিআরও জানিয়েছিল কেরলে ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, টাইলস মিস্ত্রি, ফ্রিজ ও এসির কাজ জানা লোকের প্রচুর কাজ আছে।

একসময় আইকার্ড নামে এক সর্বভারতীয় স্বেচ্ছাসেবি সংস্থা একটা ক্ষেত্র সমীক্ষা চালিয়েছিল, বিষয় ছিল উত্তরবঙ্গের শ্রমিকরা বাইরের রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে কেমন থাকে? বিপদে পড়লে কে সাহায্য করে? দেখা হয়েছিল গ্রামের এক নির্মাণ শ্রমিকের সঙ্গে। সে কেরলে থাকাকালীন ট্রেনে স্থানান্তরের সময় পড়ে যায় এবং একটা পা কাটা যায়। ছেলেটির ক্ষতিপূরণের মামলা চলছিল কেরলে। সরকারি উদ্যোগে একজন আইনজীবি নিযুক্ত ছিলেন। আমরা এখান থেকে তার সাথে যোগাযোগ করি। অত্যন্ত ভদ্রমানুষ। ছেলেটি প্রায় বিনা ঝঞ্ঝাটে ক্ষতিপূরণের টাকা পেয়েছিল। এটা বুঝেছিলাম অন্য রাজ্যের তুলনায় কেরলে শ্রমিকদের বাসস্থান, চিকিৎসা, মজুরি বেশ ভাল।

২০১২ সনের ডিসেম্বর মাসের এক হাড় কাঁপানো শীতের সকালে অরুণাচল প্রদেশের বমডিলায় রাস্তায় হাঁটছিলাম। একটি লোক পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল। হাতে ধরা স্বচ্ছ প্লাস্টিকের ক্যারি ব্যাগে কিছু আনাজ। লোকটিকে প্রথম দর্শনেই বঙ্গজ মনে হল। ডেকে সরাসরি বাংলায় জিজ্ঞেস করলাম, ভাই এখানে সবজির দাম কেমন? আমার অনুমান সঠিক হতেই জিজ্ঞেস করলাম 'বাড়ি কোথায় ভাই?'। জানতে পারলাম, ওর বাড়ি দিনহাটার কাছে মাতালহাট গ্রামে। বয়স ৩৩-৩৪। বাড়িতে বিধবা মা, স্ত্রী ও তিন সন্তান। বমডিলায় জনমজুরি বেশি, থাকার জায়গা আছে। ও রাজমিস্ত্রির সহযোগীর কাজ করে। বাড়ির জন্য তার সর্বদাই মন খারাপ লাগে। কালিপুজোর পরদিন বাড়ি ছেড়েছে, জানুয়ারি শেষ হলে আবার বাড়ি যাবে। জিজ্ঞেস করেছিলাম 'একশ দিনের কাজ কি মাতালহাটে পাওয়া যায় না?' ও বলেছিল, তা পাওয়া যায় কিন্তু লোক অনেক, তাই বছরে ৪০-৫০ দিনের বেশি জোটে না। অন্যের জমিতেও জনমজুরের কাজও অনিয়মিত। মা ও বৌ এর নামে জব-কার্ড আছে ওরাও মাঝেসাঝে একশ দিনের কাজ পায়। কিন্তু ওতে সারাবছর সংসার চালানো মুসকিল। তাই নিরুপায় হয়েই ছাড়তে হয় ঘর। সেদিন ওর কষ্টটা বুঝেছিলাম। উপলব্ধি করেছিলাম নিজের গ্রামে নিয়মিত কাজ পাওয়া গেলে ছেলেটি বাড়ি ছেড়ে দূর দেশে কিছুতেই আসত না।

দেশের মানুষের দেখা পেয়ে আপ্লুত ছেলেটি খানিক বাদেই ফিরে এসেছিল, 'আমাদের ঘরের লেবার বন্ধুরা আপনাদের দেখতে চায়। আপনাদের চা খাওয়াবে।' এবার আমাদের আবেগাপ্লুত হওয়ার পালা। ফিরে এসে ছেলেটিকে কেন্দ্র করে একটা ছোট্ট ফিচার সংবাদপত্রে লিখেছিলাম। সে লেখা পড়ে পাঠকের মন খানিক সিক্ত হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু সেই ছেলেটি কি কাজের নিশ্চিত সংস্থান পেয়ে নিজের গাঁয়ে ফিরতে পেরেছে?

তখন প্রশাসনিক কাজে প্রায়ই কোচবিহার জেলার এক প্রান্তিক গ্রাম কুচলিবাড়ি যেতে হত। কুচলিবাড়িতে যে হাটটি বসে তার নাম ধাপড়াহাট। সম্পূর্ণ কৃষিনির্ভর অর্থনীতি। আর বাংলাদেশ বর্ডার সংলগ্ন এলাকায় চিনি, সুপারি, লবণ ইত্যাদির কিছু লেনদেন চলে। সে সময় একবার কুচলিবাড়িতে গিয়ে দেখি, একটা মাঠের ধারে একটি বড় বাস দাঁড়িয়ে, বাস ভর্তি পুরুষ, মহিলা ও শিশুর দল জিনিসপত্র নিয়ে কোথাও যাত্রা করার তোড়জোড় করছে। যারা যাচ্ছে তারা এবং যারা তুলে দিতে এসেছে তারাও হাপুস নয়নে কান্নাকাটি করছিল। আমার পরিচিত স্থানীয় একজনের কাছে জানতে চাইলাম, এত মানুষ কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, আর মানুষগুলো কাঁদছে কেন? উত্তরে সেদিন চোখে জল এসেছিল আমারও।

কুচলিবাড়ি ও সংলগ্ন অঞ্চলে ধান কাটা হয়ে যাওয়ার পর কৃষিশ্রমিকদের আর কাজ থাকে না। তখন লোয়ার অসমে ইট তৈরির কারখানায় শ্রমিকের চাহিদা প্রচুর থাকে। সেখানে মজুরি মেলে ভাল, পরিবার নিয়ে কোনওমতে হলেও মাথা গোঁজার ব্যবস্থা থাকে। তাই

দলবদ্ধভাবে যাত্রা। কিন্তু যে বাচ্চারা সব স্কুলে যেত, কিছুটা হলেও লেখাপড়া শিখছিল, বাবা-মা'র সঙ্গে বাইরে যেতে হয় বলে তাদের পড়াশুনাও ছয় মাস বন্ধ থাকে। মোটামুটি পড়াশুনোয় ইতিই টানতে হয়। যে মানুষরা ইটভাটার শ্রমিক হিসেবে যাত্রা করে তারা সবাই ফিরেও আসে না। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করার ফলে অসুখে ভুগে বিনা চিকিৎসায় প্রতিবার দু-চার জন মারা যায়। সে কারণেই বাসযাত্রার সময় অসহায় আত্মীয়স্বজনদের জড়িয়ে ধরে এত কান্নাকাটি। আমি এলাকার একজন পঞ্চায়েত সদস্যকে জিজ্ঞেস করেছিলাম 'যারা শ্রমিকের কাজ করতে বাইরে যাচ্ছে তাদের কাজ দিয়ে আটকে রাখা যায় না?' পঞ্চায়েত সদস্য সেদিন নিরুত্তর ছিলেন। একসময় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তরের প্রশিক্ষন সংস্থা'-র কল্যাণী থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকাতে সরকারের কাছে প্রশ্ন রেখেছিলাম, যদি কুচলিবাড়ির শিশুদের এভাবে ছয় মাসের জন্য বাড়ি এবং স্কুল ছেড়ে দূরে চলে যেতে হয় তবে স্কুল ছুটদের সংখ্যা হ্রাস পাবে কী ভাবে? কুচলিবাড়ির সে ছবির আজ পরিবর্তন হয়েছে কিনা জানি না।

কিছু প্রান্তিক মানুষ অবশ্য ভাগ্যক্রমে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সাহায্যকারী শ্রমিক হিসেবে বাইরে কাজ করতে গিয়ে নিজেরা কাজ শিখে দক্ষ কারিগর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁত শিল্পে এমন উদাহরণ মেলে। এর আগে এই পত্রিকায় ফালাকাটা ব্লকের বড়ডোবা গ্রামের মানুষদের তাঁত শিল্পের শ্রমিক হিসেবে সমুদ্রগড় যাত্রা এবং পরবর্তিতে তাঁতশিল্পী রূপে তাদের পরিচিতি লাভ করার কাহিনি বিস্তারিত ভাবে বলার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তার পরিমাণ তো নগণ্য।

একটা সময় ডুয়ার্সের অর্থনীতি মূলত চায়ের উপর নির্ভরশীল ছিল। আর চা বাগানের বাইরে যে ডুয়ার্স কৃষিনির্ভর সেখানে পাটের দাম একটু বেশি পেলেই হার্ডওয়ার দোকানের করোগেটেড টিন বিক্রি হু হু করে বেড়ে যেত। বিক্রি বাড়ত ট্রানজিস্টার রেডিও-র। চায়ের বাজার ভাল হলে পুজোয় ১৮ থেকে ২০ শতাংশ বোনাস বাঁধা ছিল। আর বোনাসের পরিমাণ বাড়া মানেই শৌখিন জিনিসের বিক্রি বেশি হওয়া। এখন ডুয়ার্সে সর্বদাই কমবেশি ১৫ টা চা বাগান হয় বন্ধ নতুবা রুগ্ন। শ্রমিকদের মজুরি বন্ধ। কাজের সন্ধানে দূর দেশে পাড়ি দেয় তারা। সে মানুষগুলো চা পাতা ছাড়া অন্য কোনও কাজ জানে না, তাদের অনেকেই বাইরে অল্প কয়েকদিন কাজ করেই কঠোর বাস্তব বুঝে নিজেদের চা বাগানেই ফিরে আসে। আর কৃষকরা আজকাল বর্তমানে ব্যপক হারে আলুর চাষ করে। সব বছর ভাল দাম পাওয়া যায় না, লোকসান হয়। কিন্তু আলু চাষ এখন চাষির সোশ্যাল স্ট্যাটাস। বিকল্প চাষের ভাবনা কল্পনাতেও নেই, সে উদ্যোগেও যে এগিয়ে আসতে হয় সরকারি কৃষি দপ্তরকেই! তাহলে ডুয়ার্স জুড়ে গড়ে ওঠা এতগুলি হিমঘরই বা কী করবে?

এই মুহূর্তে গ্রাম ও শহর সর্বত্রই প্যান্ডেল বাঁধা চলছে। দোরগোড়ায় দুর্গা পুজো। নিজের ভিটেমাটি পরিবার বন্ধুদের ছেড়ে যে তরুণদল আজ বহুদূরে মাটি কাটছে পাথর ভাঙ্গছে বা ছাদ ঢালাইয়ের জোগান দিচ্ছে ওদের সবার এই সময়টায় শরতের সোনালি রোদ আর নীল আকাশ দেখলেই মন কেমন করে ওঠে বাড়ির জন্য। সন্তানের হাত ধরে প্যান্ডেলে ঢাকের আওয়াজ আর পরিচিত স্বজনদের পাশে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে খুব! কিন্তু চাইলেই তো ওরা সবাই বাড়ি ফিরে আসতে পারবে না। চুক্তির কাজ যে শেষ করতেই হবে। অদৃষ্টের সঙ্গে বেঁচে থাকার এক অসহায় অমোঘ চুক্তি!

কুন্তীর কুটির

আকাশের মুখ এখনও ভার। তবু মাঝেমধ্যে একচিলতে রোদ কীভাবে যেন ঢুকে পড়ছে ফ্ল্যাটবাড়িগুলোর কাঁচের জানলা ভেদ করে,বাসাবাড়ির ঘুলঘুলির ফাঁকফোকর দিয়ে। শেষবিকেলের সেই ভিজে ভিজে রোদেও পুজো পুজো গন্ধ। আসলে ভাদ্র মাসটি যে শরৎঋতুর কোর্টে, বৃষ্টি কিংবা গরমের দাপটে সেটা ভুলে গেলেও ওই রোদটুকু ঠিক মনে করিয়ে দেয়। ক্রমে বদলে যায় রোদের রং তাপ আর বাতাসের গন্ধ। শহরের চালচিত্রও বদলাতে থাকে। একদিন সকালে ঘুম ভেঙে দেখি বাড়ির সামনে হাসিহাসি মুখে এক সুখী-পরিবারের ছবি, সবার পায়ে নতুন জুতো। আরে! জুতো দিয়েই তো পুজোর শুরু। মানে জুতোজোড়া আগে কিনে ফেলতে হয়, পায়ের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য,যাতে বিশেষ দিনে ফোস্কা না পড়ে। কর্মক্ষেত্রে যাওয়া-আসার পথে চোখে পড়ে জনজীবনও বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। শহর শিলিগুড়ি ও তার আশপাশ জুড়ে দু"শোর বেশি বারোয়াড়ি পুজো হয়। এছাড়া রয়েছে বাড়ির পুজো।

একটু টাইম মেশিনে চাপি,পিছিয়ে যাই চল্লিশ বছর অথবা আরও বেশি। আঙুল গুণে বলে দেওয়া যেত পুজোর সংখ্যা। পাড়ার ছোট্ট পুজোগুলোয় আন্তরিকতা ছিল অঢেল। কিছু বড় পুজো যেমন শিল্প-সমিতি, স্বস্তিকা — এসব তো বরাবরের বিগ বাজেটের। আর ছিল মিত্র সম্মিলনীর পুজো। সে এক হৈহৈ রৈরৈ ব্যাপার। ক্লাবের সদস্যদের ঐ ক'দিন পুজোমণ্ডপ ই ঘরবাড়ি। শুনেছি আরও আগে পরিবারের সদস্যরা পারিবারিক বন্ধুবান্ধবেরা একসাথে হাঁটতে হাঁটতে হাকিমপাড়া থেকে বাবুপাড়া, দেশবন্ধুপাড়া ঠাকুর দেখে বেড়াতেন। এত যানবাহনের উৎপাত তো ছিল না। দুপুরবেলায় চা-বাগান থেকে ট্রাকের ডালায় চেপে হৈহৈ করে ঠাকুর দেখতে আসতেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে অনাবিল আনন্দটুকুই বিরাজ করত। সন্ধে সন্ধে ফিরে যেতেন তাঁরা। শুনেছি মৃৎ-শিল্পীদের বাড়ি থেকে অষ্টমীর দিন সকলে কেনাকাটা করতে যেতেন। ষষ্ঠীর বোধন শুরু হলে তাদের কাজ শেষ হত, সপ্তমীর দিনটি নিশ্চয়ই তাদের কাটত এলোমেলো হয়ে থাকা ঘর গোছগাছ আর বিশ্রামে। কয়েক মাস ধরে তো তাদের যুদ্ধ চলত, পরিবারের সবাই নেমে পড়তেন যে যুদ্ধে। তাঁরাও তখন হাতেগোনা ছিলেন। হাকিমপাড়ার মৃৎ-শিল্পীর কারখানায় কত যে ঠাকুর গড়া হত! তাদের কখনও প্লাস্টিক আবৃত অবস্থায় দেখেছি, কখনও দেখেছি মৃন্ময়ীর শরীরে শিউলির বোঁটা রঙের রোদ খেলছে, কখনও তাতে গর্জন তেল লেপা হয়েছে!

বড় বড় ক্লাব শুধু নয়, এখন পাড়ার পুজোর মাঠে দেখি ভাদ্রের শুরুতেই ফেস্টুন জানান দেয় প্যান্ডেলের দৃশ্যরূপ। উল্টোরথে জগন্নাথ স্বস্থানে ফিরে গেলেই পাড়ার মাঠে বাঁশ পড়ে যায়। প্যান্ডেল শিল্পীরা মেদিনীপুর বা মালদহ অথবা মুর্শিদাবাদ থেকে এসে অস্থায়ী আস্তানা বানান। মাঠটি বদলে যায় কোনও বিখ্যাত স্থাপত্য-শিল্পের রেপ্লিকায়। এরকমই এবার একদিন চোখ আটকে গেল একটা ফেস্টুনে—'কুন্তী কুটির'। সারা ভারতবর্ষ আমার ঘোরা নয়, ভাবলাম হয়তো কোথাও আছে এমন একটি স্থাপত্য, যা আমার মত কারও কারও জানার বাইরে থেকে গিয়েছে। হাকিমপাড়ার এই ক্লাবটি বিগত কয়েক বছর ধরে প্রচুর পুরস্কারের অধিকারি হয়েছে। বিশেষত, সৌম্য শান্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ বাতাবরণের জন্য এদের পুরস্কারটি বাঁধা। পাশাপাশি রয়েছে রথখোলা স্পোর্টিং ক্লাব, সেন্ট্রাল কলোনি, অগ্রণী সংঘ, মাটিগাড়া মায়াদেবী ক্লাব, চম্পাসারি জাতীয় শক্তি সংঘ এবং পাঠাগার, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব, সুব্রত সংঘ, স্বস্তিকা যুবক সংঘ, উপকার ক্লাব, রবীন্দ্র সংঘ, সংঘশ্রী ক্লাব, শক্তিগড় উজ্জ্বল সংঘ, মিলনপল্লী সার্বজনীন দুর্গোৎসব। এদের কেউ থিমের জন্য, কেউ প্যান্ডেলের জন্য, কেউ প্রতিমার জন্য, আবার কেউ সুন্দর পরিবেশের জন্য বছর বছর পুরস্কৃত হয়ে থাকেন। কেউ কেউ স্মরণিকা বের করেন। মূলত বিজ্ঞাপনী পুস্তিকা হলেও পাতায় পাতায় ঝলমল করে ওঠে গল্প কবিতা ছড়া লিমেরিক ভ্রমণ বা স্মৃতিচারণে।

শিলিগুড়ি ডায়েরি

প্যান্ডেল শিল্পীরা মেদিনীপুর বা মালদহ অথবা মুর্শিদাবাদ থেকে এসে অস্থায়ী আস্তানা বানান। মাঠটি বদলে যায় কোনও বিখ্যাত স্থাপত্য-শিল্পের রেপ্লিকায়। এরকমই এবার একদিন চোখ আটকে গেল একটা ফেস্টুনে—'কুন্তী কুটির'। সারা ভারতবর্ষ আমার ঘোরা নয়, ভাবলাম হয়তো কোথাও আছে এমন একটি স্থাপত্য, যা আমার মত কারও কারও জানার বাইরে থেকে গিয়েছে। হাকিমপাড়ার এই ক্লাবটি বিগত কয়েক বছর ধরে প্রচুর পুরস্কারের অধিকারি হয়েছে।

যখন এ প্রতিবেদন পাঠকের হাতে আসবে তখন আলোর ঝালরে মায়ানগরী হয়ে সেজে উঠবে শিলিগুড়ি, ঘড়ির কাঁটার তোয়াক্কা না করে ছোটদের সাথে মেতে উঠবে বুড়োরাও, উৎসব যে বড় সংক্রামক। রাত বাড়লে বাতাসে শিরশিরানি মিশে যায় গাড়ির ধোঁয়ার সঙ্গে। ফুটপাতবাসিনী কাগজকুড়ানি বালিকার সঙ্গে মিলেমিশে যাবে সচ্ছল সাজের কোনও কিশোরীর বিস্ময়াভূত চোখদুটিও। মহাভারতের পাণ্ডব জননী কুন্তীর কুটির হবে এবার 'অরুণোদয় সংঘ'-এর প্যান্ডেলের সাজ। আমার মতই শিলিগুড়ির আরও অনেকে অপেক্ষায় আছেন সেই সাজ উন্মোচিত হওয়ার ক্ষণটুকুর জন্য, আরও একটি কারুশিল্প উপলব্ধির জন্য। আর মহা অষ্টমীর অঞ্জলিতে বহুস্বর একীভূত হয়ে ধ্বনিত হওয়া বৈদিক উচ্চারণে মানুষ তার চেতনা ফিরে পাওয়ার প্রার্থনা করুক— কুন্তীর কুটিরে আকাশের তারারা নেমে আসুক অর্জুন হয়ে, মাগো!

শ্যামলী সেনগুপ্ত

বইপত্র সাহিত্য

নীরজ নাটক

শ্রদ্ধেয় নীরজ বিশ্বাস উত্তরের নাট্যজগতে একজন অবশ্য স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। প্রধানত এই রাজনগর কোচবিহারই ছিল তাঁর নাট্য-বিচরণ ক্ষেত্র। তাঁর প্রতিষ্ঠিত নাট্যদল 'মেঘমল্লার', অল্প কয়েকবছর হলেও, তাঁর নির্দেশনায় বেশ কিছু ক্ল্যাসিক নাটক উপহার দিয়ে কোচবিহারের নাট্যচর্চাকে পুষ্ট করেছিল। এই আলোচকও ছিল তাঁর গুণমুগ্ধ অনুজপ্রতিম। তাঁর পরিচালনায় ভিক্টোরিয়া কলেজের (অধুনা এ বি এন শীল কলেজের) শতবর্ষে 'কাঞ্চনরঙ্গ' নাটক করবার সুযোগ হয়েছিল এ আলোচকের। তাই পরিচালক তো বটেই অভিনেতা নীরজদাকেও খুব কাছের থেকে দেখবার সুযোগ ঘটেছিল। দরাজ কণ্ঠস্বরের অধিকারী মানুষটি ছিলেন দরাজ মনেরও মানুষ। তাঁর এগারোটি নাটকের সংকলন (যার মধ্যে দুটি নাটক অসম্পূর্ণ) গ্রন্থ 'নীরজ নাটক'-এ লেখা তাঁর নাট্যরচনার প্রতিভাকে নাট্যজগতে পরিচিত করাবে। সত্তর-আশির দশকে লেখা নাটকগুলির বেশ কয়েকটি (রক্তরাগ, মিছিল, একটি কুঁড়ির মৃত্যুতে)বর্তমান সময়ের কোনও সুদক্ষ নাট্যপরিচালকের যথাযথ সম্পাদনায় দর্শকাদৃত নাট্য হতে পারে।

সংকলনের প্রথম নাটক 'কাকের গল্প'। নাটকের শুরুতেই গল্পকারের সদর্প ঘোষণা;— 'আমরা এক একটি মূর্তিমান কাক'। সমাজে কাকেরা উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে আছে ভাগাড়ের সন্ধানে। সমাজ নামক সেই ভাগাড়ে দেশখ্যাত এক বিত্তবান ব্যবসায়ীর নেশাখোর ছেলে নির্মলের দর্শনে এক একটি সুযোগসন্ধানী কাকের প্রবেশ ঘটে নাট্যপ্রবাহে; দেশপ্রেমিক বর্ধমান, অধ্যাপক রাহা, কন্ট্র্যাক্টর চরণ সিং, সরকারি বাস্তুকার পৃথুল, যারা অর্থগৃধ্নু রূপে পচা নালা সমাজ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে পরজীবী হয়ে বেঁচে রয়েছে। নির্মল চরিত্রটি এ নাটকে বিবেকের ছদ্মবেশে সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা পালন করে নাট্যকারের নির্দেশে। নাটকের শেষে নাট্যকার 'মা' নামে এক চরিত্রকে হাজির করে, যার সংলাপ হল— 'ওরা সব আমার দুষ্টু ছেলে'। এই মা-ই জন্ম দেয় সৎ-অসৎ সব সন্তানদের। এদের মধ্যে জীবনাদর্শে সৎ নির্মল যখন অন্যদের অপকর্ম প্রকাশ্যে আনে, তখন এই মা-ই নির্মলকে রক্ষা করে অসৎদের আক্রমণ থেকে।

সংকলনের দ্বিতীয় নাটক হল 'মিছিল'। বহু অভিনীত, বহু প্রশংসিত এই নাটকের বিষয়বস্তু হল নাট্যকারের কর্মস্থল রাষ্ট্রীয় পরিবহণ দপ্তরের কর্মীদের ও তাদের সংসারের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার জীবন গাথা। নয়টি চরিত্রের অফিসের কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে ব্যক্তিগত জীবনের অনেক কথা উঁকি দিয়ে যায় তাদের সংলাপে। নাট্যকার ছোট ছোট ঘটনার মধ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন যে ঝাড়ুদার থেকে বড়বাবু, ফিটার থেকে ছোটবাবু, ড্রাইভার ইন্সপেক্টর সবাই মিলে পরিবহণ সংস্থা একটি পরিবার। শত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও যারা তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে পিছ পা নয়। তাই পুত্রের মৃত্যুতে অপ্রকৃতিস্থ বাস ড্রাইভার ব্রীজলাল চাকরি খুইয়েও জীবনের মিছিলে পা বাড়ায় স্বপ্নের ঘোরে পরিবহণের বাস নিয়ে।

পরবর্তী 'একটি কুঁড়ি' মৃত্যুতে একটি বিয়োগান্ত নাটক। সমাজের বিত্তবান সম্প্রদায় কীভাবে অর্থের দাপটে নিজেদের লালসা চরিতার্থ করে তার বর্ণনা পাওয়া যায় নাট্যপ্রহারে। শেষ জীবনে এসে নাটকের অন্যতম পুরুষ চরিত্র মিস্টার দত্ত যখন বিবেকের তাড়নায় নিজেকে শোধরাতে চায়, তখন তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী নার্স রীতা তাদের পঙ্গু সন্তানকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে মিস্টার দত্তের উপর প্রতিশোধ নেয়। রীতার এই প্রতিশোধ নেবার পন্থা কিন্তু তাঁর মাতৃত্বকে প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করায়। ন্যটকের এই ট্র্যাজিক পরিসমাপ্তি মেলোড্রামাটিক।

সংকলনের চতুর্থ নাটক 'দেবতার জন্ম' একটি রূপকধর্মী নাটক। নাট্যকালকে সুদূর অতীত, অতীত ও বর্তমান এই তিন কালে বিভাজন করে নাট্যকার বলতে চেয়েছেন যে সমাজের খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষদের উপর অত্যাচার, নিপীড়ন সব সময়ে একই চেহারায় বর্তমান। সেই সঙ্গে রাজা বা শাসকদের ক্ষমতা কুক্ষিগত করবার প্রচেষ্টার চরিত্র এক। মঞ্চ মধ্যে একটি লাল পর্দার পেছন থেকে নাটকের বিভিন্ন চরিত্র— চাষি ঋতায়ন, কারিগর লুব্ধক, তন্তুবায় অনল ও সভাকবি অনিরুদ্ধের মঞ্চে প্রবেশ এক বিশেষ বার্তা বহন করে। নাটকের শেষ পর্বে ছাত্র অলোক ও ছাত্রী ছন্দার প্রবেশের মধ্য দিয়ে নাটক পরিসমাপ্তির দিকে এগিয়ে যায়। তবে যে শূন্য সিংহাসন মঞ্চমধ্যে শোভা পাচ্ছিল তাতে কেন শেষ পর্বে একটি সুসজ্জিত কাঁচকলাকে স্থাপন করা হল তা বোঝা গেল না। তবে কি ভেবে নিতে হবে দেবতার আসনে কাঁচকলাকে স্থাপন করে ছাত্র-ছাত্রীরা নাস্তিকতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে, নাকি রাজার কাছ থেকে প্রজাদের প্রাপ্তি— কাঁচকলা? যবনিকা পতনকালে গীতার শ্লোক— 'যদা যদা হি ধর্মস্য...'-র সংযোজন নাটকটিকে আরও দুর্বোধ্য করেছে।

'নবাব' একটি রেডিও নাটক বা শ্রুতি নাটক, যেখানে অবলুপ্তপ্রায় বাঁশ বেড়ায় তৈরি বাড়ির সুনির্মান কৌশলের শিল্প সৌন্দর্য ও কামলা শিল্পিদের সৃষ্টি-শৈলীকে তুলে ধরা হয়েছে। 'রক্তরাগ' একটি সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাটক, যা দুটি অঙ্কের মোট আটটি দৃশ্যে সমাপ্ত। এটিও একটি বিয়োগান্ত নাটক। পাঁচটি লোকাল নাটকের বিন্যাস। সরিৎ নামক কেন্দ্রীয় চরিত্রটির যক্ষারোগে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নাটকের যবনিকার পতন হয়, সরিৎ-এর বাগদত্তা শুক্লাকে তার ইচ্ছাতেই তুলে দেওয়া হয় সরিৎ-এর বন্ধু স্নিগ্ধর হাতে। নাট্যকার ভালোবাসার জন্য নিজের বাগদত্তাকে প্রণয়প্রার্থী বন্ধুর হাতে তুলে দিয়ে সরিৎকে এক মহান চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। নাটকটিতে কিছু সাবপ্লট আছে, আর সেই প্লট ধরেই এসেছে বেশ কিছু চরিত্রের মেলোড্রামাটিক সংলাপ নির্ভর নাট্য মুহূর্ত। এই চরিত্রগুলি অবশ্যই নাট্য প্রবাহকে ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছাতে সাহায্য করেছে।

পরবর্তী নাটক 'অসংখ্যের অন্ধকার ঃ প্রদীপের আলো' মহিলাদের স্বনির্ভর কর্মসূচির বিষয়ক একটি নাটক, যার মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়ের কর্মশিক্ষা ও শরীর শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনিয়তা সম্পর্কে সম্যক জনচেতনা গড়ে তোলা হয়েছে। এটি একটি সম্পূর্ণ মহিলা অভিনীত নাটক হতে পারে।

পরপর দুটি নাটক 'সেই বিছানায়' ও 'এ কোন মেয়ে?' অসম্পূর্ণ নাটক। 'স্পন্দন' নাটকে দেশপ্রেমকে তুলে ধরা হয়েছে, ভারত-চীন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে। বৃদ্ধ সীতানাথ স্বাধীনতাসংগ্রামী ছিলেন। বোমা বানাতে গিয়ে বোমা ফেটে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন। বাবার আদর্শে বেড়ে ওঠা ছেলে 'কৃপানাথ' সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে চীন সীমান্তে যুদ্ধে নিহত হয়েছে। তাই সে নাতি 'টুকুন'-কে সকালে 'রোড মার্চিং'-এ যেতে দেয় না। কিন্তু জেদী টুকুনের একান্ত ইচ্ছার কাছে দাদুর ইচ্ছা হার মানে। তবে স্বাধীনতা সংগ্রামী 'সীতানাথ' তার এই হারকে খুশি মনেই স্বীকার করে নেয় বিবেকাশ্রিত দায়বদ্ধতা থেকে। গল্প প্রবাহে নতুনত্ব থাকায় সঠিক নির্দেশনায় 'স্পন্দন' একটি মঞ্চসফল নাট্য হতে পারে।

নাট্য সংকলনের শেষ নাটক 'আলোর যন্ত্রণা' তিন পুরুষ অনাদিনাথ, ছেলে আদিনাথ ও তার ছেলে সুরজিৎ-এর তিন ভিন্ন সময়ে জীবনকে দেখার গল্প। বংশপরম্পরায় পারিবারিক আভিজাত্যকে প্রশ্রয় দিয়ে বর্তমান প্রজন্ম 'সুরজিৎ' যে আধুনিকতাকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল তা যে ধ্বংসেরই নামান্তর তা নাট্যপ্রবাহে ব্যক্ত করা হয়েছে। অতীতকে মিথ্যা প্রমাণিত করে বর্তমান প্রজন্ম যে 'আলোর মোহে' ছুটে চলেছে তা যে সমাজব্যবস্থাকে এক অন্ধকার গহ্বরে নিয়ে যাচ্ছে তাই তিন প্রজন্মের সংলাপে প্রকাশিত অতীত, সুদূর অতীতকে মঞ্চে আনবার জন্য যে ফটোফ্রেমের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল তা সত্তর-আশির দশকে অবশ্যই একটি প্রশংসার্হ ভাবনা।

সংকলক এই গ্রন্থে দুটো প্রবন্ধ সংযোজন করেছেন, দুটোই নাট্যকারের, প্রথমটি 'উত্তরবঙ্গের নাট্যভাবনা'র বিষয়বস্তু স্বাভাবিকভাবেই উত্তরের নাট্য রচনা ও মঞ্চায়নের সুবিধা-অসুবিধা, সরকারি সাহায্যের অপ্রতুলতা, মহিলা অভিনেত্রীর সমস্যা ও দক্ষিণবঙ্গের সফল নাটকগুলোকে আমন্ত্রণ করে উত্তরে নিয়ে আসার সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন। এ প্রবন্ধে তিনি এ দাবীও করেছেন যে মঞ্চ, অর্থ ও যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা পেলে উত্তরের নাট্যদলগুলিও অভিনব বিষয়বস্তুর মাধ্যমে বাংলা নাট্য জগতে চিরস্থায়ী চিহ্ন এঁকে দিতে পারবে। এ ব্যাপারে তিনি আশাবাদী।

দ্বিতীয় প্রবন্ধটি হল— 'গ্রুপ থিয়েটার নামক চুষিকাঠি ঃ কোচবিহার'। প্রবন্ধটির নামকরণ থেকেই স্পষ্ট যে নাট্যকার এই প্রবন্ধে গ্রুপ থিয়েটার নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছেন। প্রবন্ধকারের অভিযোগ এই মফস্বল শহরের কোনও নাট্যদলই গ্রুপ থিয়েটারি আদর্শ নিয়ে কাজ করছে না, অবশ্যই তাঁর সময়ে। এটা তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত। কারণ সত্তর-আশির দশক থেকেই এই প্রতিবেদক নিজে একটি নাট্যদলের সঙ্গে যুক্ত। যে নাট্যদল কোনওরকম সরকারি সাহায্য ছাড়াই সেই সময় থেকে এখনও পর্যন্ত কাজ করে চলেছে, গ্রুপ থিয়েটারের আদর্শকে সামনে রেখে।

প্রবন্ধকার তাঁর এই প্রবন্ধে নাট্যকর্মশালার প্রতিও কটাক্ষ করেছেন এই ভাষায়, 'কয়েক বছর বাদে বাদে কলকাতার মানুষ আসেন— নাটক শেখাতে; কী সব শেখান-টেখান।' তিনি হয়ত সে সময়ে নাট্য কর্মশালার শিথিল পরিচালনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কিন্তু এ কথা কিন্তু অস্বীকার করা যায় না যে নাটকের প্রয়োজনে বিজ্ঞানভিত্তিক দীর্ঘমেয়াদী নাট্য কর্মশালা অবশ্যই প্রয়োজন। তাছাড়া এই কর্মশালাগুলোর মধ্য দিয়ে মফস্বল শহরের নাট্যকর্মীরা কলকাতার নাট্যচর্চা, মঞ্চ, আলো, আবহের যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষিত হতে পারে। তবে ওনার আক্ষেপ অবশ্যই উত্তরের নাট্যকর্মীদের অবহেলা করার প্রবণতা থেকে, যা অবশ্যই আলোচনার বিষয়।

নীরজ নাটক। কমলিনী প্রকাশনি। ২৫০ টাকা।

পূর্বাচল দাশগুপ্ত

মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ডুয়ার্সবাসীকে
শুভ শারদীয়ার
আগাম শুভেচ্ছা জানাই

উৎসবের দিনগুলি আন্দমুখর হয়ে উঠুক
সাম্প্রদায়িক বিভেদ দূর হোক

জগবন্ধু সেন
নব নির্বাচিত প্রধান

লাটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত

লাটাগুড়ি। জলপাইগুড়ি

রাসায়নিক রস

গোবর হাসে না

ছোটবেলায় যখন স্কুলে মাস্টারমশাইরা বলতেন মাথায় গোবর আছে কিছুতেই তখন সেই ছোট্ট মাথায় ঢুকত না গোরুর পটি কী করে মাথার ভেতর ঢোকে!

একটু বড় হয়ে যখন ক্লাসের মেয়েরা হাসাহাসি করত, আড়ালে বলত গোবর গণেশ তখনও ভাবতাম গোবর দিয়ে আবার ঠাকুর তৈরি হয় কী করে!

মন খারাপ হলেও একবার শহর থেকে আসা এক মামা বোঝালেন গোবরের নানান উপকারিতার কথা তখন বুকে খানিক বল পেলাম।

গাঁয়ে এক বুড়িকে দেখতাম সারাটা দুপুর বিকেল ঘুঁটে বানাতে, অনেকেই এসে সাইকেলে চাপিয়ে নিয়ে যেত সেই ঘুঁটে ভর্তি বস্তা, তখন বুঝতাম গোবরেরও দাম আছে।

তারপর যেদিন শুনলাম পাশের গ্রামে নাকি গোবর থেকে ঘরের আলো জ্বলে সেদিন আমার গোবর পোরা মাথায় যেন কেউ একটা বাল্ব জ্বালিয়ে দিল।

স্কুলেই পড়ালেখার পাট চুকিয়ে দিয়ে কাজের ধান্দায় বেরোতে হল। বাড়িতে চাল বাড়ন্ত, এই বিদ্যেয় চাকুরি মুশকিল, অঞ্চলের এক দাদার বুদ্ধিতে মজুর খাটতে চলে গেলাম দিল্লি। দিনভর খাটুনি, বিশাল এক খাটালের পাশে একটা ঝুপড়িতে আরও কয়েকজনের সঙ্গে থাকতাম। রোজ সকালে দেখতাম ছোট ছোট ভ্যানে বোঝাই হয়ে চলে যেত গোবর।

বাড়ি ফিরে এলাম, শুরু করলাম গোবরের ব্যবসা। প্রথমে গ্রামের বাড়ি বাড়ি থেকে গোবর ভ্যানরিক্সায় তুলে এনে এককাট্টা করে তারপর সেগুলি ট্রেকারে চাপিয়ে মহাজনদের কাছে। টাকা পেলে অল্প অল্প করে গোবরওয়ালা বাড়িতে দিয়ে দিতাম। গোবরের টাকা পেয়ে সবাই খুশ। আশপাশের গ্রাম থেকেও গোবর কালেকশন শুরু হল।

গোবরের চাহিদা বাড়ল চাষের জমিতে, দামও বাড়ল, মুনাফাও। সরকারি কেঁচো সারের প্রকল্প শুরু হতেই সে চাহিদা এক লাফে যেন আকাশ ছুঁল। ঝুড়ি নিয়ে গোরুর পেছন পেছন ঘুরতে হত এতদিন, এবার পথেঘাটে বাজারে ঘুরে বেড়ানো ষাঁড় গোরুকে হাটের ফেলে দেওয়া শাকপাতা সব্জি খাইয়ে খাইয়ে প্রচুর হাগানোর নেটওয়ার্ক তৈরি হল। যেসব বেওয়ারিশ গোরুকে সীমানার ওপারে পাচার করে দিয়ে কিছুদিন আলাদা ধান্দা হচ্ছিল, একদিন হিসেব কষে দেখলাম সেগুলিকেবসিয়ে হাগালে লাভ বেশি, কোনও রিস্ক নেই। এক যদি সে গোরু পটল না তোলে।

সেই গোবর গণেশ দেখলাম একদিন গোবর মাফিয়া হয়ে গেছে!

***

সান্ধ্য মজলিশে যেতে শুরু করেছিলাম। শুধু নেশার জন্যই নয়, বড় জায়গায় গেলে বড় রাঘব বোয়ালদের সঙ্গে মেলামেশা হয় শুনেছি। বিজনেসে বড় হতে গেলে এটাই নাকি দস্তুর।

তা দস্তুর মেনে একদিন দোস্তি হল এক পঞ্চুর সঙ্গে। পঞ্চু মানে পঞ্চায়েতের দাদা। আগে প্রধানরা দাদা হতেন, এখন নাকি তাদেরকে নাম কা ওয়াস্তে রাখা হয়, কাম চালায় দাদারাই, এমন কী একসঙ্গে তিন-চারটে পঞ্চায়েতের। নমিনেশন জমা থেকে শুরু করে হুল্লোড়বাজি চমকাইবাজি ইত্যাদি নানা বাজিতে সবাইকে দাবড়ে পঞ্চায়েত দখল সবটার দায়িত্ব থাকে দাদার। কোথাও 'ফোর্স' পাঠাতে হয়, কোথাও রেপের হুমকি দিতে হয়, কোথাও স্রেফ কথাবার্তা বললেই হয়! দখল হয়ে গেলে আড়াই বছর নিশ্চিত ঘরে বসে আয়, তার আগে কোনও অনাস্থার ঝামেলা নেই! ঠিকাদাররা তখন লাইন দিয়ে এসে থলে দিয়ে যায়।

পঞ্চুদার গপ্পো শুনতে শুনতে পঞ্চুপেগের নেশা লেগে গেল মাইরি!

পঞ্চুদা চোখ টিপে বলল, কী গোবরভায়া নামবে নাকি এ লাইনে? ফালতু যে টাকাগুলি ঘরে পচছে তার খানিকটা লাগাও, লস নেই! আমি তো আছি, ম্যানপাওয়ার ঝুটঝামেলা সব তো আমার! যা লাগাবে তার ডবল দেব কথা দিলাম।

প্রথমবার তো, বেশি রিস্ক নিলাম না, তিনটে পঞ্চায়েতে লাগালাম মোট তিরিশ। ভোটের আগে একদিন পঞ্চুদা দেখি আপসেট। বলল শালা অপোনেন্ট মনে হচ্ছে কেচিয়ে দেবে পুবেরটা! মাল বেশি চাইছে, বলছে পুষিয়ে দেবে এক বছরে! ভাবছি বাইরের ফোর্স ভাড়া করব। অর্ধেক খরচায় নামিয়ে দেব। কী বলো?

রাজি হওয়া ছাড়া উপায় নেই, আরও পনের দিলাম। ওটাই বেচে ছিল ভাঁড়ারে। কিন্তু দেরাজ একেবারে খালি দেখে বউ টের পেয়ে গেল। বউ হাউমাউ শুরু করতেই মা-ও।

আমি মালের নেশায় খুব চেঁচালাম, সারাজীবন ঘুঁটে বেচে খাব নাকি?

বউ চুপ। মা কেবল বলল, ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে।

শেষমেশ পঞ্চাশে ঠেকল। বউয়ের গয়না বেচতে হল আর কি। শেষবেলায় পঞ্চুদা বলল, কিছু 'ফরেন' মাল নাকি আনাতে হবে, তাই অগত্যা!

সবই ঠিক এগোচ্ছিল। কেবল ভোটের দিন আচমকা তলপেটে গুলি লেগে পঞ্চুদা খচ্চার খাতায়।

সাকরেদরা কাঁদতে কাঁদতে এসে বলল, পার্টি দাদার জন্য খুব করেছে গো। বিশাল মিছিল করেছে। কলকাতার নেতারাও এসে জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়েছে। ভুলিনি ভুলব না।

গোবর গণেশ এবার বোবা হয়ে গেল। কাজেকম্মে মন নেই, খাওয়ায় রুচি নেই। কেবল আকাশপানে শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকে। বউ কান্নাকাটি করল। বাড়ির সবাই ভাবতে শুরু করল মাথার ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে।

সেই মামা এসেছিল বাড়িতে। বলল গোবর নিয়ে এখন সারা পৃথিবীতে নাকি বৈপ্লবিক কাণ্ড হচ্ছে। কেউ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে, কেউ লিটার লিটার গ্যাসোলিন, কেউ বায়োগ্যাস, কেউ ক্যান্সারের দাওয়াই...। আমাদের দেশে নাকি গোবর থেকে ধূপকাঠি সাবান ডিটারজেন্ট তৈরি হচ্ছে!

আমি শুনে কেবল বললাম, তুমি যাও মামা, ঘুঁটে পুড়লেও গোবর আর হাসে না!

মামা পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, কেন রে ভাগ্নে? আমি কি তোর আপন নই?

ছোট্ট উত্তর বেরোল নীরব মুখ থেকে, আমাকে কেউ কোনওদিনও যেটা বলে নি, গোবরে ভুল করে পদ্মফুলও ফোটে!

অনু ঘটক

গোবর গ্লোবালি

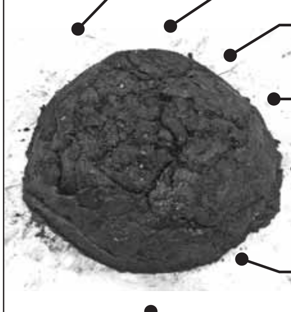

জ্বালানি বিজ্ঞানীদের হিসেবে একটি গোরু বছরে যে গোবর ত্যাগ করে তা থেকে ১৬২০ কেজি ঘুঁটে হয়। জ্বালানি হিসেবে তা ৭৭২ কেজি কাঠের সমান। অর্থাৎ ৬টি গাছ কাটলে সেই পরিমাণ জ্বালানি পাওয়া যায়।

বিদ্যুৎ উত্তরপূর্ব চিনের একটি বিশাল ডেয়ারিতে ৬০০০০ গোরুর গোবর থেকে ৫.৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি হয়।

গ্যাসোলিন জাপানে ১০০ গ্রাম গোবর থেকে ১.৪ মিলিলিটার গ্যাসোলিন তৈরি হচ্ছে। তাদের মোট ৫৫১০০০ গোরু রয়েছে।

মশা বিতাড়নকারী টেক্সাসে গোবর থেকে তৈরি এবং প্যাকেট করে বিক্রি হয় সুগন্ধী অর্গানিক মশা তাড়াবার ধূপ।

ইকো কংক্রিট ইন্দোনেশিয়াতে তৈরি হচ্ছে গোবরের ইট 'ইকো কংক্রিট'। ৭৫ শতাংশই গোবর। মাটির তৈরি ইটের চাইতে ২০ শতাংশ হাল্কা এবং ২০ শতাংশ অধিক মজবুত।

সাবান আমাদের দেশে স্বদেশী সামগ্রীতে গোবরের বিবিধ ব্যবহার — তার মধ্যে হায়দ্রাবাদের 'পঞ্চভাগ্য সাবান' নামের হ্যান্ডমেড সোপ উল্লেখ্য। দুধ ঘি দইয়ে সঙ্গে পরিশ্রুত গোমূত্র ও গোবর দিয়ে তৈরি এই সাবান একাধারে অ্যান্টিসেপটিক, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টিফাঙ্গাল যা চর্মরোগ প্রতিরোধক বলে দাবি করা হয়।

ক্যান্সার রোধক গোবরে রয়েছে কর্কট প্রতিরোধক গুণ। ইওরোপে গবেষণায় দেখা গিয়েছে, গোয়ালাদের গোমূত্র গোবর ঘাঁটাঘাটির ফলে ফুসফুসে ক্যান্সারের সম্ভাবনা নাকি অনেক কমে যায়।

আমাদের বইপত্র এখন নিজের ঠিকানাতেই পেতে পারেন

বিষয় ডুয়ার্স

অভিনব ডুয়ার্সে।
প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২০০ টাকা

ডুয়ার্স থেকে দিল্লি।
দেবপ্রসাদ রায়। ১৫০ টাকা

চায়ের ডুয়ার্স কী চায়?
গৌতম চক্রবর্তী ১১০ টাকা

ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে?
সৌমেন নাগ। ১৫০ টাকা

ডুয়ার্সের সেরা তিন লেখকের গল্প সংকলন

ডুয়ার্সের গপ্পোসপ্পো। সাগরিকা রায়। ১৫০ টাকা

চারপাশের গল্প। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১০০ টাকা

লাল ডায়েরি। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা

ক্রাইম থ্রিলার

লাল চন্দন নীল ছবি। অরণ্য মিত্র। ১১০ টাকা

পকেট পেপারব্যাক

অন্ধকারে মৃত্যু-আলিঙ্গন। বিপুল দাস। ৫৫ টাকা

মেঘের পর রোদ। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ৫৫ টাকা

কুহুলিয়াদের দেশে। সুকান্ত গাঙ্গুলী। ৫৫ টাকা

ডুয়ার্সের কাব্য চর্চা

পঞ্চাশ পর্যটন শেষে মাধুকরী ধান। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা

ডুয়ার্সের হাজার কবিতা। অমিত কুমার দে সম্পাদিত। ৫০০ টাকা

ছোটদের বই

সবুজ মনের গল্পগুলি। রীতা রায়। ১২৫ টাকা

বিষয় পর্যটন

আমাদের পাখি।
তাপস দাশ ও উজ্জ্বল ঘোষ। ৪৯৫ টাকা

সিকিম।
সংকলন। ২০০ টাকা

নর্থ ইস্ট নট আউট।
গৌরীশংকর ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা

রংরুটে হিমালয় দর্শন।
সংকলন। ২০০ টাকা

উত্তরবঙ্গের হিমালয়ে।
প্রদোষ রঞ্জন সাহা। ২০০ টাকা

সব্যসাচীর সঙ্গে জলে জঙ্গলে।
২য় খণ্ড ১৫০ টাকা

মধ্যপ্রদেশের গড় জঙ্গল দেউলে।
সুভদ্রা ঊর্মিলা মজুমদার। ২০০ টাকা

সুন্দরবন অনধিকার চর্চা।
জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী। ১৫০ টাকা

প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন।
তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস। ১১০ টাকা

জয় জগ্গেশ।
শুভ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ৯০ টাকা

অরণ্য কথা বলে।
শুভ্রকান্তি সিনহা। ১৫০ টাকা

সে আমাদের বাংলাদেশ।
গৌতম কুমার দাস। ২০০ টাকা

পাসপোর্ট প্রতিবেশিদের পাড়ায়।
দীপিকা ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা

বাড়িতে বসেই অর্ডার দিন আমাদের বই। পেয়েও যাবেন নিজের ঠিকানাতেই।
মেইল করুন dooarsbooks@outlook.com বা হোয়াটসঅ্যাপ করুন ৯৮৩০৪১০৮০৮ নম্বরে।
ন্যূনতম ৩০০ টাকার অর্ডার দিতে হবে। ৫০০ টাকা বা তার বেশি অর্ডার দিলে ডিসকাউন্ট মিলবে ২০%।
পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কোনও ঠিকানায় ক্যুরিয়ার খরচ লাগবে না।

আমাদের বই যে সব দোকানে পাওয়া যাবে (বই না পেলে সরাসরি অর্ডার করুন আমাদের)

শিলিগুড়ি: হলিডে ইয়ার, হরেন মুখার্জি রোড কাস্টমস বিল্ডিং সংলগ্ন। **ইকনমি বুক স্টল,** কলেজ রোড। **বিশ্বাস বুক এজেন্সি,** হিলকার্ট রোড বাটা গলি। **জলপাইগুড়ি: আড্ডাঘর,** মার্চেন্ট রোড। **গ্রন্থ ভারতী,** ডিবিসি রোড। **আলিপুরদুয়ার: শ্যামলী বুক ডিপো,** নিউটাউন। **কোচবিহার: এস বি বুক ডিস্ট্রিবিউটর্স,** রূপনারায়ণ রোড। **ফালাকাটা:** পাঞ্চজন্য। **মালবাজার: বইঘর,** আদর্শ বিদ্যাপীঠের উল্টোদিকে। **বিন্নাগুড়ি:** সিটি বুক স্টল। **বানারহাট:** গ্রন্থ ভারতী। **বীরপাড়া:** পোকিসা। **মালদা:** পুনশ্চ। **রায়গঞ্জ:** গ্রন্থভারতী। ধানসিঁড়ি। ওয়েস্ট দিনাজপুর বুক সাপ্লাই এজেন্সি। **কলকাতা: দে'জ ও দে বুক স্টোর,** কলেজ স্ট্রিট।

বই আপনার কাছাকাছি কোথায় পাওয়া যাবে জানতে ফোন করুন
উত্তরবঙ্গে ৯৮৩০৪১০৮০৮, কলকাতায় ০৩৩-৪০৭০ ১৪৪৪

EKHON DUARS, Vol-5, Issue-7 WBBEN/2014/56733, Rs. 20 Only

ডুয়ার্স প্যাকেজ টুর

২ রাত ৩ দিন: গরুমারা-ঝালং-বিন্দু-সামসিং-সুনতালেখোলা
৩ রাত ৪ দিন: গরুমারা-ঝালং-বিন্দু-সুনতালেখোলা-জল্পেশ
তিনবিঘা-কোচবিহার।
৪ রাত ৫ দিন: গরুমারা-ঝালং-বিন্দু-সামসিং-সুনতালেখোলা
জল্পেশ-তিনবিঘা-কোচবিহার-জলদাপাড়া-বক্সা।
নিউ জলপাইগুড়ি/নিউ মাল থেকে,
ইকনমি/ডিলাক্স প্যাকেজ
যোগাযোগ ৯৮৩০৪১০৮০৮/৯৯৩৮৩২১২৩

DHUPJHORA SOUTH PARK
Murti, Gorumara NP
Jalpaiguri, West Bengal

Accommodation: Super Delux Room (DBR) 4 nos, Delux Ethnic Rooms (DBR) 4 nos, Standard Family Rooms (4-6 BR) 5 nos.

Common Dine-in place for breakfast- lunch- evening snacks-dinner,
Conference Hall;

Cycling, Angling, Adventure sports like Burma Bridge, Cylinder Walk, Bosun Chair, Commando Walk and Zip Line.

Marketing & Booking Contact:
Kolkata 9903832123, 9830410808
Siliguri 9434442866, 9002772928

মোহিনী
মূর্তির পাড়ে
আয়েশের
সঙ্গে মেশে
রোমাঞ্চ

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.